শ্রীম-দর্শন

ভারতীয় সংস্কৃতি ও আত্মজ্ঞানের পথপ্রদর্শক
শ্রীরামকৃষ্ণ পার্ষদ

শ্রীম-র কথামৃত

[তৃতীয় ভাগ]

স্বামী নিত্যাত্মানন্দ



পরিবেশক :

জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

১১৯, লেনিন সরণী, কলিকাতা-৭০০ ০১৩

প্রকাশিকা : শ্রীমতী ঈশ্বরদেবী গুপ্তা
সেক্রেটারী, শ্রীরামকৃষ্ণ-শ্রীম প্রকাশন ট্রাস্ট
(শ্রীম ট্রাস্ট)
৫৭৯ সেক্টর ১৮-বি
চণ্ডীগড়

তৃতীয় সংস্করণ
১ আগস্ট ১৯৫৫

জয়গুরু প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ১৩।১ মণীন্দ্র মিত্র রো
কলিকাতা ৭০০ ০০৯ হইতে শ্রীঅমলেন্দু শিকদার কর্তৃক মুদ্রিত

সূচী

প্রথম অধ্যায়

জ্ঞানী আমার নিজের স্বরূপ

১

কলিকাতার পঞ্চাশ নম্বর আমহার্স্ট স্ট্রীট মর্টন ইনস্টিটিউসানের চারতলার সিঁড়ির ঘর। পূর্ব-পশ্চিম লম্বমান সামনাসামনি দুই সারি বেঞ্চ। তাহার মধ্য দিয়া পূর্বদিকে প্রশস্ত ছাদে যাইবার চারিফুট রাস্তা। উত্তরের সারিতে জোড়া বেঞ্চ পাতা পশ্চিম দিকে। উহার উপর একখানা শতরঞ্চি, সাধুগণ আসিলে এখানে বসেন দক্ষিণমুখী। শ্রীম হাতওয়ালা চেয়ারে ঐ জোড়া বেঞ্চির পশ্চিম প্রান্তে দক্ষিণাস্য বসিয়া আছেন দোরগোড়ায়।

শরৎকাল। অপরাহ্ণ সাড়ে পাঁচটা। দুই দিন হইল ৺বিজয়া দশমী হইয়া গেল। আজ ২রা অক্টোবর ১৯২২ খ্রীস্টাব্দ; ১৫ই আশ্বিন ১৩২৯ সাল, শুক্লা দ্বাদশী। ডাক্তার কার্তিকবাবু, তাঁহার ভাই বিনয়, ছোট নলিনী, সুধীর, জগবন্ধু প্রভৃতি উপস্থিত আছেন। উদ্বোধন হইতে যোগেন ব্রহ্মচারী আসিয়াছেন। ইনি শ্রীমকে প্রণাম করিতে গেলে বাধা দিয়া শ্রীম তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। মিষ্টিমুখের পর শ্রীম ব্রহ্মচারীর সহিত অতি আগ্রহে ডাক্তার কাঞ্জিলালের কথা কহিতে লাগিলেন। ডাঃ কাঞ্জিলাল সম্প্রতি দেহত্যাগ করিয়াছেন। ইনি শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের একান্ত শরণাগত ভক্ত—শ্রীশ্রীমায়ের কৃপাপ্রাপ্ত, মন্ত্রশিষ্য।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—যে জীবনে যার মুক্তি হবে তার চিহ্ন আছে। খুব ব্যাকুল হয় ঈশ্বরের জন্য। কাজকর্ম সব করে কিন্তু মন পড়ে আছে ঈশ্বরে—যেন দাঁতের ব্যথা। আহা, কাঞ্জিলালের কি ব্যাকুলতা! সাধুসঙ্গটি বরাবর ছিল কিনা তাই। এই সাধুসঙ্গই ভবসমুদ্র পারের তরণী। সাধুদের সঙ্গ করলে তাঁদের জীবনের

প্রভাব এসে পড়ে। ইচ্ছা না থাকলেও যেন কে জোর করে ধ্যান-জপ করিয়ে নেয়। সৎসঙ্গের এমনি মহিমা! ক্রমে তাঁদের জীবনের অনুকরণ করতে থাকে লোক। তাই ঠাকুর বলতেন, মন যেন ধোপা-ঘরের কাপড়, যে রঙে ছোপাবে সেই রঙ্ ধরবে।

শ্রীম (কার্তিকবাবুর প্রতি)—আজকাল মঠ আর দক্ষিণেশ্বরে গেলে অন্য কোনও তীর্থে যাওয়ার দরকার হয় না। এ-সব স্থানে যাওয়া বড় দরকার। তীর্থে যায় কেন? উদ্দীপনের জন্য। আর এ-সব স্থানে ভগবানের পূর্ণ আবির্ভাব। সশরীরে এসে এত কাল রইলেন। আর যাঁরা তাঁর জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করেছেন তাঁরা ওখানে আছেন—তাঁর অন্তরঙ্গ সাধুগণ। ঠাকুর নরেনকে বলেছিলেন কিনা, 'আমায় যেখানে রাখবি সেখানেই থাকবো'। মঠ সেই স্থান। তাই ও-সব স্থানের সব জিনিস তন্ন তন্ন করে দেখা উচিত। বাড়ী এসেও যাতে সমস্ত ছবিটা মনে ওঠে এরূপভাবে সব দেখতে হয়। মঠের ফুলবাগান, গোশালা, রান্নাঘর, ভাঁড়ার, স্নানের ঘাট—এ-সব দেখতে হয়। আর ঠাকুরঘরের প্রত্যেকটি জিনিস, কোথায় কোন্‌টি আছে, মনে একেবারে এঁকে ফেলতে হয় তার ছবি। আর সাধুদের ধ্যানমূর্তি দর্শন করা খুব ভাল।

এইভাবে দক্ষিণেশ্বরের সব দেখতে হয়—বেলতলা, ঝাউতলা, পঞ্চবটী, মাধবীলতা, ধ্যানঘর, বকুলতলার ঘাট, নবৎখানা, চাঁদনীর ঘাট, তিনটি ফটক আবার ফুলবাগান, হাঁসপুকুর, গাজীতলা। দ্বাদশ শিবমন্দির, রাধাকান্তের মন্দির, মা-কালীর মন্দির ও নাটমন্দির। কুঠীতে ঠাকুর যে ঘরে ষোল বছর ছিলেন সেটিও দেখতে হয়। আর ঠাকুরের ঘরের সব—দু'টি খাট, বিছানা, গঙ্গাজলের জালা, দেবদেবীর ছবি—কালী, কৃষ্ণ, রাম, চৈতন্য-সংকীর্তন, ধ্রুব, প্রহ্লাদ, যীশুর ছবি—পিটার জলে ডুবে যাচ্ছে, এ সবই দেখা উচিত। শ্বেত পাথরের বুদ্ধমূর্তি—এটি লালাবাবুর স্ত্রী রাণী কাত্যায়নী ঠাকুরকে দিয়েছিলেন। আর একটি ছবি আছে ঠাকুরের বিছানার পাশে পশ্চিমের দেয়ালে টাঙ্গান, বাগ্‌দেবীর ছবি। নতুন কেউ এলে ঠাকুর ঐ ছবিখানার

দিকে একবার চেয়ে নিতেন, আর প্রার্থনা করতেন, মা আমি মুখ্যু, তুমি এসে আমার কণ্ঠে বস,—তারপর কথা কইতেন।

অতি সামান্য জিনিসটিও মনোযোগ দিয়ে দেখতে হয়। ভাল করে দেখা থাকলে ধ্যানের সময় ঐ সব মনে উঠবে। আপনার বাড়ীতে মশারীর নিচে বসেও একজন সারা রাত দক্ষিণেশ্বরে কাটাতে পারে, ভাল করে দেখা থাকলে। ইচ্ছে করলে এ-ও ভাবা যায়, আমি মায়ের সামনে বসে ধ্যান করছি।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—মনই সব। ঠাকুরের গল্প আছে। দুই বন্ধু বেড়াতে বের হোল। একজন ভাগবত পাঠ হচ্ছে দেখে রাস্তায় ঐখানেই বসে পড়লো। আর একজন গেল বেশ্যালয়ে। যে বেশ্যালয়ে গেল তার মন পড়ে রইলো ভাগবত পাঠে। সে ভাবছে, হায়, আমি কি নরকেই এলুম, বন্ধু আমার ভগবানের কথা শুনে কত আনন্দে আছে। যে ভাগবত-পাঠে ছিল সে ভাবছে, বন্ধু আমার কত মজা লুটছে! দু'জনেরই মৃত্যু হলো। যে বেশ্যালয়ে গিছলো সে গেল বৈকুণ্ঠে বিষ্ণুদূতের সঙ্গে। আর ভাগবত-পাঠের বন্ধু গেল যমদূতের সঙ্গে নরকে। তাই, মনই সব। তার জন্য রোজ মঠে যাওয়া ভাল, আর অন্ততঃ সপ্তাহে একদিন দক্ষিণেশ্বর।

শ্রীম (ব্রহ্মচারীর প্রতি)—ঠাকুর বলতেন, ত্যাগীদের সন্ন্যাস সারা জীবন, আর গৃহীদের সন্ন্যাস partial (সাময়িক)। অবসর করে কখনও কখনও দুই চারিদিন নির্জনে গিয়ে ঈশ্বরচিন্তা করা। যেখানে অপর কেউ পরিচিত লোক থাকবে না, এমন জায়গায় যাওয়া চাই। এ-ও সন্ন্যাস, তবে partial (সাময়িক), কয়েক দিনের জন্যে—সন্ন্যাসীদের মত একটানা নয়। এই রকম করতে করতে যদি তাঁর ইচ্ছা হয় তবে সব ছাড়িয়েও নিতে পারেন। আবার সংসারে রাখলেও আর আবদ্ধ করবেন না। নামেই সংসারী, বস্তুতঃ সন্ন্যাসী।

সন্ন্যাসীরা সর্বদা ঈশ্বরচিন্তা করেন কিনা, তাই তাঁদের ভিতর নারায়ণের বিশেষ প্রকাশ। তাই এঁদের নারায়ণ বলে। দেখেননি,

'ওঁ নমো নারায়ণায়' বলে এঁদের প্রণাম করে। এঁদের দর্শন, এঁদের *সেবা করলে নারায়ণ-দর্শন ও নারায়ণ-সেবার ফল হয়।*

মঠে সম্প্রতি দুর্গোৎসব হইয়া গিয়াছে। শ্রীমর নিকট যাঁহারা সর্বদা যাতায়াত করেন এরূপ কয়েক জন ভক্ত শ্রীমর উপদেশ মত উৎসবের কয় দিন মঠবাস করিয়াছেন। পূজায় সাধুদের সঙ্গে যোগদান ও সেবা করিয়া ফিরিয়াছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—দুর্গাপূজার কয় দিন মঠে থাকা পূর্বজন্মের তপস্যা থাকলে হয়। এই পূজা তো কোন কামনার জন্য পূজা নয়। এ নিষ্কাম পূজা। এই নিষ্কাম পূজা মঠের সাধুরাই কেবল করতে পারেন। অন্যের পক্ষে এ কাজ বড়ই কঠিন।

মঠের এ পূজার পেছনে কত বড় প্রার্থনা শক্তি রয়েছে। ঠাকুর জগদম্বার কাছে যে প্রার্থনা করতেন সেই প্রার্থনার শক্তি রয়েছে। তাই তো এতো আনন্দ! ঠাকুর মায়ের কাছে প্রার্থনা করতেন, 'দেহসুখ চাই না মা, লোকমান্য চাই না মা। অষ্টসিদ্ধি চাই না মা, শতসিদ্ধি চাই না মা। তোমার পাদপদ্মে শুদ্ধাভক্তি দাও— শুদ্ধা অমলা অচলা ভক্তি দাও মা। আর এই করো যেন তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ না হই।' মঠের পূজার পেছনে ঠাকুরের এই নিষ্কাম প্রার্থনা বিদ্যমান।

ভক্তদের জন্যও প্রার্থনা করতেন মার কাছে, এই যারা শত কাজ ফেলেও তাঁর কাছে ছুটে যেতো। আর কিসে তাদের কর্ম কমে সর্বদা তাই ভাবতেন। দমদমার পলটনরা কয়েক ঘণ্টার ছুটিতেও তাঁর কাছে ছুটে আসতো। তাদের জন্যও প্রার্থনা করতেন। দেখতেন কি না, কত কাজের ভিতরও এখানে আসছে। নিজেকে নিজে জানতেন। তাই ভাবতেন, এরা সাধারণ লোক নয়। তাই এদের জন্য ভাবতেন অতো।

আবার বলতেন, ঈশ্বর সাকার কি নিরাকার এ নিয়ে মাথা ঘামিও না। বরং বল —হে ঈশ্বর, তুমি যে রূপেই থাক আমাকে দর্শন দাও। এই বলে প্রার্থনা করলে তিনি দেখা দিয়ে বুঝিয়ে দেবেন

তিনি কেমন। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীকে এ কথা বলেছিলেন। তখন কলকাতায় খুব বিচার হতো, ঈশ্বর সাকার কি নিরাকার এই নিয়ে।

শ্রীমর ফরমাস মত ভক্তগণ গাহিতেছেন 'রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ বল রে আমার মন। মাধুর্যঘন মূরতি জিত কামিনীকাঞ্চন'—ইত্যাদি। গান হইয়া গেল, অনেকক্ষণ শ্রীম ধ্যানস্থ হইয়া রহিলেন। পুনরায় তিনি কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—গান কি কম। ঠাকুর বলতেন, রামপ্রসাদ গানে সিদ্ধ। একজন ভক্তকে বলেছিলেন, তুমি এই গানটি নির্জনে গোপনে গেও; একা একা ব্যাকুল হয়ে। এতে কুণ্ডলিনী জাগ্রত হন। 'জাগো মা কুলকুণ্ডলিনী তুমি নিত্যানন্দ স্বরূপিণী' এই গানটি।

বলতেন, কুণ্ডলিনী জাগ্রত হলেই ব্যাকুলতা হয় ঈশ্বরের জন্য। নয়তো যেমন কেউ ত্রিশ বছর মালাই জপ করছে, কত গঙ্গা-স্নান, কত পূজা-অর্চা করছে, কিন্তু কিছুই হচ্ছে না। আঠার মাসে বছর, ব্যাকুলতা নেই, করতে হয় তাই করা।

'হরিষে লাগি রহ রে মন তেরা বনৎ বনৎ বনি যাই।' 'বনৎ বনৎ,' ঠাকুর এটি পছন্দ করতেন না। এখনি দর্শন করতে হবে, নচেৎ প্রাণ যায় যায়। 'বনৎ বনৎ'—ধীরে ধীরে নয়, এক্ষুনি চাই, এই ব্যাকুলতা।

'জাগো জাগো মা কুলকুণ্ডলিনী' এই গানটি একটি মহামন্ত্র। যদি কেউ ব্যাকুল হয়ে গায় নির্জনে, তবে তাঁর কৃপায় দর্শন হয়।

এখন রাত্রি নয়টা।

২

পরের দিন সন্ধ্যা। শ্রীম ঐ চারতলার সিঁড়ির ঘরে বসিয়া ধ্যান করিতেছেন। ভক্তগণও ধ্যান করিতেছেন। ধ্যানের পর শ্রীম কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—আর্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী—এই চার প্রকার ভক্তকেই গীতায় 'উদারাঃ' বলেছেন। উদার মানে উত্তম। (কার্তিকের প্রতি) কি ডাক্তারবাবু?

ডাক্তার আবৃত্তি করিতেছেন তিনটি শ্লোক। সমস্ত গীতা ডাক্তারের মুখস্থ। "চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন। আর্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থীজ্ঞানী চ ভরতর্ষভ॥" ইত্যাদি।

শ্রীম (বড় জিতেনের প্রতি)—অর্থার্থী এত খারাপ নয়। যেহেতু অর্থের জন্য হলেও ভগবানে বিশ্বাস আছে। কিন্তু জ্ঞানীই সর্বশ্রেষ্ঠ। কারণ 'জ্ঞানীতু আত্মৈব মে মতং'—জ্ঞানী আমার নিজের স্বরূপ, নিজের আত্মা। তাই 'প্রিয় হি জ্ঞানীনো।' জ্ঞানীগণ প্রিয়। আত্মা সকলের প্রিয়।

জ্ঞানী মানে যারা সংসারের কিছুই চায় না। কেবলমাত্র ঈশ্বরকে চায়। ঈশ্বর-বই কিছুই নেবে না। যেমন চাতক—সাত সমুদ্র তের নদী সব জলে ভরপুর, কিন্তু নেবে না, এক ফোঁটাও নেবে না। যেমন নচিকেতা। যম বললেন, এই স্থাও রাজ্য, যুবতী সুন্দরী স্ত্রী, রথ, সুবর্ণ—এই সব ন্যাও। কিন্তু বাছা, ওটি চেয়ো না, আত্মবিত্মা—'মরণং মাঽনুপ্রাক্ষীঃ'। 'তবৈব বাহাঃ তব নৃত্যগীত' এই বলে সব প্রত্যাখ্যান করলেন নচিকেতা। তোমার গাড়ীঘোড়া তোমার নাচগান তোমারই থাক্। আমার কাছে 'বরস্তু মে বরণীয়ঃ স এব।' আত্মজ্ঞান চাই, অন্য বর চাই না।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—বলবে না? শরীর যে থাকবে না। ও সব নিয়ে কি হবে? যা অনন্ত কাল থাকবে তাই চাইতে হয়। ঠাকুর বলতেন, ঈশ্বরের কাছে লাউ কুমড়ো চাইতে নাই—অমৃতত্ব চাইতে হয়। কেউ জানেন কঠোপনিষদের ঐ জায়গাটা?

একজন ভক্ত কঠোপনিষদের প্রথম অধ্যায়ের ২০-২৯ শ্লোক আবৃত্তি করিতেছেন। শ্রীমও মাঝে মাঝে দুই চারটি শব্দ উচ্চারণ করিয়া আবৃত্তিতে যোগদান করিতেছেন। সবগুলিই নচিকেতার উক্তি—'বরাণামেষ বরস্তৃতীয়ঃ', 'সর্বং জীবিতমল্পমেব', 'যোঽয়ং বরো গূঢ়মনুপ্রবিষ্টো নান্যং তস্মান্নচিকেতা বৃণীতে।'

শ্রীম (যুবকের প্রতি)—দেখুন, কিছুই নিলে না—আয়ু, পুত্র, স্ত্রী, রাজ্য, কিছু না। এই জ্ঞানী। তাইতো গীতায় বলেছেন শ্রীকৃষ্ণ,

'জ্ঞানী তু আত্মৈব মে মতং'—জ্ঞানী আমার আত্মা, আমার স্বরূপ। কেননা শুধু ঈশ্বরকে চায়, অন্য কিছু না। Complete non-co-operation with the worldly enjoyments—বিষয় কিছুই নেবে না, একেবারে নির্জলা উপবাস। (ভক্তদের প্রতি) তাই তাঁদের মহাত্মা বলে। তাঁরাই জগতে শ্রেষ্ঠ। তাঁরা সব মঠে থাকেন। সেই মহাত্মাদের খবর বলুন। গিছলেন কেউ আজ মঠে?

একজন ভক্ত—প্রথম স্টীমারে বড়বাজারে উঠি। মঠের ফটকে প্রণাম ও প্রার্থনা করে ঢুকি। দেখলাম, মায়ের মন্দিরে বসে দু'জন সাধু ধ্যান করছেন দক্ষিণের বারান্দায়। স্বামীজীর মন্দির ও মায়ের মন্দিরে প্রণাম করে মঠবাড়ীর সামনের ঘাটে গঙ্গাস্নান করি। তারপর ঠাকুর প্রণাম করে চরণামৃত গ্রহণ করি। ঠাকুরঘরের দক্ষিণের বারান্দায় পাঁচজন সাধু ধ্যান করছিলেন। আর ধ্যানঘরে তিনজন ও সামনের বারান্দায় একজন ছিলেন। একজন আঁকশি হাতে ফুল তুলতে যাচ্ছেন। ঠাকুরদের পূজার বাসন মাজতে বসেছেন একজন। তাম্রপাত্রটা তেঁতুল দিয়ে মেজে ধুয়েছেন, কি চক্‌চক্ করছে। ভাণ্ডারী মহারাজ কুটনো কোটার আয়োজন করছেন। সামনে একটা পাত্রে জল রেখেছেন। তরকারীগুলি বার করে রেখেছেন আর বঁটিগুলি বের করছেন। মহাপুরুষ মহারাজ তাঁর ঘরে বসে। সাধুরা একে একে প্রণাম করছেন। আমি প্রণাম করতেই আপনার কুশল জিজ্ঞাসা করলেন আর বললেন, "মাস্টার মশায়কে আমার বিজয়ার প্রণাম জানাবে।"

শ্রীম (সকলের প্রতি)—সাধুসঙ্গ-বই আর আমাদের উপায় নেই। এই একটিতে বাকী সব ঠিক করে দেবে। সাধুসঙ্গ মানে right (ঠিক) ঘড়ির সঙ্গে wrong (বে-ঠিক) ঘড়ি মেলানো।

অধর সেনকে ঠাকুর বলতেন, শীগ্‌গীর শীগ্‌গীর সেরে নাও। ছয় মাস পরে দেহ গেল। ত্রিশ বছর মাত্র বয়স। রোজ আড়াই টাকা খরচা করে গাড়ীভাড়া করে দক্ষিণেশ্বরে যেতেন আফিসের পর। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন, খুব খাটুনী, তাই ঘুমিয়ে পড়তেন। রাত

দশটায় ফটক বন্ধ হতো, ঠাকুর তখন উঠিয়ে দিতেন। অত রাতে বাড়ী ফিরে আসতেন। এমনতর ছ'মাস করেছিলেন, তারপর দেহ গেল।

তাঁকেই ঠাকুর বলেছিলেন—মানুষের জীবন, যেমন পাড়াগাঁ থেকে সহরে আসা কর্ম করতে। কর্ম শেষ হয়ে গেলে দেশে ফিরে যায়। বলতেন, পেটে ছেলে হলে শাশুড়ী কর্ম কমিয়ে দেয় বউয়ের। ছ' মাসে কতক, সাত মাসে আরও কিছু, আট নয় মাসে অনেকটা, দশ মাসে একেবারে ত্যাগ—সম্পূর্ণ ত্যাগ। তেমনি ঈশ্বরের দিকে মন যত এগুবে, কর্ম তত কমবে। দর্শন হলে একেবারে ত্যাগ—'ক্ষিয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে।'

দর্শনের পর যে কর্ম সে কেবল প্রারব্ধ ক্ষয়ের জন্য। এতে লোক-শিক্ষা হয়। প্রকৃতিতে রয়েছে কিনা তাই করতে হয়। কতকগুলি আবার স্বাভাবিক কর্ম—যেমন খাওয়া, শোওয়া প্রভৃতি। দর্শনের পূর্বে অনাসক্ত হয়ে কর্ম করতে হয়। আসক্তি এলেই যত গোল। এতেই বন্ধন আর ভোগ বেড়ে যায়। কেউ কেউ ঈশ্বরে ফল অর্পণ ক'রে করে সব কর্ম। এতে বন্ধন নাই।

অনাসক্ত হয়ে কর্ম কেমন? যেমন, একজন হাজার টাকা রোজগার করছে, কিন্তু নিজে তার benefit (সুবিধা) নেবে না। হয়তো একটি কম্বল নিয়ে নিজে সন্তুষ্ট।

আবার আছে প্রত্যাদিষ্ট। ঈশ্বরের আদেশে কর্ম করা। ও-টি হয় দর্শনের পর। একেই ঠাকুর বলতেন 'চাপরাশ' পাওয়া, মানে ঈশ্বরের আদেশ—commission লাভ করে কর্ম করা লোক-শিক্ষার জন্য।

শ্রীম (ছোট জিতেনের প্রতি)—কিন্তু সাধুসঙ্গ চাই। এটি থাকলে বাকী সব আপনা থেকে ঠিক হয়ে যায়। এর বড্ড দরকার সকলেরই। সাধুরও সাধুসঙ্গ দরকার। এটি করতে হয় হাতে-কলমে—উঠে পড়ে লাগতে হয়।

সাধুসঙ্গ সম্বন্ধে essay (রচনা) লেখা, কি লেকচার দেওয়া খুব সহজ। কিন্তু নিজে যে সাধুসঙ্গ করে সেই ধন্য। ঠাকুর বলতেন,

বাজনার বোল মুখে বলা অতি সহজ, কিন্তু হাতে আনা বড় কঠিন। হাতে আনতে হয়। রোখ'করে করতে হয় সাধুসঙ্গ। মন সহজে যেতে চায় না। যত সব রাজ্যের ওজর-আপত্তি এর বেলায়। সাধুসঙ্গ যিনি ধরেছেন তাঁর আর ভয় নেই। ক্রমে অন্য সব ঠিক হয়ে যাবে।

শ্রীম (জনৈক ভক্তের প্রতি)—ভাগবতখানা আনুন তো।

উহা আনা হইলে একাদশ স্কন্ধের দ্বাদশ অধ্যায় ইনি নিজে বাহির করিয়া দিলেন। সাধুসঙ্গ-মাহাত্ম্য বর্ণনা। একজন যুবক পড়িতেছেন :

শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিতেছেন, 'সখে, সাধুসঙ্গ অন্য সকল সঙ্গের নিবৃত্তি ঘটাইয়া দেয়। আমি এই সাধুসঙ্গের দ্বারা যেরূপ বশীভূত হই, যোগানুষ্ঠান, জ্ঞানার্জন, ধর্মনিষ্ঠা, বেদপাঠ, তপশ্চরণ, দান, ইষ্টাপূর্ত, দক্ষিণা, ব্রতাচরণ, দেবার্চন, গোপ্যমন্ত্র, তীর্থসেবা বা যমনিয়মাদি দ্বারা সেরূপ বশীভূত হই না।'

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—দেখুন ভগবান নিজে বলছেন, সাধুসঙ্গে তিনি বশীভূত হন সব চাইতে বেশী। (যুবকের প্রতি) কে কে কেবলমাত্র সৎসঙ্গ দ্বারা ভগবান লাভ করেছেন ?

যুবক—প্রহ্লাদ, বলি, বাণ, বিভীষণ, সুগ্রীব ও হনুমান। আর গোপীগণ ও যজ্ঞপত্নীগণ।

পাঠ শেষ হইয়াছে।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—ভগবান বলছেন, বৃন্দাবন ছেড়ে যখন তিনি চলে যান মথুরায় তখন গোপীগণের অবস্থা ঠিক মৃতের মত হয়েছিল। ওঁরা সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন। ভগবানের বিরহে তাঁদের নিকট জগৎ ভুল হয়ে গিছলো। নিজের দেহ যে অত প্রিয় তারও জ্ঞান ছিল না। মুনি-ঋষিদের যে অবস্থা হয় সমাধিকালে, সেই অবস্থা তাঁদের হয়েছিল। নাম ও রূপের জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়েছিল। অর্থাৎ, তাঁদের ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়েছিল। তাঁদের সাকার নিরাকার দুইয়েরই জ্ঞান ছিল। পতিপুত্র, পরিবার, সমাজ, সব ভুল হয়ে গিছলো। কৃষ্ণপ্রেমে উন্মাদিনী সব। কতখানি ভালবাসা

হলে এ অবস্থা হয়। তাইতো ঠাকুর বলতেন, গোপীপ্রেমের এককণা লাভ হলে হেউঢেউ হয়ে যায়। সাধে কি আর তিনি গোপীদের নাম হলেই মাথা নীচু করে প্রণাম করতেন।

জ্ঞান, যোগ, ব্রত, নিয়ম, বেদাধ্যয়ন, তপস্যা দ্বারাও যা লাভ করতে পারে না সৎসঙ্গে তা লাভ হয়। তাই সৎসঙ্গ বড় দরকার। সৎসঙ্গে ঈশ্বরে ভালবাসা হয়। তা হলেই হলো। কাম ক্রোধাদি আপনি খসে পড়ে, যেমন নারকেলের বালতোর হয়। কিম্বা উত্তাপে যেমন রাং গলে যায়। ভক্তরা ব্রহ্মপদ, ইন্দ্রপদ চায় না—তুচ্ছ মনে করে। ভালবাসায় ভগবান বশ হন। ভক্তের অধীন ভগবান।

তাইতো মঠে যেতে বলি। একটু কষ্ট করে গেলে ফল ভাল হবে পরে। সাধুদর্শন, প্রণাম আবার সেবা।

প্রণাম বড়দের ভূমিষ্ঠ হয়ে করতে হয়, আর নূতনদের যুক্ত-করে। মনে ভক্তি থাকলেই হলো। লোক দেখাবার দরকার কি? রাধাকান্ত দেবের বাড়ীর একটি ছেলে ঠাকুরকে প্রণাম করতো না লজ্জায়, পাছে বন্ধুরা বলে ভক্ত হয়ে গেছে। ঠাকুরকে এই কথা বললে তিনি উত্তর করলেন, কি দরকার লোক দেখানোয়? মনে ভক্তি থাকলেই হলো। তুমি যেমন করছো তাই করবে। এতেই তোমার হবে।

মথুরবাবু একবার ঠাকুরকে ধরে বসলেন, মায়ের পায়ে ওঁর হাতে একটি অর্ঘ্য দেন। খুব বড় মোকদ্দমায় পড়েছিলেন। ওঁর বিশ্বাস তাঁর হাতে অর্ঘ্য দিলে জিত হবে। ঠাকুর পরে ভক্তদের বলেছিলেন, 'দেখ কি বিশ্বাস মথুরের—আমি অর্ঘ্য দিলেই ওর কাজ হবে।'

ঠাকুর সর্বদা ভালর দিকটা দেখতেন লোকের। মহাপুরুষদের লক্ষণই এই।

৩

শ্রীম মর্টনের চারতলার ছাদে বসিয়া আছেন চেয়ারে উত্তরাস্য।

অপরাহ্ণ ছয়টা। কয়েকজন ভক্তও তিনদিকে বেঞ্চে বসা। শ্রীহট্টের সুরেনবাবু (স্বামী সৎসঙ্গানন্দ)-ও রহিয়াছেন। আজ ৪ঠা অক্টোবর, ১৯২২ খ্রীঃ, ১৭ই আশ্বিন, ১৩২৯ সাল, বুধবার, শুক্লা চতুর্দশী।

বেলুড়মঠ হইতে স্বামী শুদ্ধানন্দ, ধীরানন্দ ও মাধবানন্দ আর বিবেকানন্দ সোসাইটির সেক্রেটারী কিরণচন্দ্র দত্ত আসিয়াছেন। ৺বিজয়ার প্রণাম ও আলিঙ্গনাদি হইয়া যাওয়ার পর সকলে মিষ্টিমুখ করিলেন। মঠের সম্বন্ধে নানা কথা হইতেছে। কথাপ্রসঙ্গে তাঁহারা বলিতেছেন, 'আজ আমরা deputation-এ (আবেদন নিয়ে) এসেছি। কথামৃত আর লেখা সম্ভব না হলে, যেমন আছে ডায়েরীতে তেমনি ছাপিয়ে দিলে হয় না?' শ্রীম সহাস্যে উত্তর করিলেন, সব তাঁর ইচ্ছা। আমাদের ইচ্ছা আছে আর এক পার্ট লেখা। তিনি শক্তি দিলে হতে পারে। ডায়েরী ছাপালে বুঝবে কে? হয়তো উল্টো উৎপত্তি হবে।

শ্রীম (স্বামী শুদ্ধানন্দের প্রতি)—একটু উপনিষদ্ শোনাও। সাধুমুখে শুনতে হয় শাস্ত্র, ঠাকুর বলতেন। (ভক্তদের প্রতি) আপনারা শুনুন।

স্বামী শুদ্ধানন্দ খুব সুপণ্ডিত আর মেধাবী। উপনিষদ্ শাস্ত্রের বহু অংশ তাঁহার কণ্ঠস্থ। সম্প্রতি উদ্বোধনে উপনিষদের ক্লাস করিতেছেন। তিনি উপনিষদ্ হইতে অনেক অংশ আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। নিম্নে কতক দেওয়া হইতেছে।

ছান্দোগ্যের নারদ সনৎকুমার সংবাদ বলিতেছেন।

স্বামী শুদ্ধানন্দ—ভূমৈব সুখং···যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যচ্ছৃণোতি, নান্যদ্বিজানাতি স ভূমা।···যোবৈভূমা তদমৃতং। সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানেতি। ইন্দ্রবিরোচন সংবাদে আছে, য এষ অক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যতে এষ আত্মা ইতি হোবাচৈতদমৃতমভয়মেতদব্রহ্মেতি। উদ্দালক শ্বেতকেতুকে বলছেন, সত্তেব সৌম্যেদমগ্রে আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্। আবার আছে, স যঃ এষোঽনিমৈতদাত্ম্যমিদং সর্বং,তৎসত্যং, স আত্মা, তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো।

বৃহদারণ্যকে যাজ্ঞবল্ক্য বলছেন, বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম। আবার আছে, সর্বস্য বশী সর্বস্যেশানঃ সর্বস্যাধিপতিঃ। জনককে বলছেন, সলিল একো দ্রষ্টাদ্বৈতো ভবতি এষঃ ব্রহ্মলোকঃ। মৈত্রেয়ীকে বলছেন, স এষনেতি নেতি আত্মা…বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ।

তৈত্তিরীয়ে আছে, সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। আবার ভৃগুকে বলছেন, যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবন্তি। যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি তৎ বিজিজ্ঞাসস্ব তৎ ব্রহ্মেতি।

কয়েকজন ভক্ত প্রবেশ করিলেন।

শ্রীম (নবাগতদের প্রতি)—শুনুন, উপনিষদ্ হচ্ছে। ঠাকুর বলতেন, সাধুমুখে বেদ উপনিষদ্ শুনতে হয়।

শ্রীম (স্বামী শুদ্ধানন্দের প্রতি)—কঠোপনিষদেও বুঝি 'অস্তি' বলেছেন।

স্বামী শুদ্ধানন্দ—আজ্ঞে হাঁ। অস্তীত্যেবোপলব্ধব্যঃ। আবার আছে, অজো নিত্য শাশ্বতো। আবার, ঊর্দ্ধমূলোঽবাক্‌শাখ এষোঽশ্বত্থ সনাতনঃ, তদেব শুক্রং তদ্ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে। তস্মিল্লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্বে তদু নাত্যেতি কশ্চন।

শ্রীম—সগুণ নির্গুণ, উভয় প্রকার উক্তি রয়েছে উপনিষদে।

স্বামী শুদ্ধানন্দ—শ্বেতাশ্বতরে বলছেন জগতের কারণ, দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্। আবার বলছেন, এক দেবো সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্বব্যাপী সর্বভূতান্তরাত্মা। কর্মাধ্যক্ষঃ সর্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতা কেবল নির্গুণশ্চ। মুণ্ডকে ব্রহ্মের লক্ষণ করছেন, দিব্যোহ্য মূর্ত্তঃ পুরুষঃ স বাহ্যাভ্যন্তরোহ্যজঃ। অপ্রাণো হ্যমনাঃ শুভ্রো হ্যক্ষরাৎপরতঃ পরঃ। এর পরই আছে, আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি।

শ্রীম (সাধুদের প্রতি)—সৎ, চিৎ ও আনন্দ, তিন ভাবেরই বর্ণনা রয়েছে। আবার সগুণ ও নির্গুণ।

ঠাকুর বলেছিলেন, বেদে যাকে সচ্চিদানন্দ বলে, সেই সচ্চিদানন্দ এঁর (ঠাকুরের শরীরের) ভিতর থেকে বের হয়ে একদিন বললেন, আমিই যুগে যুগে অবতার হই।

আবার বলেছিলেন, বেদে যাকে ব্রহ্ম বলে আমি তাকেই কালী বলি, আদ্যাশক্তি বলি। যখন সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয় করেন তখন বলি শক্তি। যখন স্বরূপে অবস্থিতি করেন তখন বলি ব্রহ্ম। শক্তি ব্রহ্ম অভেদ। যেমন সাপ, কুণ্ডলী পাকিয়ে থাকে, এটি ব্রহ্ম; আবার হেলে দুলে চলে, এটি শক্তি।

সেই সচ্চিদানন্দ, সেই বেদপুরুষই ঠাকুর। কি অবস্থাই তাঁর ছিল। কামিনীকাঞ্চন ত্যাগের একেবারে ঘনমূর্তি। একবার কতকগুলি টাকা পয়সা তাঁর সামনে রাখা হয়েছিল। হাত ওদিকে নেবার অনেক চেষ্টা করলেন কিন্তু কিছুতেই যাচ্ছে না, ছোঁয়া তো দূরের কথা। শেষে জোর করে নেওয়ায় হাত বেঁকে গেল, ব্যথা হলো। আর স্ত্রীলোক সব 'মা'। 'শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্'।

শ্রীম (স্বামী শুদ্ধানন্দের প্রতি)—বেশ নিয়ম ছিল ঋষিদের। কেউ প্রশ্ন করতে গেলে বলতেন, আগে তপস্যা করে এসো অন্ততঃ এক বছর। আবার উপদেশ দিয়েও বলতেন তপস্যা করতে। নইলে বুঝতে পারবে না। আগেও তপস্যা, পরেও তপস্যা। ইন্দ্র বুঝি একশ এক বছর তপস্যা করে বুঝতে পারলেন ব্রহ্ম কি!

স্বামী মাধবানন্দ—ঋষিদের Constructive Method (সংগঠনমূলক পদ্ধতি) ছিল। একটা কথা বলে দিলেন। ঐটা নিয়ে চিন্তা করতে থাক; ভিতর থেকেই বুঝতে পারবে next step কি (অতঃপর কি)।

শ্রীম—ঠাকুর বলতেন, নির্জনে গোপনে ব্যাকুল হয়ে কেঁদে কেঁদে বল। তিনি সব বুঝিয়ে দেবেন। তিনি এই রাস্তায় গিছলেন কিনা। সোজা পথ কলিযুগের পক্ষে।

সাধুরা এবার প্রণাম করিয়া বিদায় লইলেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—উদ্বোধনে উপনিষদ্ আলোচনা হচ্ছে। সকলের যাওয়া উচিত। সাধুদের মুখ থেকে শুনতে হয় বেদ, উপনিষদাদি শাস্ত্র।

জনৈক ভক্ত—মশায়, উদ্বোধনে গিয়ে উপনিষদ শোনার চাইতে

আপনার কাছে এসে বসলে ভাল লাগে। পাঁচ মিনিট বসলে দেখেছি মনের সব অশান্তি দূর হয়ে যায়, যেন জগৎ ভুল হয়ে যায়।

শ্রীম (সহাস্যে)—এখানে যে পিতার ঘর গো, ওখানে শ্বশুর-বাড়ী। ঐখানেই যেতে হবে সকলকে। মেয়ে পিতামাতার কাছে থাকতে ভালবাসে। তা ব'লে কি ওখানে বরাবর থাকতে পারে, না থাকা উচিত? প্রথম যখন শ্বশুরবাড়ী যায় কত কান্নাকাটা। পিতামাতা বলে, 'মা কেঁদো না ; ঐটি তোমার আপনার ঘর। ওখানে তোমার চিরজীবন থাকতে হবে। ঐ ঘর করতে হবে।' সন্ন্যাস কিনা, ভগবানের জন্য সব ত্যাগ! এটি না করলে কি করে তাঁকে লাভ হবে। সকলকেই এটি করতে হবে আগে আর পরে।

তাই সাধুসঙ্গ-বই আমাদের গতি নাই। এই একটি মাত্র পথ। রোজ মঠে যাওয়া উচিত। পূর্বজন্মের তপস্যা থাকলে এটি হয়। এতে সংস্কার বদলে যায়।

মৌমাছি কেবল ফুলে বসে। অন্য মাছি ফুলেও বসে আবার অন্য স্থানেও বসে। যারা ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুল, তারাই সাধুসঙ্গ চায়।

যুবক ভক্ত—ব্যাকুলতাই যে হয় না।

শ্রীম—সাধুসঙ্গে যাওয়া-আসা করতে করতে ব্যাকুলতা হয়। প্রথম দর্শনেই কি আর নূতন বউয়ের পতির জন্য টান হয়? প্রথম যেতেই চায় না, কত ওজর কান্নাকাটা। আত্মীয় কুটুম্ব পাঁচজন কত বুঝিয়ে তবে পতির ঘরে পাঠায়। দিন যায়। হঠাৎ মায়ের অসুখ হলো। পিতা মেয়েকে লিখছে, 'মা পত্রপাঠ চলে এসো। আমাদের বড় বিপদ।' মেয়ে জবাব দিল, 'বাবা এখন কি করে যাই! ছেলের একজামিন, আবার ওঁকে অফিসে বেরোতে হয়। আমি না থাকলে এঁদের খুব কষ্ট হবে। এখন আসতে পারলাম না, আশ্বিন মাসে চেষ্টা করবো।' (সকলের উচ্চহাস্য)।

শ্রীম (সকলের প্রতি)—প্রবর্তকদেরও তেমনি অবস্থা হয়। প্রথমে সাধুসঙ্গে মন যেতে চায় না। হয়তো কোনও বন্ধু জোর করে সঙ্গে নিয়ে গেল। কিম্বা কারো অনুরোধে প্রথম গেল। তারপর

যাওয়া আসা করতে করতে শেষে একটা অভ্যাস হয়ে দাঁড়ায়। তখন সাধুসঙ্গ ছাড়া অন্য কিছু ভাল লাগে না। তখন তাঁরা যা করেন তাই করতে ইচ্ছা হয়—ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুল হয়।

যেমন শোকাতুরা মা। ছেলে এই সবে মারা গেছে, তার কাছে গেল একজন বন্ধু সহানুভূতি জানাতে। শোকভাব তখন আপনা থেকেই এসে পড়ে। অন্য সময়ে গেলে কত হাসি তামাসা করতো। কিন্তু এখন শোক আপনা থেকেই এসে পড়ছে। তেমনি সাধুসঙ্গ। ওটি করতে করতে ওদের মত হয়ে যায়। তখন আপনা থেকেই সব ঠিক হয়ে যায়—ব্যাকুলতা আসে।

জনৈক ভক্ত—ব্যাকুলতার পরই কি ভগবান দর্শন হয়?

শ্রীম—হাঁ। ঠাকুর বলতেন, যেমন অরুণ উদয় হলেই সঙ্গে সঙ্গে সূর্যোদয় হয়, এও তেমনি। ব্যাকুল হলেই ঈশ্বর দেখা দেন। আর এ প্রশ্নেরই বা দরকার কি? হয়, কি না হয়, ব্যাকুল হলেই জানা যাবে তখন।

পিপ্পলাদ ঋষির কাছে কয়জন গেল প্রশ্ন করতে। দেখেই তিনি বললেন, 'বুঝতে পেরেছি তোমরা কিছু জিজ্ঞেস করতে এসেছ। আচ্ছা, এক কাজ কর। আগে এক বছর তপস্যা করে এস, সত্য ও ব্রহ্মচর্য পালন করে এসো, তারপর জিজ্ঞেস কর। তপস্যা না করলে এসব প্রশ্নই করতে পারে না। কি বলতে কি বলে বসবে।'

ভগবান লাভ করা শুধু পাণ্ডিত্যের কর্ম নয়। নির্জনে গোপনে তাঁকে প্রার্থনা করতে হয়। যিশু বলতেন, 'So the last shall be first, and the first last'. 'Verily I say unto you, except ye be converted, and become as little children, ye shall not enter into the kingdom of heaven.' যারা জগতে নগণ্য তারাই ঈশ্বরের অতি প্রিয়। আবার যারা জগতে গণ্যমান্য তারা তাঁর কাছে নগণ্য। শিশুর মত সরল হলে তবে ঈশ্বর লাভ হয়। এমনি কাণ্ড! এখানকার বড় বড় নয়! তাঁর জন্য যাঁরা ব্যাকুল তাঁরাই বড়। কেননা, তাঁরা যে তাঁর অতি প্রিয়।

ছেলে খেলায় মত্ত। কোনও দিকে হুঁস নেই। খানিক বাদে আর ভাল লাগছে না। সব ছেড়ে দিয়েছে। খালি 'মা মা' করে কাঁদছে। একজন মায়ের কাছে নিয়ে গেল। মাকে দেখে, তাঁর স্নেহ চুম্বন লাভ করে আবার এসে খেলছে—কি তেজ তখন, আর আনন্দ। তেমনি সাধুসঙ্গ। মঠে গেলে এটি হয়। মন সতেজ হয়। তাঁর জন্য ব্যাকুলতা বৃদ্ধি হয়। আর সংসারের কাজেও তখন আনন্দ হয়, তাঁর সেবা এই ভেবে।

৪

মর্টন স্কুলের চারতলার ছাদে শ্রীম চেয়ারে বসিয়াছেন উত্তরাস্য। শ্রীমর সম্মুখে পূর্ব ও পশ্চিমে দুইখানা লম্বা বেঞ্চ। ভক্তগণ উহাতে সামনাসামনি বসিয়া আছেন—ডাক্তার, বিনয়, বড় সুধীর, ছোট নলিনী, অমৃত, জগবন্ধু প্রভৃতি। এখন রাত্রি প্রায় আটটা। শীতের একটু আমেজ পড়িয়াছে।

আজ কোজাগরী লক্ষ্মী-পূর্ণিমা। সুনির্মল আকাশে পূর্ণচন্দ্র। চাঁদের কি আলো—কি স্নিগ্ধ আর উজ্জ্বল! শ্রীম একদৃষ্টে চন্দ্র দর্শন করিতেছেন। এই চাঁদের ভিতর কি যেন দেখিতেছেন আর আনন্দে ভরপুর হইয়াছেন। প্রথমে চাঁদের ভিতর দেখিতেছিলেন, তারপর নিজের ভিতর। একটি সুখসেতু বুঝি স্থান ও কালের ব্যবধান ঘুচাইয়া দিয়াছে। দীর্ঘকাল কাটিয়া গেল। শ্রীম এবার আনন্দে তাঁহার ভাবপ্রতিমার বর্ণনা করিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—সেই পূর্ণিমা, সেই চাঁদ, সেই রাত—সবই আছে, নাই কেবল তিনি, রামকৃষ্ণ-শশী। সেই আনন্দময় দিব্য বালক, সেই বেদপুরুষ।

আটত্রিশ বছর পূর্বে এই রাতে কলুটোলায় এসেছিলেন নবীন সেনের বাড়ীতে। ইনি কেশববাবুর বড় ভাই। আহা, ঠাকুর কি impression-ই (চিত্রই অঙ্কিত) করে দিয়েছেন মনে। অপরের

কাছে আটত্রিশ বছর। আমাদের মনে হচ্ছে এই সবে হলো, এমনি vivid impression (জীবন্ত ছবি)।

সেই রাতে ঠাকুর তিনটি গান গেয়েছিলেন, নৃত্যও করেছিলেন। কি মধুর সে দৃশ্য। কেশব সেনের মা নেমন্তন্ন করে নিয়ে গিছলেন। এখনও দেখছি সেই নাচগান। আমরা তখন শ্যামপুকুরে রয়েছি। বাসা খালি রেখেই পলায়ন, এমনি টান। খেয়ালও হয়নি যে বাড়ীতে বিপদ হতে পারে। উপরে যাইনি, নিচে রোয়াকে বসে সব দেখেছি। রাত বারটায় বাড়ী ফিরি।

ঠাকুর কিন্তু জানতে পেরেছিলেন। পরদিন বললেন, হ্যাঁ, গোপনে খুব ভাল। ঈশ্বরকে ডাকতে হয় গোপনে—কেউ না জানে। তাঁর অগোচর তো কিছু নেই, অন্তর্যামী পুরুষ।

উঃ। আটত্রিশ বছর হয়ে গেল, আমার মনে হচ্ছে এইমাত্র হলো।

হিম পড়িতেছে। এতক্ষণ শ্রীমর হুঁশ ছিল না—ঠাকুরের সুখ-স্মৃতিতে নিমগ্ন ছিলেন। তাড়াতাড়ি আসিয়া সিঁড়ির ঘরে বসিলেন।

এইবার মঠের কথা হইতেছে। শ্রীমর উপদেশমত কয়েকজন ভক্ত নিত্য মঠে যান অতি ভোরে, প্রথম স্টীমারে। ইঁহারা সাধুদের দর্শন ও প্রণাম করেন পা ছুঁইয়া। ইঁহাদের ভিতর বয়স্ক ও প্রবীণ লোক রহিয়াছেন। মঠের সাধুরা তাই অনেকে পাদস্পর্শে সঙ্কুচিত হন। একজন সাধু মঠ হইতে আসিয়া শ্রীমকে এই কথা নিবেদন করিয়া গিয়াছেন। সাধুদের কষ্ট হইয়াছে শুনিয়া শ্রীম ভাবিত হইয়াছেন। তিনি ইতিপূর্বেই ভক্তদের বলিয়াছিলেন বয়স্ক সাধুদের ভূমিষ্ঠ হইয়া আর নূতনদের করজোড়ে প্রণাম করা উচিত। পুনরায় আজ প্রণাম সম্বন্ধে শ্রীম ভক্তদের উপদেশ দিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—মনে ভক্তি থাকলেই হলো। সাধুদের পাদস্পর্শ নাই বা হলো। মন-ভ্রমরকে পাঠিয়ে দাও না। এঁরা যখন অসন্তুষ্ট হন তখন কি প্রয়োজন? ভক্তি মনে মনে খুব ভাল। লোক-দেখানোর দরকার কি? তারপর রোজ রোজ পা খাবলাখাবলি, এ যে একটা positive nuisance (সুস্পষ্ট বিরক্তিকর ব্যাপার)।

চার থাক আছে সাধুদের। প্রথম থাকের সাধু খুব earnest, ব্যাকুল ভগবানের জন্য; trivial matters (তুচ্ছ জিনিস) এঁরা চান না। দ্বিতীয় থাকের সাধুরা afraid of contamination, স্পর্শদোষকে খুব হানিকর মনে করেন। তৃতীয় শ্রেণীর ওঁরা লৌকিকত্ব চান। এঁদের সংখ্যা খুব কম। আর চতুর্থ থাক indifferent (উদাসীন)—কোনও লক্ষ্য নেই এ দিকে। ভক্তি বা সম্মান পায়ে ধরেই কর, বা যুক্ত করেই কর, বা না-ই কর, তাঁদের গ্রাহ্য নেই এ সবে।

সাধুদের নারায়ণ-জ্ঞানে পূজা করা, কেবল সম্মান দেখান নয়—not to pay respects but to worship. কোনও মঠ, মন্দির বা আশ্রমে যেখানে সাধুরা থাকেন, যেতে হলে মোটামুটি এই তিনটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখা উচিত। প্রথম, আশ্রমপীড়া না হয়—যেমন ভোজনাদি। দ্বিতীয়, উল্লঙ্ঘন। সাধুরা ধ্যানজপ করছেন তখন সুমুখ দিয়ে যাওয়া উচিত নয়। আর তৃতীয়, পা খাবলাখাবলি না হয়। এমনভাবে চলতে হবে যাতে সাধুদের একটুও বিঘ্ন না হয়, অতি সন্তর্পণে। ভোজনাদি সম্বন্ধে এটা একটা point (নীতি) করে নেওয়া উচিত, উৎসবাদি ছাড়া সেখানে খাব না। খুব পীড়াপীড়ি না করলে খাওয়া উচিত নয়। ভিক্ষালব্ধ অন্ন তাঁদের। Winter-এর (শীতের) জন্য বহু কষ্টে কাষ্ঠাদি provision (সংগ্রহ করে) রাখা হয়েছে। তা'তে একজন গিয়ে আগুন ধরিয়ে দিয়ে আরাম করছে, এ উচিত নয়। সাধ্যমত সেবা করা উচিত তন্‌মনধনে। এক স্থানে বহু সাধু উপস্থিত থাকলে, নারায়ণের বিশেষ প্রকাশ জেনে ভক্তিভরে একটি বার প্রণাম করলেই যথেষ্ট। সাধুদের পূজা করতে যাওয়া তন্‌মনধন দিয়ে। তা না করে বিঘ্ন উৎপাদন করা? তাহলে আর পূজা হয় কি করে? পূজা মানে শরণাগত হওয়া। তা'তে ভগবান তুষ্ট হন। 'তস্মিন তুষ্টে জগৎ তুষ্টম্'। আবার সাধুরা সন্তুষ্ট হলে ঈশ্বর সন্তুষ্ট হন। সাধুরা তাঁর রূপ—নারায়ণ।

বেলেঘাটা, কলিকাতা। ৫ই অক্টোবর ১৯২২ খ্রীঃ, ১৮ই আশ্বিন ১৩২৯ সাল। বৃহস্পতিবার। কোজাগর লক্ষ্মী পূর্ণিমা।

দ্বিতীয় অধ্যায়

রামকৃষ্ণের পথ সহজ ও স্বাভাবিক

১

মর্টন স্কুল, কলিকাতা। এখন সন্ধ্যা। শ্রীম চারতলার ছাদে বসিয়া আছেন চেয়ারে, উত্তরাস্য। সম্মুখে ভক্তগণ বেঞ্চিতে বসা— ডাক্তার বক্সী, বিনয়, অমৃত, বড় সুধীর, ছোট নলিনী, জগবন্ধু প্রভৃতি। আলো আসিতেই শ্রীম ও ভক্তগণ ধ্যান করিতে লাগিলেন।

আজ ৬ই অক্টোবর, ১৯২২ খ্রীস্টাব্দ—বাংলা ১৯শে আশ্বিন, ১৩২৯ সাল। শুক্রবার, কৃষ্ণা প্রতিপদ তিথি। এক ঘণ্টা পর ধ্যান শেষ হইল। এইবার শ্রীম কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—আজ কে গিছলেন মঠে? যাঁরা সর্বদা ঈশ্বরকে নিয়ে আছেন তাঁদের কথা বলুন।

যুবক ভক্ত—আজ আমার পালা ছিল। গত রাত্রিতে বেলেঘাটায় ছিলাম। রাত সাড়ে তিনটায় উঠে বড়বাজার আসি। জগন্নাথ ঘাটে প্রথম স্টীমারে উঠে মঠে পাঁচটায় যাই। কাশীপুর থেকে ডাক্তারবাবু ও বিনয়বাবু ওঠেন। অন্য ঘাট থেকেও কেউ কেউ উঠেছিলেন। আজ কেউ পা ছুঁয়ে প্রণাম করেন নি সাধুদের। যেমন বলে দিয়েছিলেন তেমনি বড়দের ভূমিষ্ঠ হয়ে, আর নূতনদের হাত জোড় করে সকলে প্রণাম করেছেন। সাধুরাও আনন্দিত হয়েছেন। আজ ভক্তদের প্রণাম করা দেখে সকলে বুঝতে পেরেছেন, এই বিষয়ের এখানে বিশেষ আলোচনা হয়েছে। খালি মহাপুরুষ মহারাজকে সকলে ভূমিষ্ঠ হয়ে পাদস্পর্শ করে প্রণাম করেন।

এই কথা শুনিয়া শ্রীম আহ্লাদিত হইয়াছেন। আর প্রসন্ন চিত্তে কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—পা ধরে প্রণাম নাই বা হলো। লোককে দেখানোর দরকার কি? লোকে হয়তো বললে খুব ভক্ত।

লোকমান্য হবে। কিন্তু ঠাকুর বলতেন, ঝাঁটা মারি লোকমান্যে। খুব লঙ্কা ফোড়ন দিয়ে বলতেন এ কথা। লোকমান্যকে ভয় করলে কিছুই হচ্ছে না। একজন একটু তপস্যা করেছিল, তা'তে একটু লোকমান্য লাভ হল। ঠাকুর বললেন, ব্যস্ এই পর্যন্ত এইবার। এর বেশী আর এগুতে পারলো না এ জন্মে। তাই ঠাকুর অতি করুণভাবে প্রার্থনা করতেন, 'আমি দেহসুখ চাই না মা। আমি লোকমান্য চাই না মা। অষ্টসিদ্ধি চাই না মা। শতসিদ্ধি চাই না মা। তোমার পাদপদ্মে যেন শুদ্ধা ভক্তি হয়—শুদ্ধা অচলা অমলা অহৈতুকী ভক্তি। আর মা এই কর, তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় যেন মুগ্ধ না হই।'

এইটি আমাদের Universal prayer or Lord's prayer (সার্বজনীন প্রার্থনা বা ঈশ-স্তুতি)। যীশু খ্রীস্টও শিখিয়েছিলেন একটি প্রার্থনা। 'Our Father, which art in Heaven hallowed be Thy name. Thy Kingdom come. Thy will be done. So is in heaven as in earth. Give us day by day, our daily bread. And forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not unto temptation, but deliver us from evil. For Thine is the Kingdom, and the Power, and the Glory for ever.'

—হে পরম পিতঃ, আপনার নাম জয়যুক্ত হউক। আপনার ধর্মরাজ্য এখানে প্রতিষ্ঠিত হউক। স্বর্গের মত পৃথিবীতেও আপনারই ইচ্ছা পূর্ণ হউক। আমাদের দৈনন্দিন ভোজন প্রদান করুন। কৃপা করে ঋণমুক্ত করুন, যেমন আমরা করে থাকি, যারা আমাদের কাছে ঋণী তাদের। আপনার ভুবনমোহিনী মায়ায় আমাদের মুগ্ধ করবেন না। সকল অমঙ্গল থেকে আমাদের রক্ষা করুন। হে পিতঃ, আপনি সকলের অধীশ্বর, আপনি সর্বশক্তিমান, আপনার মহিমা সদা বিঘোষিত হউক।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—লোকমান্য এমনি জিনিস! তাঁর কৃপায় কেবল এর হাত থেকে রক্ষা হতে পারে। তাই তো বিশেষ

করে উল্লেখ করলেন, আর প্রার্থনা করলেন, 'মা, তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ করো না।' ঠাকুরও করলেন, ক্রাইস্টও করলেন ; সকলেই করেছেন অবতারগণ। কি ভয়ঙ্কর মোহ এই লোকমাস্তের।।

শ্রীম (বড় জিতেনের প্রতি)—দোকানে খুব বড় বড় টেঁক থাকে চালের। রাত্রিতে দোকানদার কুলোতে করে মুড়ি-মুড়কি রেখে দেয় এর পাশে। ইঁদুরগুলো সারারাত ঐ নিয়ে কড়র-মড়র করতে থাকে। চালের সন্ধান পায় না, অথচ অত কাছে চাল। এ সংসারেও ঠিক এইরূপ। ভোগের জিনিস, কামিনীকাঞ্চন দিয়ে ভুলিয়ে রেখেছেন ভগবান। মানুষগুলো এই কামিনীকাঞ্চনে ডুবে আছে আর তলিয়ে যাচ্ছে। এতো কাছে তিনি, হৃদয়ে তাঁর সন্ধান নাই। তাঁর কৃপায় যারা এই বাইরের বিষয়ভোগ ছেড়ে দেয় তারাই কেবল পরমানন্দ উপভোগ করতে পারে। তারা চালের সন্ধান পায়।

সাধুসঙ্গে এই ভুল ভাঙে—নিত্য নিয়মিত সাধুসঙ্গে। এ-বই আমাদের সংসারীদের আর উপায় নাই। নানা বিষয়ে মন ছড়িয়ে আছে। তাকে এক স্থানে আনতে হবে। সাধুসঙ্গ এর সহায়। সাধুর এক স্থান—ঈশ্বর, যেমন দাঁতের ব্যথা। দেখা যাচ্ছে, নানা কাজ করছে, কিন্তু ভেতরে ভগবান। সব তাঁর জন্য করছে। এ-টি লাভ হয় তাঁদের সঙ্গ করলে। ধ্যান করতে বসলেই কি আর ধ্যান হয়? মনকে সাধুসঙ্গ দ্বারা তৈরী করতে হয়। নয়তো যত সব রাজ্যের বিষয়-চিন্তা, কামিনীকাঞ্চনের চিন্তা মনে উঠতে থাকে। সাধুসঙ্গে এ চিন্তা হীনবল হয়ে যায়—ক্রমে গলে যায়, মোম যেমন উত্তাপে গলে যায়। সংসার যেমন কঠিন, সাধুসঙ্গ তেমনি সহজ করে দেয় পথ। সাধুসঙ্গ is the panacea, remedy for all diseases (সর্বৌষধি)।

জনৈক ভক্ত—সংসারে সবই যদি ঈশ্বরের ইচ্ছায় হয়, তবে লোকে ভাল মন্দ, এ সব কথা বলে কেন? ঈশ্বর তো মন্দ কিছু করতে পারেন না?

শ্রীম—তারা বুঝতে পারে না বলে ও সব কথা বলে। সবের

কর্তা তিনি। তিনি সদা-মঙ্গলময়, সর্ব-মঙ্গলময়, সকলের জন্য মঙ্গলময়। তিনি সব ভালর জন্য করছেন। দেখতে মনে হয় খারাপ। মা ছেলেকে মারছে। বাইরে দেখায় নিষ্ঠুরতা। মায়ের হৃদয়ে গিয়ে দেখ। ছেলের কল্যাণের জন্য সর্বদা মায়ের চিন্তা। মিথ্যা কথা বলতে শিখেছে, তাই মারছে। নয়তো পরে ছেলেরই খারাপ হবে। অগ্রপশ্চাৎ দেখে তবে ঋষিরা বলেছেন এই কথা, ঈশ্বর সর্ব-মঙ্গলময়।

ঈশ্বরের দু'টি ডিপার্টমেন্ট আছে। একটি বিদ্যা মায়ার, একটি অবিদ্যা মায়ার। অবিদ্যা মায়াতে যারা মুগ্ধ, তারাই পশুর মত জীবন যাপন করে। আহার বিহার মৈথুন আর ভয়, পশুর এই চার কাজ। বিদ্যামায়া যাদের আশ্রয়, তারা তাঁকে পাবার চেষ্টা করছে। সৎসঙ্গ খোঁজে তারাই। সবই তাঁর ইচ্ছা। তাঁর ইচ্ছা হলে এই পশুভাব থেকে দেবভাবে নিয়ে যেতে পারেন। সবই তিনি করেন। কেন করেন? এ প্রশ্নের একটিমাত্র উত্তর, 'জানি না'। তাঁর 'লীলা' ঋষিরা কতক বুঝতে পেরেছিলেন। তাঁরাই এই কথা বলছেন। আনন্দে সৃষ্টি, আনন্দে পালন, আনন্দে বিনাশ করছেন এই জগৎ।

'লীলা,' এই কথাটি স্পষ্ট করে বললে বলতে হয় 'জানি না'। তিনি তো কারো সঙ্গে পরামর্শ করে করেন না যে জানবে, কি জন্য করেন। তিনি সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ, কর্তা, প্রভু, আবার স্নেহময়ী মাতা, পিতা, বন্ধু, সখা। সুখ দুঃখ সুবিধা অসুবিধা সকলই তাঁর দান।

শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডব-সখা। কিন্তু পাণ্ডবদের কত বিপদ। সম্পদে বিপদে সব সময়ই তাঁকে ডাকা উচিত। তাঁকে ধরলে তিনি সব ঠিক করে দেন। ঠাকুর তাঁতীর গল্প বলতেন। সব কথাতেই তাঁতী বলতো, 'রামের ইচ্ছা'। কাপড়ের দাম জিজ্ঞাসা কর—বলছে, 'রামের ইচ্ছায়, এক টাকা'। সংসারের কথা, বিষয়ের কথা বল—সবের জবাব দিচ্ছে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বলছে 'রামের ইচ্ছা'। একবার ডাকাতের হাতে পড়লো, পুলিশ ধরে নিয়ে জেলে দিলে, তারপর

কোর্টে হাজির করলো। হাকিম জিজ্ঞেস করছে, কি হয়েছিল বল। তাঁতী বলছে, 'হুজুর' আমি চণ্ডীমণ্ডপে বসে তামাক খাচ্ছিলাম রামের ইচ্ছায়। রামের ঈচ্ছায় ডাকাতরা সব ডাকাতির মাল নিয়ে পালাচ্ছিল। রামের ইচ্ছায় আমার মাথায় চাপিয়ে দিলে এক বোঝা। পুলিশরা এসে পড়লো রামের ইচ্ছায়। রামের ইচ্ছায় ডাকাতরা পালালো। রামের ইচ্ছায় পুলিশ ডাকাত মনে করে আমায় ধরে নিয়ে জেলে রাখলে। এখন হুজুরের কাছে দাঁড়িয়েছি রামের ইচ্ছায়।' তারপর হাকিম তাকে মুক্ত করে দিলেন। ঈশ্বরে অটুট বিশ্বাস, আর সত্যবাদী বলে সকলে তাকে শ্রদ্ধা করতো।

শ্রীম (সকলের প্রতি)—গৃহীদের উচিত, হাজার কাজের ভিতরও সময় করে নেওয়া তাঁকে ডাকার। অন্য সব তিনি ঠিক করে দেবেন। ঠাকুর বলতেন—বার আনা মন ঈশ্বরে, আর চার আনা মন সংসারে রেখে কাজ করতে হয়। এই চার আনা মনের কাজে সংসারে হেউ-ঢেউ হয়ে যায়। স্থির চিত্তে চার আনা মনের কাজ কি কম কথা? আর বলতেন, বাপ, মা, স্ত্রী, পুত্র সকলকে বাইরে দেখাবে কত আপনার। কিন্তু ভিতরে জানবে, তুমিও তাদের কেউ না, তারাও তোমার কেউ নয়। ঈশ্বরই সকলের আপনার।

রাধাকান্তের গয়না চুরি হলো একবার দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে। হলধারী ছিলেন পূজারী—ঠাকুরের বড় ভাই, সম্পর্কে। পুলিশ তাঁকে ধরলো। ঠাকুর তখন প্রার্থনা করছেন মার কাছে, 'তোমার দুর্গা নামের কলঙ্ক হবে মা, সন্তানের বিপদ হলে। তুমি সব ঠিক করে দাও মা'।

তাঁকে পাবার জন্য বাইরের কোনও বস্তুর আবশ্যক হয় না। বলতেন, নির্জনে গোপনে ডাকতে হয় কেঁদে কেঁদে—দেখা দাও, দেখা দাও মা, বলে। একজন একটা আটচালা করেছিল পুরশ্চরণ করার জন্য। শুনে ঠাকুর তাকে তিরস্কার করলেন। বললেন, ছিঃ কি হীনবুদ্ধি তোমার। ভগবানকে ডাকবে, তা আবার সাইনবোর্ড মেরে? তিনি যে অন্তরের ধন। অতি গোপনে তাঁকে ডাকতে হয়।

আর একজন ভক্ত কতকগুলি ছোলা নিয়ে যাচ্ছে। একশ আট জপ করবে, আর একটি ছোলা আলাদা করে রাখবে। ঠাকুর শুনে বললেন, ওতে অহঙ্কার হবে—কি, আমি পঞ্চাশ হাজার জপ করেছি, অত পুরশ্চরণ করেছি! তিনি গোপনের ধন। ছোলাগুলি আমায় দিয়ে দাও, ভিজিয়ে বরং খেয়ে ফেলবো (সকলের হাস্য)।

শ্রীম (জনৈক ভক্তের প্রতি)—রাত্রিতে ধ্যান কর না—সারা রাত পড়ে আছে। দিনে হলে লোকে জানবে। তিনি অন্তরের ধন, গোপনে করলে চৈতন্য হয়। সংসারীদের মাঝে মাঝে সন্ন্যাস করা উচিত। কোনও নির্জন স্থানে গিয়ে দু-এক মাস থাকা উচিত।

আর হাস্য পরিহাসের সময় সাধুদের সামনে থাকা উচিত নয়। তাঁদের কষ্টের দিকটা তো দেখতে পাচ্ছে না, পরিহাস দেখছে। হয়তো মনে হবে, এঁরা বুঝি এইরূপেই সময় কাটান। তাঁদের দেখতে হয় ধ্যানের সময় সকাল বেলায়, আর সন্ধ্যার পর। কার্যগতিকে তাঁদের মন নিচে এলেও ফস্ করে উঠিয়ে নিতে পারেন উপরে। কিন্তু সংসারীদের এ-টি হওয়া বড় কঠিন। তাদের মন শত ধারায় বিক্ষিপ্ত।

ঠাকুরের মন সর্বদা সমাধিস্থ। একবার তাঁর সামনে একজন একটা ছাতা বন্ধ করেছিল, অমনি সমাধিস্থ। উদ্দীপন হয়েছে, ছড়ান মন কুড়িয়ে এল। যোগের উদ্দীপন হয়েছে। বাবা, এ যেন শুকনো দেশলাই। একটু ঘষ, অমনি জ্বলে উঠলো। কি অদ্ভুত concentration (মনোযোগ)! একবার ভাবে ছিলেন। তখন হাত পুড়ে গেল। বাহ্যজ্ঞান ফিরে এলে বলছেন—মা, আমায় ভাল করে দাও। যেন চঞ্চল বালক! সমাধিতে সব স্থির, আবার এখন এই চাঞ্চল্য। দু'টি contradictory points (পরস্পর-বিরোধী ভাবের) meeting place (মিলন-ভূমি) তাঁর জীবন-সমাধি ও সংসার।

শ্রীম (ডাক্তারের প্রতি)—কেউ কেউ বলে থাকে, আমাদের জনক রাজার মত। কিন্তু বললেই তো আর তা হয় না! আগে জনকের মত তপস্যা কর, জ্ঞানভক্তি লাভ কর, তবে সংসারে থাক। তপস্যা নাই, জ্ঞান-ভক্তি বিবেক-বৈরাগ্য নাই, তাহলে আর কি করে

জনক হওয়া যায়? (সহাস্যে) হাঁ, জনক হওয়া যায়—father of children—সন্তানের জনক আর কুকর্মের জনক (সকলের উচ্চহাস্য)।

একজন মাছ পান ছেড়ে দিছলো। ঠাকুর শুনে বললেন, আরে ওতে কি আছে? কামিনীকাঞ্চন-ত্যাগই ত্যাগ। মাছ পান শুধু ছাড়লে কি হবে? তারপর বললেন, শূকর-মাংস খেয়েও যদি মন ভগবানে থাকে, সে ধন্য। হবিষ্যি করে কামিনীকাঞ্চন চিন্তা যে করে, সে ধিক্।

ঠাকুরের কারো উপর কোনও জোর ছিল না—এই করতে হবে, ঐ করতে হবে বলে। বলতেন, ঈশ্বরের ইচ্ছা—যে যেখানে আছ, যা করছো, তাই কর। কিন্তু মনে মনে ঈশ্বরকে ডাকবে। একটি গৃহী ভক্তকে বলেছিলেন, নির্জনে একা একা এই গানটি গাইবে। তিনি রোজ ঐটি গাইতেন। শুনে ঠাকুর বললেন, 'না না তা নয়। মাঝে মাঝে গাইবে।' তা নইলে যে বিতৃষ্ণা এসে যাবে—একঘেয়ে কিনা। কোনও জোর নাই কারো ওপর। সহজ, স্বাভাবিক পথে নিয়ে যাচ্ছেন সকলকে।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—প্রবর্তকদের খুব জপ ধ্যান করতে হয়। চারা গাছকে বেড়া দিয়ে রক্ষা করতে হয়। তেমনি কচি মনকে সর্বদা ঈশ্বরীয় চিন্তাদ্বারা বেড়ে রাখতে হয়। গুঁড়ি মোটা হলে হাতী বেঁধে দাও, ভাঙ্গবে না। ষোল আনা মন চাই তবে শ্যামা মাকে পাবে, ঈশ্বর লাভ হবে। এক পয়সা কম হলেও টিকিট মিলবে না।

আর সাধুসঙ্গ করতে হয়। সমুদ্রের নিচে গেলে কত কি দেখতে পাওয়া যায়, মণিমুক্তো। তেমনি সাধুসঙ্গ, এটিতে একটা নূতন জগতে নিয়ে যায়। তাঁর কত ঐশ্বর্য, এ সব দেখতে পাওয়া যায়। সাধুদের কার্যকলাপ watch (পর্যবেক্ষণ) করতে হয়। তবেই তাঁদের মত করতে নিজেরও ইচ্ছা হবে—what man has done, man can do.

সাধু কে? যিনি সর্বস্ব ছেড়ে ভগবানকে পাবার জন্য পথে দাঁড়িয়েছেন ব্যাকুল হয়ে। সকল বিষয়-বাসনার ন্যাস, মানে ত্যাগ, না হলে ঠিক ঠিক সন্ন্যাস হয় না। সে-টি হয় কেবল তাঁর দর্শন হলে।

শেষ কথা সে-টি। যতক্ষণ তা না হচ্ছে, ততদিন তাঁর দর্শনের জন্য ব্যাকুল হলেও সন্ন্যাস। এ-টি হলে অনেকটা অগ্রসর হলো। সংসারের স্নেহ-মমতা বাদ পড়ে গেল। এক মনে তাঁকে ডাকার সুযোগ হলো। সাধুদের ভেতরেও ত্যাগ, বাইরেও ত্যাগ।

গৃহীদের তা নয়। তাদের মনে ত্যাগ, ঠাকুর বলতেন। তবে great menরা (মহাপুরুষগণ) সব পারেন। ঠাকুর নিজেই আদর্শ গৃহী, আবার আদর্শ সন্ন্যাসী। মা, ভাই, স্ত্রী, কুটুম্ব এদের সঙ্গে থাকতেন, অথচ কোনও আসক্তি নাই। সব করে দেখেছেন, কিন্তু মন এক ভাবে আছে। সর্বদা বলছেন, 'মা মা'। ঈশ্বর-বই কিছুই জানেন না।

শ্রীম (যুবক ভক্তের প্রতি)—কলকাতার লোক হুজুগপ্রিয়। অনেকে লেকচার দেয়। ভগবানের সাক্ষাৎ না হলে, তাঁর আদেশ নিয়ে কথা না কইলে, কে শোনে তার কথা? কেশব সেনকে আর শশধর পণ্ডিতকে ঠাকুর বলেছিলেন, আগে তাঁর আদেশ পাও, তারপর বক্তৃতা দিও। নইলে তোমার কথা শুনবে না কেউ। হুজুগের মত দু'দিন শুনবে তারপর সব ভুলে যাবে, কাজে আসবে না কোনও। ক্রাইস্টের সম্বন্ধে বলতেন—ডক্টররা, মানে পণ্ডিতগণ 'For he taught them as one having authority'—এঁর কথার এমনি জোর যেন নিজেই মালিক। এদিকে ত্রিশটি বৎসর কাটালেন নীরবে গোপনে ছুতোর মিস্ত্রীর কাজ করে। তারপর যখন আত্মপ্রকাশ করলেন, জগৎ স্তম্ভিত হয়ে গেল তখন তাঁর কথা শুনে।

ঠাকুর বলতেন, হালদারপুকুরের পারে লোকে বাহ্যে যায়। বারণ করলেও শোনে না কেউ। কত চেঁচামেচি হলো, কেউ শোনে না। শেষে কোম্পানী (ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড) নোটিশ মেরে দিলে, "এখানে কেউ বাহ্যে করিও না"—ব্যস্, অমনি সব বন্ধ হয়ে গেল। কিছু বলার আগে শক্তি লাভ করতে হয়, তারপর বলা।

তাঁকে জানতে হলে metaphysical questions-এর (আধ্যাত্মিকতত্ত্ব বিচারের) কোনো প্রয়োজন নাই। তাঁর কৃপা সার।

তাঁর কৃপা হলে সব তত্ত্ব আপনি বোঝা যায়। নইলে সংশয় যায় না। একটা যায় আর একটা আসে। সংসার যেন সহস্রফণা সাপ। এ-টি মনের ধর্ম। (সহাস্যে) রসিকতা করে কখনও ঠাকুর বলতেন, মন কেমন জান? যেমন 'ব'য় আকার আর 'ল'। টেনে ধর সিধে হল, ছেড়ে দাও যেমনি ব্যাঁকা তেমনি ব্যাঁকা। (সকলের হাস্য)। 'ছিদ্যন্তে সর্ব সংশয়াঃ' তাঁর দর্শন হলে সব সংশয় যায়। দর্শন হয় তাঁর কৃপায়। কৃপা হয় ব্যাকুল হলে। সৎসঙ্গে আবার ব্যাকুলতা হয়। তাই সাধুসঙ্গ মূল। এ-বই উপায় নাই।

একজন ভক্ত—ঠাকুর মায়ের সঙ্গে কথা কইতেন, সে কেমন?

শ্রীম—এ সব অতি দূরের কথা, আগে পথে ওঠ। রাস্তা ধরে চলতে থাক। হাটের ভেতর ঢুকলে দেখতে পাবে আলু, পটল কত কি। তা নইলে যেন 'হো হো' শব্দ শোনা দূর থেকে।

(সহাস্যে) কেউ কেউ বলে থাকে, ঈশ্বরের সম্বন্ধে নূতন কথা কিছু বল—original research. এ সব পুরানো হয়ে গেছে। এ সব লোক খালি কথা শুনতে চায় আর বাহবা দেয়—সাবাস বক্তা, বলে। কাজে কিছুই করে না। ঈশ্বর চির-নূতন। তাঁকে দর্শন কর আগে। তখন বুঝবে তিনি কেমন। তাঁর কথা কখনও পুরোনো হয় না। একই কথা, কিন্তু চির-নূতন। সাধুসঙ্গ কর, পথে ওঠ আগে। ঋষিদের কাছে কেউ কিছু জিজ্ঞেস করতে গেলে বলতেন, আগে তপস্যা করে এসো তারপর জিজ্ঞাসা করো। নইলে কি বলতে কি বলে ফেলে তার নাই ঠিক। এক ছটাক বুদ্ধি দিয়ে কি করে অনন্তকে বোঝে? এক সের ঘটিতে দশ সের দুধ কখনও ধরবে না।

শ্রীম (সকলের প্রতি)—আজও দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে দেখা যায়। যদি কেউ বই পড়ে কখন কোথায় বসেছিলেন, কোথায় কি করেছিলেন এ সব জেনে নিয়ে, নিজেকেও ঐ স্থানে ঐ সময়ে ঐ সঙ্গে আছে বলে মনে করে, কল্পনার ছবি আঁকে, তা হলে আজও তাঁর সঙ্গ করা যায়, তাঁকে দেখা যায়। আজ যা কল্পনা, কাল তা বাস্তব। কল্পনা ঘনীভূত হলে দর্শন হয়। আবার যোগশাস্ত্রে সব বর্তমান—অতীত ভবিষ্যৎ নাই।

অনেক ডিপার্টমেণ্ট তাঁর—ধর্ম, রাজনীতি, সমাজনীতি—কত কি! ধর্মপথে শুধু ভগবানের কথা আর তাঁকে লাভ করার কথা। অন্য কিছু নাই এখানে। ঠাকুর বলতেন, 'এ হাটে বিকায় না সুতো, বিকায় কেবল নন্দরাণীর সুত'। 'নন্দরাণীর সুত' মানে শ্রীকৃষ্ণ—ঈশ্বর। ঈশ্বরকে যারা চায় তারা ঈশ্বরীয় বিষয় ছাড়া অন্য বিষয় নেবে না। কিসে ভগবানে ভক্তি ও বিশ্বাস হয়, প্রেম হয়, জ্ঞান-বৈরাগ্য হয় কিসে তাঁর দর্শন হয়, সর্বদা তার জন্য ব্যাকুল। সর্বদা সেই কথা, সেই চেষ্টা। অন্য কথা নেবে না, অন্য কথা বলবেও না। 'অন্যা বাচ বিমুঞ্চথ'।

ঈশ্বরের জন্য ছাড়া আর যত চেষ্টা, সব কামিনীকাঞ্চনের চেষ্টা। বড় দুর্গম পথ—'ক্ষুরস্য ধারা'। 'সা চাতুরী চাতুরী'। অন্য সব বন্ধনের কারণ।

ধর্মপথও কত ভিন্ন। এক এক জনের এক এক মত। ব্যাকুল হলে সব পথেই তাঁকে পাওয়া যায়, ঠাকুর বলতেন।

২

মর্টন স্কুলের চারতলার ছাদে শ্রীম চেয়ারে বসিয়া আছেন উত্তরাস্য। আজ রবিবার, ৮ই অক্টোবর, ১৯২২ খ্রীস্টাব্দ। ২১শে আশ্বিন, ১৩২৯ সাল। কৃষ্ণা তৃতীয়া। ক্রমে ক্রমে অনেক ভক্ত আসিয়াছেন। আজ ছুটি তাই অনেকে সকাল সকাল আসিয়াছেন। ডাক্তার, বিনয়, অমৃত, ছোট ললিত, বড় অমূল্য, বড় সুধীর, ছোট নলিনী, কেষ্ট, শুকলাল, মনোরঞ্জন, জিতেন, জগবন্ধু প্রভৃতি এখন বসিয়া আছেন বেঞ্চিতে মুখোমুখি, পূর্ব-পশ্চিম দিকে। এখন অপরাহ্ন পাঁচটা।

কিছুক্ষণ পূর্বে শ্রীমর সম্মুখে অন্তেবাসী বসিয়াছিলেন, আর কয়েকজন ভক্ত। অন্তেবাসীর হাতে ছিল একখানা টলষ্টয়ের জীবন-চরিত। 'কি বই?' এই বলিয়া শ্রীম পুস্তকখানা নিজ হাতে লইয়া বিষয়-সূচী পড়িতে লাগিলেন। 'গৃহত্যাগ ও মৃত্যু'র অধ্যায়টি বাহির করিয়া অন্তেবাসীর হাতে দিয়া পড়িতে বলিলেন। শ্রীম অতি নিবিষ্টভাবে শুনিতেছেন। এটি শেষ হইলে, "Impression at

Yasnia Polyana' (ইয়াসনায়া পলিয়ানার কথা) এই অধ্যায়টিও পড়িতে বলিলেন। ইহা তাঁহার বাসগৃহ। গৃহের নামের উচ্চারণ ঠিক হইতেছে না দেখিয়া শ্রীম বলিয়া দিলেন, 'ইয়াসনায়া পলিয়ানা'। পাঠ শেষ হইল।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—গৃহে শান্তি ছিল না। স্ত্রী কলহপ্রিয়া। মেয়ে তিনটি, ছেলে ছিল না। বড় ঘরের ছেলে। সৈনিক হলেন। তখনই পরিবর্তন আরম্ভ হল। এর আগে, যেমন বড় ঘরের ছেলেদের হয়ে থাকে, বিশেষ কিছুই কাজ করেন নি। পরিবর্তন দেখা দিল। দরিদ্রের জন্য হৃদয় কেঁদে উঠলো। তারপর কত বই লেখা, বিদ্রোহ এ সব হল। জমিতে নিজে কাজ শুরু করলেন। অতি সরল জীবন। ঋষির মত ছিল তাঁর জীবন। স্ত্রীর জ্বালাতন সহ্য করতে না পেরে একদিন গৃহত্যাগ করলেন। কাউকে কিছু বলেন নি। একটিমাত্র শিষ্যকে নিয়ে বের হয়ে পড়লেন। শিষ্যটি ছিলেন ডাক্তার। বৃদ্ধ শরীর, সইতে পারলো না। রাস্তায় অসুস্থ হয়ে পড়লেন রেল স্টেশনে। সেখানেই দেহ যায়।

বাহিরে হিম পড়িতেছে। সকলে উঠিয়া আসিয়া সিঁড়ির ঘরে বসিলেন। সন্ধ্যায় ঈশ্বরচিন্তা শেষ হইলে কঠোপনিষদ পড়িতে বলিলেন। মঠের একজন ব্রহ্মচারী আসিয়াছেন। একজন যুবক পড়িতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—প্রশ্ন হয়েছে 'আত্মা কি'? যম কত করে বোঝাচ্ছেন। অতি দুরূহ বিষয়। কখনও positive (অস্তি-বাচক) কখনও negative (নাস্তিবাচক) কথায় বোঝাচ্ছেন। একবার বলছেন, 'এতদ্বৈতৎ'—কখনও বললেন, 'ন জায়তে ম্রিয়তে'। আবার বলছেন, 'অস্তি ইতি উপলব্ধব্য'। 'এতদ্বৈতৎ' সবই আত্মা। ভাষ্যকাররা কেউ কেউ 'তৎ'কে আত্মা অর্থে নিয়েছেন। ঠাকুর এর আরও সহজ অর্থ করলেন। তিনি বললেন, এই 'তৎ'ই ঈশ্বর—আমার মা। বেদে যাকে ব্রহ্ম বলে, আত্মা বলে, আমি তাঁকেই মা বলি। যখন সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করছেন তখন বলি মা, আদ্যাশক্তি, কালী।

স্বরূপে থাকার সময় বলি, ব্রহ্ম। যেমন, সাপ কুণ্ডলী পাকিয়েও থাকে, আবার হেলেদুলেও চলে। শক্তি ব্রহ্ম অভেদ। আত্মা—ব্রহ্ম, ঈশ্বর, কালী সবই এক।

শ্রীম (শুকলালের প্রতি)—ঈশ্বর-ইচ্ছাতেই সব হয়। অজ্ঞানতার জন্য আমরা বলে থাকি, 'আমি করছি'। ঠাকুর বলেছিলেন, একজন একটা বড় গাছ কাটছে। কাটতে কাটতে সামান্য একটু বাকী আছে। গাছটা তখন হুড়মুড় করে পড়ে গেল। গাছ মনে করছে আমি পড়লাম। কিন্তু কেটে দিয়েছে অন্য লোক, তাই পড়েছে। আমাদের অবস্থাও তাই। তিনিই সব করেন—আমরা বলি, 'আমি করি'। গোড়ায় তিনি, তাঁর শক্তি। (অন্যমনস্ক ভাবে) এই যে মরুভূমিতে ওয়েসিস্ (মরূদ্যান), একি আর মানুষ করেছে? তিনিই করেছেন। আবার শরীরের ভেতরে থেকে মন-বুদ্ধিকে তিনি চালাচ্ছেন। মরুভূমিতে যেমন ওয়েসিস্, তেমনি সংসারে মঠ, আশ্রম, সাধুসঙ্গ। ত্রিতাপদগ্ধ জীব গিয়ে শান্তি লাভ করবে। এই যে (বেলুড়) মঠ হয়েছে, এও তাঁরই ইচ্ছায়। মানুষের অজ্ঞানতার কথা ভেবে এক একবার ঠাকুর আক্ষেপ করতেন। বলতেন, সকলেই বলে রানী রাসমণির কালীবাড়ী। কেউ বলে না ঈশ্বরের কালীবাড়ী, তিনি করেছেন।

শ্রীম (জিতেনের প্রতি)—শ্বশুর-ঘর করতে হবে সকলকেই। বাপের বাড়ী বরাবর থাকা চলে না মেয়ের। এক জন্মে হোক, বা দুই জন্মে হোক বা বহু জন্মে হোক, শ্বশুর-ঘর করতেই হবে। সকল জীবই সর্বস্ব ত্যাগ করে তাঁর জন্য ব্যাকুল হবে একদিন। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—এই গুণ ভেদে দু'দিন আগে ও পরে, কিন্তু ব্যাকুল হতে হবে ঈশ্বরের জন্য। এই হলো evolution (ক্রমবিকাশ)। প্রকৃতির কর্ম ফুরুলেই তাঁ'তে মন যায়। দর্শনের জন্য ব্যাকুল হয়। এ-টিরই নাম 'summum bonum' পরম পুরুষার্থ—highest good, এ-টি general rule (সাধারণ নিয়ম)। এর ব্যতিক্রমও হতে পারে—exception, তাঁর কৃপায়। ঠাকুর বলেছিলেন, কংসবধে মথুরার

এক তাঁতী শ্রীকৃষ্ণকে সাহায্য করেছিল। ভগবান তুষ্ট হয়ে তাঁকে বৈকুণ্ঠে নিয়ে যাবার জন্য এক রথ পাঠিয়ে দিলেন। তার মা রথ দেখে আকুল। বললে—না, আমার ছেলের বৈকুণ্ঠের দরকার নেই। তাঁত বুনবে কে? 'তাঁতীর ছেলে স্বর্গে গেলে বন্ধ হবে তাঁত বোনা'। (সকলের হাস্য)। এ-ই প্রকৃতির খেলা। যতক্ষণ এর ভেতর ততক্ষণ কর্ম। এর ব্যতিক্রম কেবল তাঁর কৃপায় হতে পারে। তাই ক্রাইস্ট বলতেন, ভগবান ইচ্ছা করলে এই ইঁটপাটকেল থেকে বড় বড় ভক্তের সৃষ্টি করতে পারেন। 'Out of these stones, He can raise children unto Abraham.' তিনি বোবাকে বক্তা করেন, আবার পঙ্গুকে দিয়ে গিরি লঙ্ঘন করান।

পাণ্ডবদের যেই কর্ম শেষ হলো অমনি মহাপ্রস্থান। যে রাজ্যের জন্য অত যুদ্ধবিগ্রহ, সব পড়ে রইলো। ফিরেও দেখলেন না তার কি হলো। কর্মফল জোর করে ঝেড়ে ফেলবার অধিকার কারও নেই। অর্জুন যিনি অত বড় উত্তম অধিকারী, তাঁরও নেই। তাঁকে দিয়ে যুদ্ধ করালেন তবে শান্তি। কিন্তু ঈশ্বর ইচ্ছা করলে সব পারেন।

অমৃত—কর্ম কখন ত্যাগ হয়, এর চিহ্ন কি?

শ্রীম—ব্যাকুলতা। ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুল হলেই বুঝতে হবে কর্ম ত্যাগ হচ্ছে। ব্যাকুলতা হয় সৎসঙ্গে। তাই সৎসঙ্গ বড়ই দরকার। ভগবান যে যুগে যুগে আসেন অবতার হয়ে, এর কারণও এই। তিনি ব্যাকুলতা বাড়াতে আসেন। তিনি এলে খুব বেড়ে যায় ব্যাকুলতা, আবার অন্তর্ধানের পর ক্রমে ক্রমে কমে আসে। অবতার যখন আসেন তখন golden jubilee একেবারে সুবর্ণ সুযোগ। তখন পরীক্ষক খুব liberal (উদার), আবার grace mark (কৃপা নম্বর) পাওয়া যায়, না লিখলেও পাশ। হাজার হাজার বছরের সঞ্চিত অন্ধকার এক মুহূর্তে নাশ হয়ে যায় তাঁর কৃপায়। ব্যাকুলতা না এলে অনেক দেরী হয়ে যায়, আঠার মাসে বছর। কত লোক কত মালা জপ করছে, তিলক কাটছে, নিত্য গঙ্গাস্নান করছে, কিন্তু ত্রিশ বছরেও এদের কেন হচ্ছে না? এর উত্তরে, ঠাকুর

বলতেন, এদের ব্যাকুলতা নাই। নিয়ম-বাঁধা কাজ করে যাচ্ছে, কিন্তু ব্যাকুলতা চাই।

ঠাকুর বলতেন, এখানে আমাদের বাড়ী নয়। এখানে থাকতে হয় ঝিয়ের মত। বড়লোকের বাড়ীর ঝি বলে, এটা আমাদের বাড়ী, ঐটা আমার ঘর। কিন্তু অন্তরে জানে আমি দাসী, এ বাড়ী আমার নয়। বাড়ী আমার ঐ গ্রামে। সেখানে আমার ছেলেমেয়েরা থাকে। যেখানে বাড়ী সেখানে মন। অধর সেনকে বলেছিলেন ঠাকুর, তাড়াতাড়ি সেরে নাও। মানুষের জীবন, যেমন গ্রাম থেকে সহরে আসা কর্ম করতে। কর্ম হয়ে গেলেই ফিরে যাবে আপন ঘরে। অধর সেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। বয়েস ত্রিশ। আফিসের পর রোজ আড়াই টাকা খরচা করে গাড়ী করে দক্ষিণেশ্বর যেতেন। বেনেটোলায় বাড়ী। গিয়েই ঘুমিয়ে পড়তেন, খুব খাটুনী ছিল। বড় ফটক বন্ধ হতো রাত দশটায়। ঠাকুর তখন উঠিয়ে দিতেন তাঁকে। এমন ছ'মাস করলেন। তারপর দেহ গেল।

ডাক্তার—এখনও যাদের শ্বশুরবাড়ী হয়নি তাদের শ্বশুরবাড়ীর জন্য কি করা উচিত?

শ্রীম—সাধুসঙ্গ। এটি করতে হয় নিত্য নিয়মিতভাবে। এটা করতে করতে শ্বশুরঘরের পত্তন হয়। একবার ঐ ঘরের আস্বাদ পেলে, বাপমায়ের শত অনুরোধসত্ত্বেও মেয়ে ঐ ঘর আর ছাড়তে চায় না। ঐ বাড়ী ছেড়ে বাপের বাড়ী আর আসতে চায় না। সাধুসঙ্গ করতে করতে একটা নেশা জন্মে। ও বড় নেশা, যেন মদের নেশা। (সহাস্যে) ঠাকুর একটা গল্প বলেছিলেন। এক ছেলে বড় মদ খেতো। বাপ তাকে উপদেশ দিচ্ছে মদ ছাড়তে। ছেলে বললে, বাবা তুমি এক গ্লাস আগে খেয়ে দেখ, তারপর আমি ছাড়বো। বাপ মদের আস্বাদ পেয়ে তখন আর ছাড়ে না। ছেলে কিন্তু ছেড়ে দিল। সাধুসঙ্গের নেশা জন্মে। তখন অন্য কিছু ভাল লাগে না। সাধুসঙ্গে চৈতন্য হয়, বিদ্যারূপী সন্তানের জন্ম হয়। এর সাহায্যে কোন্‌টা প্রেয়, কোন্‌টা শ্রেয়, তার বিবেক জন্মে। প্রেয় মানে

বিষয়ভোগ, শ্রেয় ঈশ্বর। শ্রেয়লাভের ইচ্ছা যখন অতি প্রবল হয় তখন আর নূতন কর্মে জড়িত হয় না।

নূতন কর্ম মানে—বিয়ে করা, সন্তানের জন্ম দেওয়া। তাদের শিক্ষা, বিবাহাদি দেওয়া। তাদের জন্য অপরের দাসত্ব করা অর্থোপার্জনের জন্য—এই সব। যে বিয়ে করে নি তার পক্ষে এ সব নূতন কর্ম। আর যে বিয়ে করেছে তার পক্ষে কর্মসংক্ষেপ। যা না করলে নেহাৎ নয় তা করা। আর বাকী সময় ঈশ্বরের চিন্তা করা, সৎসঙ্গ করা। এদেরই মুস্কিল একটু। ঠাকুর এদের জন্যই ভাবতেন বেশী। কিসে কর্ম কমে, বেশী অবসর পায় তার পরামর্শ দিতেন। তাই সাধুসঙ্গ চাই। সাধুসঙ্গ করলে আপনি ভিতর থেকে বুদ্ধি আসে—কি করে কর্ম কমান যায় আর ঈশ্বরচিন্তা বেশী হয়। সাধুসঙ্গ সম্বন্ধে রচনা লেখা, বক্তৃতা এ সব খুব সহজ, কিন্তু হাতে আনা কঠিন। খুব রোখ করে করতে হয়। ঠাকুর বলতেন, বাজনার বোল মুখস্থ করলে কি হয়, হাতে আনতে হয়। (ডাক্তারের প্রতি) কিন্তু শ্বশুর-ঘর সবাইকে করতে হবে। ঠাকুর বলতেন, নেমন্তন্ন বাড়ীতে সকলেই যাবে, তবে আগে আর পরে। প্রথম হয়ত ব্রাহ্মণেরা খেল, তারপর গরীব-দুঃখী। সকলেই খাবে, অভুক্ত কেউ থাকবে না। তেমনি ঈশ্বরের কাছে যাওয়া। সকলের সমান অধিকার—equal and birth-right.

সাধুসঙ্গে ব্যাকুলতা বাড়ে। তা হলেই কর্মত্যাগ হয়। কর্মত্যাগ হলে কি হয় তার দৃষ্টান্ত মহাদেব। 'শ্মশানে মশানে ফিরে ঘরের ভাবনা ভাবে না'—He lives in eternity, not in time. তাই বলতেন সকালে শিবগুরুর নাম নিতে হয়। ঠাকুরের নিজের জীবনও তাই। 'মা মা' বলে পাগল, সমাধিস্থ। এক-আধবার নয় সারা দিনরাত প্রায়। দীনু বোসের বাড়ীতে জিজ্ঞেস করছেন এখন ক'টা বেলা? তখন অনেক রাত হয়ে গেছে। বাইরের জ্ঞান নাই, তখনও মন চড়েই আছে। এ সময়ে কর্মত্যাগের দৃষ্টান্ত ঠাকুর।

আর প্রার্থনা করতে হয় daily (নিত্য)। তাও শিখিয়ে

দিয়েছেন, 'মা আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী। আমি ঘর, তুমি ঘরণী। আমি রথ, তুমি রথী। যেমন চালাও তেমনি চলি। যেমন করাও তেমনি করি। যেমন বলাও তেমনি বলি। মা, শরণাগত, শরণাগত।'

৩

আজ ৭ই অক্টোবর, অপরাহ্ণ পাঁচটা। কাশীর স্বামী কৈবল্যানন্দ ও জামতাড়ার স্বামী রামেশ্বরানন্দ আসিয়াছেন শ্রীমকে প্রণাম করিতে ৺বিজয়া উপলক্ষে। তাঁহাদের সঙ্গে দুইজন ব্রহ্মচারী। সকলেই এখন বেলুড় মঠ হইতে আসিয়াছেন।

শ্রীম চারতলার সিঁড়ির ঘরে বসা, সিঁড়ির গোড়ায়। কয়েকজন ভক্তও রহিয়াছেন। সাধুদের সিঁড়ি বাহিয়া উঠিতে দেখিয়া শ্রীম দাঁড়াইয়া পড়িলেন, আর বলিতে লাগিলেন, "নমস্কার নমস্কার। আসুন, আসতে আজ্ঞা হোক।" শ্রীম কাহাকেও পা ছুঁইতে দেন না। সাধুরা পা ছুঁইতে গেলে উনি তাঁহাদের হাত ধরিয়া আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। সাধুরা মিষ্টিমুখ করিতেছেন। কাশী, জামতাড়া ও বেলুড় মঠের নানা সংবাদ লইতেছেন। স্বামী রামেশ্বরানন্দ বলিতেছেন, "মাস্টার মশায়, জামতাড়ায় ঠাকুরের মঠ হয়েছে। খুব সুন্দর খোলা জায়গা। আপনি চলুন, ওখানে থাকবেন। কোনও অসুবিধা হবে না, আমরা সব রয়েছি। আর আপনারা গেলে ঐ সব স্থান জেগে উঠবে। সেখানে কয়েকজন ভক্তও আছেন। সকলের খুব আনন্দ হবে। এখন ওখানে climate (জলবায়ু) খুব ভাল। বলুন, কবে যাবেন?" শ্রীম উত্তর করিলেন, old menদের (বুড়োদের) কিছুই স্থির নাই। ইচ্ছা তো হয়; কিন্তু তিনি নিয়ে গেলে হয়। সাধুরা বিদায় লইলেন। শ্রীমর আদেশে একজন ভক্ত তাঁহাদের ফটক পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়া আসিলেন।

এখন মঠের দৈনন্দিন বিবরণ লইতেছেন। আজ বড় নলিনী ও বড় সুধীরের পালা। বড় সুধীর মর্টন স্কুলের পুরাতন ছাত্র। নিত্যকার মঠের কথায় দুইটি ফল হয়। যাহারা মঠে যায় না তাহাদের যাইবার

ইচ্ছা হয়। আর যাহারা যায় তাহাদেরও সাধুসঙ্গের জন্য ব্যাকুলতার বৃদ্ধি হয়।

শ্রীম বড় নলিনীকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—সাধুদের সঙ্গে কিছু কথা হলো? বড় নলিনী বলিলেন, মায়ের কথা হয়েছিল। —কি কথা, বলুন শীগ্‌গীর—'স্থিত প্রজ্ঞস্য কা ভাষা'? যাঁরা real life lead (আদর্শ জীবন-যাপন) করছেন, তাঁরা কি বলেন শুনতে হয়, শ্রীম বলিলেন।

নলিনী বলিতেছেন—একবার কালীঘাটের একজন ভক্ত মায়ের কাছে দীক্ষা চাইলেন। বললেন আমাদের একজন গুরুদেব আছেন। কিন্তু তেমন কিছু বলেন নি সাধনভজন সম্বন্ধে। মা শুনে বললেন, যা শুনেছ তাই কাজে লাগাও, তাঁর কথায় বিশ্বাস করে। এতেই হবে। আর বললেন, দেখ একটা গাছে বসে বহু পাখী ডাকছে, নানা ভাবে। তেমনি ভক্তরা সকলে একজনকেই ডাকে, নানা ভাবে, নানা ভাষায়। তোমরা গুরুদেবের কথায় বিশ্বাস কর।

একবার একটি স্ত্রী ভক্ত দীক্ষা চাইলো। সে গর্ব করে দশ টাকার একটা নোট বার করে দিল দীক্ষার জিনিসের জন্য। মা তার এ ব্যবহার পছন্দ করলেন না। কান্নাকাটা করায় মহাষ্টমীর দিন দীক্ষা হবে ঠিক হল। ঐ দিন তার অস্পর্শদোষ হওয়ায় আর দীক্ষা হল না। শেষ অবধি মায়ের ইচ্ছাই ঠিক হল, তার আর দীক্ষাই হল না।

আর একবার একটি স্ত্রী ভক্ত কতকগুলি শিউলিফুল নিয়ে মায়ের কাছে আসে। ওর ইচ্ছা এই ফুল দিয়ে মাকে পূজা করে। কিন্তু আসামাত্রই মা ফুলের সাজিটা চেয়ে নিলেন, আর ফুল দিয়ে ঠাকুরকে সাজাতে লাগলেন। সাজান শেষ হয়ে গেছে। সাজিতে কয়টা ফুল পড়ে আছে। মা ডেকে বললেন, 'কই গো দেবে নাকি কয়টা ফুল, এই নাও।' ভক্তটি মায়ের পায়ে ফুল কয়টি দিয়ে কৃতার্থ বোধ করলো।

নিচে আহারের স্থান হয়েছে। মাকে ডাকতে একজন স্ত্রী ভক্ত উপরে গেল। একটু অন্তরাল থেকে ভক্তটি শুনতে পেলেন মা যেন কা'কে বলছেন, 'চল গো খাবে চল।' সে ঘরে অন্য লোক নাই। আছে

কেবল ঠাকুরের ছবি আর বালগোপালের মূর্তি। ভক্ত অগ্রসর হয়ে মাকে বললেন, কিগো কা'কে কি বলছো মা? মা উত্তর করলেন, কিছুই না, খেতে যেতে বলছি। চল। ভক্ত বুঝতে পারলো, যেন মায়ের পিছনে আরও দু'জন যাচ্ছেন।

একবার বলরামবাবুর বাড়ীতে দক্ষযজ্ঞ যাত্রা হচ্ছে। অভিনয় প্রসঙ্গে সতীকে বলা হচ্ছে, 'চল মা, তোমার পিত্রালয়ে চল। সেখানে যজ্ঞ হচ্ছে তোমায় নিয়ে যাই।' মা এই কথা শুনে আবিষ্ট হয়ে বলে উঠলেন, 'ও মা, আমি যাব না? আমি যাচ্ছি।' গৌরী মা শুনতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কি বলছো মা? মা উত্তর করলেন, 'কই, কিছুই না। শুনে থাকলেও বলো না।'

আর একদিন স্পষ্ট কথায় একজন ভক্তকে মা বলছেন, 'আমি আর ঠাকুর অভেদ।'

শ্রীশ্রীমায়ের এই সব কথা শ্রীম একটি গল্প-শ্রবণ-নিরত বালকের ন্যায় অতি নিবিষ্ট মনে শুনিলেন। কথা শেষ হইয়া গেল, তবুও কারো মুখে কথা নাই। একটি প্রশান্ত গম্ভীর ভাবে সকলের হৃদয় পূর্ণ।

ক্ষণকাল পর জামতাড়া যাওয়ার কথা হইতেছে।

বড় জিতেন (শ্রীমর প্রতি)—জামতাড়া যাওয়া হলে বাড়ীর কেউ সঙ্গে যাবেন কি?

শ্রীম—ভক্তের মত আত্মীয় আর কেউ নেই জগতে। তাই ক্রাইস্ট ভক্তদের দেখিয়ে বলেছিলেন, এরাই আমার বাপ মা, এরাই আমার ভাই, বন্ধু, সব। জ্ঞাতি—blood relations, সে তো মায়ার বন্ধন! আত্মীয়-কুটুম্ব যদি ভক্ত হয় তবে ভাল, নচেৎ মহাবন্ধন। ঈশ্বরকে ভুলিয়ে দেয়। (অন্তেবাসীর প্রতি) একটু উপনিষদ্ পাঠ হোক।

শ্রীম কঠোপনিষদের প্রথম বল্লী বাহির করিয়া দিলেন। নচিকেতার পরীক্ষা চলিতেছে।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—আহা, নচিকেতা কিছুই চাইতে পারলেন না, খালি ঈশ্বরকে চাইলেন। রাজ্য, আয়ু, গাড়ীঘোড়া, স্ত্রীপুত্র, ধনরত্ন

কিছুই না। শুধু আত্মজ্ঞান চাই, ঈশ্বরকে। ঠাকুরও কেবল মাকে চাইছেন, অন্য কিছু না। ‘মা, তোমার পাদপদ্মে শুদ্ধাভক্তি দাও’। এক বস্তু—মা!

দ্বিতীয় বল্লী পাঠ চলিতেছে।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—পারলেন না যম। প্রলোভনে কিছুই হল না। ‘ন ত্বা কামা বহুবোলোলুপন্ত’। নচিকেতা কোনও কামনার বশ নয়। ‘শুধু শ্রেয় চাই, প্রেয় নয়’। আত্মজ্ঞান শুধু কাম্য। (স্বগত) তর্ক করে তাঁকে কি জানবে? ‘নৈষা তর্কেন মতিরাপনেয়া’, বেদ বলছেন। চাই ব্রহ্মচর্য আর তপস্যা। (সকলের প্রতি) ঈশ্বর ছোটর ছোট, আবার বড়র বড়—‘অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্।’ দুর্বল লোক তাঁকে পায় না। আবার, প্রবচন মেধা আর বহু শ্রবণেও তিনি লভ্য নন। বই পড়ে তাঁকে লাভ হয় না। ব্যাকুল হয়ে ডাকলে তাঁর কৃপায় হয়—‘যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ’। এই নচিকেতার মত ব্যাকুল হলে তাঁর দর্শন হয়। শুধু আত্মজ্ঞান চাই, অন্য কিছু না—‘নান্যং তস্মান্নচিকেতোবৃণীতে’। সাধুসঙ্গ চাই। সাধুসঙ্গে ব্যাকুলতা বাড়ে। ব্যাকুল হলেই দর্শনের আর দেরী নাই। অরুণ উদয়ের পরই সূর্যোদয় হয়, তেমনি ব্যাকুল হলেই ঈশ্বরদর্শন হয়, ঠাকুর বলতেন।

একজন ভক্ত—মনই ঐ পথে যেতে চায় না। ব্যাকুলতা তো দূরের কথা।

শ্রীম—তাই সাধুসঙ্গ চাই। তাঁরা ব্যাকুল তাঁর জন্য। আর সর্বদা চেষ্টা করা তাঁর চিন্তা করতে। তাঁর চিন্তা, তাঁর কাজ, তাঁর সেবা। এ করতে করতে হয়। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী একদিন কীর্তন করলেন। শেষ হলে ঠাকুর বললেন, ‘এই কাজ হলো’। যতক্ষণ তাঁর নাম হয়, তাঁর চিন্তা হয়, ততক্ষণই real life—সত্যিকার জীবন। মায়ের কথা হল, উপনিষদ হল, এই প্রকৃত কাজ হল।

এখন রাত্রি দশটা।

বেলেঘাটা, কলিকাতা। ৭ই অক্টোবর ১৯২২ খ্রীঃ। ২০শে আশ্বিন, ১৩২৯ সাল, শনিবার।

তৃতীয় অধ্যায়

বিশ্বগায়িকা ম্যাডাম কালভের ধর্মজীবনে স্বামী বিবেকানন্দ

১

শ্রীম আমহার্স্ট স্ট্রীটে পায়চারী করিতেছেন, সঙ্গে বড় সুধীর ও অন্তেবাসী। অল্পক্ষণ হইল একজন সাধু উদ্বোধন হইতে আসিয়াছিলেন। তিনি শ্রীমকে বিজয়ার দর্শন ও প্রণাম করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। শ্রীম 'আমস্ হাউজ' পর্যন্ত গিয়া ফিরিয়া আসিলেন। এখন অপরাহ্ণ সওয়া ছয়টা। এইচ. বসুর বাড়ীর ফটকের সামনে ফুটপাথে একটি গাভী শুইয়া আছে। শ্রীম অন্তেবাসীকে বলিলেন, এই দেখ ইনি শুয়ে আছেন। পশুর কাজই এই—শয়ন, ভোজন, আর procreation (সন্তান উৎপাদন)। মানুষে ভগবানদর্শনের শক্তি আছে। যদি তার জন্য চেষ্টা না করে, তবে সেও এরই মত। ঈশ্বরদর্শন মানুষের সর্বপ্রধান কর্তব্য।

মর্টন স্কুলের প্রাঙ্গণ। শ্রীম পশ্চিমমুখী একখানা বেঞ্চে বসিয়াছেন। আর তাঁহার সম্মুখে তিন দিকে তিন খানা বেঞ্চ। সামনে বড় রাস্তা। কিছুক্ষণ নীরব। এইবার শ্রীম একটি যুবককে বলিতেছেন, আপনার বিয়ে হয় নাই এতদিন, কি আশ্চর্য! অত বড় হয়েছেন এখনও হয় নি কেন, কবে হবে? যুবক স্থিরভাবে উত্তর করিলেন, জানি না। শ্রীম পুনরায় বলিলেন, বেশ তো সাধুসঙ্গ হচ্ছে! তারপর হলেই তো ভাল! না হয়, কিছু দেরীতেই বা হলো? সাধুসঙ্গ যখন করছেন, মনে হয় আপনার বিয়ে হয় তো আর হবেই না। সাধুরা বিয়ে করেন না।

আজ ৯ই অক্টোবর ১৯২২ খ্রীস্টাব্দ, ২২শে আশ্বিন, ১৩২৯ সাল, সোমবার, কৃষ্ণা-চতুর্থী। নিত্যকার ভক্তগণ আসিয়া সমবেত হইতেছেন। মঠের কথা হইতেছে। একজন বলিলেন, নরওয়ের একজন সাহেব

(রাজা) মঠ ও উদ্বোধন দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। শ্রীম অন্তেবাসীকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, এই দুর্গাপূজার সময় মঠে কোনও ভক্তদের সঙ্গে পরিচয় হলো কি? অন্তেবাসী উত্তর করিলেন, আজ্ঞে হাঁ। হায়দরাবাদের একজন ভক্ত কৃষকের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। শ্রীম বলিলেন, হাঁ, ইনি অষ্টমীর দিন এখানে এসেছিলেন। খুব আন্তরিক ভক্ত। ঠাকুরের শরণাগত। এঁরা ফার্স্ট ক্লাস ভক্ত। ও দেশে খুব ভাল ভাল ভক্ত আছেন। অন্তেবাসী আবার বলিলেন, মাদ্রাজের আর একটি ভক্তের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। ইনি অষ্টমীর দিন মহাপুরুষ মহারাজের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেছেন। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, বাঙ্গালী গুরুর কাছে কেন দীক্ষা নিলেন? ভক্ত উত্তরে বললেন, সংস্কারম্। শ্রীম এই কথা শুনিয়া আনন্দে বলিলেন, আহা কি ব্যাকুল! কোথায় মাদ্রাজ, সেখান থেকে ব্যাকুল হয়ে এসেছেন মঠে। এঁদের দর্শন করলে চৈতন্য হয়। সংস্কার না থাকলে কি ঠাকুরের আশ্রয়ে আসতে পারে, সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে? বেশ করেছেন এঁদের সঙ্গে আলাপ করে। (সুধীরের প্রতি)—হাঁ সুধীরবাবু, তোমরা আলাপ কর নি? সুধীর উত্তর করিলেন, না। শ্রীম পুনরায় বলিতেছেন, 'they seeing see not; and hearing they hear not', একেই বলে চোখ থাকতে কানা, আর কান থাকতে কালা। সাধু, ভক্ত দেখলেই আলাপ করতে হয়। এতে অনেক শিক্ষা হয়, চৈতন্য হয়ে যায়।

সন্ধ্যার আলো জ্বলিতেছে। শ্রীম ভক্তসঙ্গে ঈশ্বরচিন্তা করিতেছেন। আধ ঘণ্টা পর শ্রীমর ইচ্ছায় ভজন হইতে লাগিল। একটি ভক্ত গাহিতেছেন, 'ফিরিয়ে নে মা তোর বেদের ঝুলি'। আর একজন শিবের গান গাহিলেন। শ্রীম এইবার ব্যাখ্যা করিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—'সে যে শ্মশানে মশানে ফিরে ঘরের ভাবনা ভাবে না।' 'শ্মশানে মশানে ফিরে' মানে, He lives in eternity (সমাধিমগ্ন), আর 'ঘরের ভাবনা ভাবে না', মানে, not in

time (বাহ্যজ্ঞান শূন্য)। মহাদেবের পরমায়ু মানুষের মত নয়—অনন্ত কাল। ওখানে ঘোরাফেরা করলে পৃথিবীর কিছুই খবর থাকে না। ঠাকুরের ঐটি সর্বদা হতো। মহাদেবের মত ঠাকুরও প্রায় সর্বদা ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য জগতের বাইরে থাকতেন। (তর্জনী দিয়া দুইটি বৃত্ত অঙ্কিত করিয়া) এই দু'টো circle (বৃত্ত)। একটা জগৎ, একটা ঈশ্বর। একটা বড় একটা ছোট। ছোটটি ছেড়ে বড়টিতে, মানে, 'ভূমা'তে চলে যেতেন। সেখানে পরিপূর্ণ ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করতেন। অনেক নিচে নেমে এসে কখনও বলতেন, 'বেদবেদান্ত সব খড়কুটোর মত মনে হচ্ছে। এখন রাত কি দিন বুঝতে পারছি না।' এইটিই মহাকারণ।

মানুষের ভিতর চারটি ভাগ আছে—স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ ও মহাকারণ। স্থূল বাইরের জগৎ নিয়ে থাকে, সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় মন নিয়ে থাকে। কারণ-শরীরের বিষয় আদ্যাশক্তির চিন্তা। মহাকারণে পৌঁছুলে সব তখন একাকার। স্থূল সূক্ষ্ম কারণ-এর অভাব হয়। মনের তখন নাশ হয়। মন মানে ইন্দ্রিয়ের বশীভূত মন, বাহ্য পদার্থ দ্বারা যার সৃষ্টি। এ অবস্থার নামই ব্রহ্মানন্দ। ব্রহ্মজ্ঞান মানে খুব বড় পদার্থের জ্ঞান যার দৃষ্টি জগৎ জুড়ে। কখনও দেখতুম, আকাশের দিকে চেয়ে ঠাকুর সমাধিস্থ। আকাশ খুব বড় বস্তু, wide—ব্যাপ্ত আর অনন্ত। তা দেখে তার যে কারণ তার কথা মনে হওয়া মাত্রই সমাধিস্থ হতেন। কিন্তু আমরা মানুষ, তা হৃদয়ে feel (ধারণা) করতে পারি না। আমাদের হৃদয় পরিষ্কার নয়, কর্মে আবৃত। শুধু পণ্ডিতদের কর্ম নয় এ বোঝা। সেখানে বুদ্ধির প্রবেশ নিষেধ। এক ছটাক বুদ্ধি, সে কি করে অনন্তের কথা বলবে ? এক সের ঘটিতে দশ সের দুধ ধরে না। এই সব কথা ঠাকুরের নিজের কথা। মন বড্ড ছোটলোক হয়ে যায় কখন কখন ঐ করে। একটা পিঁপড়ে যেমন চিনির পাহাড়ে গিয়ে মতলব করেছিল সবটা পাহাড় মুখে করে নিয়ে যাবে। শুধু বুদ্ধি দিয়ে ঈশ্বরের সম্বন্ধে বিচার করতে যাওয়াও তেমনি হীনবুদ্ধির কাজ।

শ্রীম (একটি যুবকের প্রতি)—ওয়েস্টের পণ্ডিতরা· কেউ কেউ ভারতের লোকদের barbarous (অসভ্য বর্বর) বলে। কারণ তাদের মতে ভারতের ইতিহাস নাই। আহা কি সুসভ্য ওরা! ওদের ইতিহাস আছে সত্য, কিন্তু কিসের ইতিহাস? না, History of bloodshed and rapine—মারামারি, কাটাকাটি, দাঙ্গা ফ্যাসাদের ইতিহাস। তাদের ইতিহাসে কি আছে? অত লোক ধ্বংস করে ইনি রাজা হলেন, বড় বড় প্রাসাদ বানালেন, খুব কামিনীকাঞ্চনের সেবা করলেন। অমন ইতিহাসের মুখে আগুন। আমরা চাই না এ ইতিহাস। ভারতের জাতীয় জীবনের যা বৈশিষ্ট্য তার ইতিহাস পূর্ণরূপে রয়েছে। রামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ—এঁদের জীবনচরিতগুলি কি? এই তো আমাদের জাতীয় ইতিহাস! যে জীবনচরিত পাঠ করলে মন ঈশ্বরের দিকে যায় না, তাকে এ দেশে সত্যিকার ইতিহাস বলে না। সত্য বস্তুর লীলা প্রকাশের কথাই এদেশের ইতিহাস। অত বড় রাজা, আলো দিতে একটু দেরী হয়েছিল এই অপরাধে, একজন লোককে ছাদের উপর থেকে ফেলে দিয়ে মেরে ফেলল—ছি, চাই না এ রকম ইতিহাস। ভারতের সনাতন আদর্শ 'শ্মশানে মশানে ফিরে ঘরের ভাবনা ভাবে না'—ব্রহ্মানন্দ। ওয়েস্টের আদর্শ রাজনীতি, সুনাম, সুযশ। ওরই মধ্যে একটু ভাল হয়ে থাকা। এ দেশের আচার্যেরা বলেন, সব ছাড়। কেবল একজনকে রাখ—'যতনে হৃদয়ে রেখো আদরিণী শ্যামা মাকে'। শুধু ঈশ্বর—আদর্শ। কেউ কেউ সংসার ভোগ করতে পারে, কিন্তু ঈশ্বরকে সামনে রেখে। 'তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু মাম্ অনুস্মর যুদ্ধ্য চ'—এই এ দেশের আদর্শ। ঘোর যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে এই মহান আদর্শ প্রচার ও পালন করেছেন ভারতের আচার্য। এ চিজ মিলবে কোথায়?

ও দেশে 'ব্রাহ্মীস্থিতি' প্রাপ্ত লোক বড় একটা দেখা যায় না। Socrates, he also falls short of it. (সক্রেটিসের কথা যদি বল, সেও কম পড়ে যায়।) অবশ্য in his own way, নিজের ভাবে তিনি বড় হতে পারেন। প্লেটো, বেইন, বেনথাম্, মিল, হারবার্ট

স্পেন্‌সার এঁরা কেউ তা লাভ করেন নি। এগনস্টিকস্‌রা বলে—Thus far shall thou go, and no further. ঈশ্বর আছে, এ কথা একেবারে অস্বীকার করে না, থাকে থাকুক ; কিন্তু বলে, এই বুদ্ধি দিয়ে, human intellect দিয়ে তাঁকে জানা যায় না। এ সব লোকের কথা শুনে লাভ কি ? হাঁ, ক্রাইস্টের কথা মানতেই হবে। ক্যাণ্ট বললেন, God is unknown and unknowable (ঈশ্বর অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়), ক্রাইস্ট বলছেন, 'As the Father knoweth me, even so know I the Father'. 'I and my Father are one'—(আমি ঈশ্বরকে জেনেছি। আমি আর তিনি অভেদ)। ক্রাইস্টের কথা revolution (প্রত্যক্ষ সত্য)। তাঁর প্রত্যক্ষের কাছে কারো যুক্তি টিকল না। সবকে চুপ করতে হলো। যারা সত্যের সন্ধান জানে না তাদের কথা নিতে নাই, হোক বিদ্বান, হোক পণ্ডিত। যে কাশী দেখেছে সে-ই কেবল কাশীর কথা বলার অধিকারী, এ ঠাকুরের কথা।

রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, ক্রাইস্ট, চৈতন্য, রামকৃষ্ণ—ঈশ্বর সম্বন্ধে, পরম সত্যের সম্বন্ধে—এঁদের কথা নেবো। এঁদের নিকট God revealed হয়েছেন (ঈশ্বর দেখা দিয়েছেন)। এঁদের বাণী বেদবাণী। ঠাকুর মাকে বলছেন—'মা, পাঁচজনে পাঁচ রকম বলছে। `এদের কারো কথা নেবো না, তুমি যা বলবে শুধু তাই নেবো।' বেদ ঋষিদের কাছে এইভাবে revealed (প্রত্যক্ষ) হতো। প্রত্যক্ষের কাছে শুধু পাণ্ডিত্য চলে না। তাই কখনও বলতেন, পণ্ডিতগুলো উঁচুতে ওঠে, কিন্তু দৃষ্টি ভাগাড়ে।

একজন ভক্ত—ত্যাগ কাকে বলে ?

শ্রীম—Perfect detachment from the sense world, সংসার ভুলে যাওয়া। এটি হয় মনে। শুদ্ধ মন ত্যাগের আশ্রয়। তাই ঠাকুর বলতেন, শুদ্ধ মন আর শুদ্ধ আত্মা, এক। মন যখন সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ হয়, তারই নাম ত্যাগ। ত্যাগই ব্রহ্ম। ব্রহ্মজ্ঞান মানে 'ছোট আমিটা' ছেড়ে 'বড় আমিতে' ডুবে যাওয়া।

সুতোয় আঁশ থাকলে ছুঁচে ঢুকবে না। লোহাতে মাটি থাকলে চুম্বক টানে না। তেমনি মন অশুদ্ধ থাকলে 'বড় আমি'র সন্ধান পায় না। ভোগ-বাসনা ময়লা। এতেই মন অশুদ্ধ হয়। যেই মনের ময়লা সরে যায় তক্ষুণি 'বড় আমি'র দর্শন হয়। মনশুদ্ধির জন্যই এই সব আয়োজন—সাধুসঙ্গ, তীর্থ, তপস্যা, ব্রত-নিয়ম, জপ-ধ্যান, গুরুসেবা।

শ্রীম চুপ করিয়া রহিলেন। ক্ষণকাল পর পুনরায় বলিতেছেন।

শ্রীম (সকলের প্রতি)—ব্যাকুলতা কেমন ? চুম্বকের সঙ্গে ছুঁচ যেমন। চুম্বকের সঙ্গে সঙ্গে ছুঁচ ঘুরছে। যারা ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুল, তাদের এই দশা। (সহাস্যে) একবার ঠাকুর বলরাম মন্দিরে রয়েছেন। বাসায় সারারাত আমার নিদ্রা নাই—প্রাণ ছটফট্ করতে লাগলো। কে যেন টেনে নিয়ে গেল বলরাম মন্দিরে। রাত তখন দু'টো। আমায় দেখেই বললেন, এসেছ, বেশ করেছ। আমি আগে থেকেই উঠে বেড়াচ্ছি, যেন পূর্ব থেকে প্রস্তুত।

শ্রীভগবানের অবতার-লীলার দিব্য সংবাদ তাঁহার পার্ষদের মুখে শুনিয়া ভক্তগণ বুঝি ক্ষণকালের জন্য জগৎ ভুলিয়া গিয়াছেন। তারপর শান্তিময় মনটি লইয়া স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন। রাত্রি এখন দশটা।

২

পরদিন ১০ই অক্টোবর মঙ্গলবার। শ্রীম চারতলার ছাদে বসিয়া আছেন চেয়ারে উত্তরাস্য। সমীপে দুই একটি ভক্ত উপবিষ্ট।

শ্রীম (জগবন্ধুর প্রতি)—আপনারা আজ মঠে যান্ নি ?

জগবন্ধু—বেলেঘাটায় ছিলাম। ভোরে হেঁটে মির্জাপুরের মোড় পর্যন্ত এসেও ট্রাম পাওয়া যায় নি। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে বেলা হয়ে গেছে দেখে আর যাওয়া হয় নি।

শ্রীম—তবে হয়েছে। চেষ্টা করেছেন তাতেই হয়েছে। আমাদেরও অমন হতো। দক্ষিণেশ্বর যাব। শোভাবাজারে শেয়ারের গাড়ী না পেলেই ফিরে আসতে হতো। শোভাবাজার থেকে গাড়ীতে

আলমবাজার, তারপর হেঁটে দক্ষিণেশ্বর। কখনও গাড়ীতে বরানগর, তারপর হেঁটে দক্ষিণেশ্বর। ফিরবার সময় বরাবর হেঁটে আসতে হতো রোজ। কতদিন গেছে শোভাবাজার এসে শেয়ারের গাড়ী না পেয়ে ফিরে গেছি।

শ্রীম (বড় জিতেনের প্রতি)—ঠাকুর মাঝে মাঝে ভক্তদের নিয়ে চাঁদনীর ঘাটে বসতেন। গঙ্গা দিয়ে যে সব নৌকো যেতো সে সব দেখতেন। (সহাস্যে) একদিন একটি মোটা ব্রাহ্মণকে দেখলেন একটা নৌকোয়। এই ভুঁড়ি, গলায় পৈতে ধবধবে। রংটি আবার কাল যেন আবলুস কাঠ। ভক্তরা ঐ লোকটিকে নিবিষ্ট মনে দেখছেন। ঠাকুর বুঝতে পেরে বললেন, এর কথা কি ভাবছো? এযে ঘাস-গাভীন্। ঘাস খেয়ে পেট এত বড় হয়েছে, অন্তঃসারশূন্য। বাচ্চা হবে না, দুধও পাবে না। ওর খাওয়াই সার।

'হিলিংবাম' (দুর্গাপদ মিত্র) আসিয়াছেন। তিনি শ্রীমকে বলিতেছেন, আজ স্বামীজীর কথা 'ইণ্ডিয়ান ডেইলী নিউজে' বের হয়েছে সব নূতন কথা। নিউইয়র্কের 'স্যাটারডে ইভিনিং পোষ্ট' থেকে উদ্ধৃত করেছে। ম্যাডাম কালভের (Calve) স্মৃতিকথা।

এই কথা শুনিয়া শ্রীম বালকের মত ব্যাকুল হইয়াছেন ঐ কাগজখানা দেখিতে। রাত্রি এখন প্রায় নয়টা। কাগজ পাওয়ার সম্ভাবনা নাই। তথাপি বারংবার অতি আগ্রহে বলিতে লাগিলেন, ওটি দেখলে হতো। শ্রীম ও ভক্তগণ সিঁড়ির ঘরে বসা। সিঁড়ির কাছে একটি ভক্ত বসিয়াছিলেন বেঞ্চে শ্রীমর সম্মুখে। শ্রীমর অত আগ্রহ দেখিয়া তিনি সকলের অলক্ষ্যে উঠিয়া নিচে নামিয়া গেলেন। তাঁর সঙ্কল্প কাগজ লইয়া ফিরিবেন—'ডেইলি নিউজের' আফিসে গিয়াই হউক, কিম্বা কারও বাড়ী হইতে, অথবা কোন হকারের কাছ হইতেই হউক, কাগজ চাই। কলেজ স্ট্রীট দিয়া ভক্তটি দ্রুতপদে চলিতেছেন। তারপর বৌবাজার দিয়া ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান স্ট্রীটের দিকে দৌড়াইয়া যাইতেছেন। তাঁহাকে তদবস্থায় দেখিয়া রাস্তার লোক কেহ কেহ দাঁড়াইয়া রহিল। লালদীঘির প্রায় নিকটে

একটি হকার মিলিল। সে বলিল, অতিরিক্ত দাম দিলে আনিয়া দিতে পারে। অতিকষ্টে একখানা কাগজ পাওয়া গেল। দাম চুকাইয়া দিয়া ট্রামে চড়িয়া ঠনঠনে নামিলেন, তারপর ঘর্মাক্ত কলেবরে হাঁফাইতে হাঁফাইতে মর্টন স্কুলে সিঁড়ির ঘরে উপস্থিত হইলেন। শ্রীম বিস্ময়ে বলিতে লাগিলেন, আমরা ভেবেছি আপনি হঠাৎ কোথায় অদৃশ্য হয়ে পড়লেন। জলে ভেজা মাছের মত হয়ে গেছেন যে ঘেমে। কোত্থেকে এলেন? ভক্ত উত্তর না দিয়া পকেট হইতে কাগজখানা বাহির করিয়া দিলেন। কাগজ দেখিয়া শ্রীমর আনন্দ ধরে না। বালকের ন্যায় আনন্দ—নূতন খেলনা পাইয়া। সেই আনন্দে ভক্তকে আশীর্বাদ করিতেছেন, বাঃ, খুব adventurous (দুঃসাহসী) তো! পড়ুন পড়ুন আপনি পড়ে শোনান সকলকে।

একটি যুবক পড়িতেছেন। শ্রীম নিবিষ্ট মনে শুনিতেছেন। অনেকটা পড়া হইয়া গিয়াছে। তিনি বলিলেন, আবার পড় প্রথম থেকে। পাঠক পড়িতেছেন, স্বামীজীর সঙ্গে প্রথম পরিচয় শিকাগোতে। ম্যাডাম কালভে তখন দুর্বিষহ মানসিক ব্যাধিতে ভুগিতেছেন। শরীর মন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে যৌবনের প্রারম্ভে। স্বামীজীর আশীর্বাদে নূতন জীবন লাভ করেন। তারপর প্যারিসে স্বামীজীর সঙ্গে পুনরায় দর্শন হয়। তারপর তুরস্ক, ইজিপ্ট ও গ্রীসে স্বামীজীর সঙ্গে ভ্রমণ। সঙ্গে ছিলেন বিখ্যাত দার্শনিক ফাদার হায়াসিন্থে লয়সন ও তাঁহার পত্নী, আর মিস্ মেকলাউড। শ্রীম পাঠ শুনিতে শুনিতে আনন্দে পূর্ণ হইয়াছেন, চোখে ও মুখে আনন্দের রশ্মি প্রতিফলিত। বুঝি বা শ্রীরামকৃষ্ণ মহিমাসাগরে মগ্ন। কিছুকাল নীরব থাকিয়া পুনরায় কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—ঠাকুর এসেছিলেন বলে স্বামীজীকে ও-দেশে পাঠালেন। আর তাতেই এমন সব লোক দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে এঁরা আসছেন। কি মহিমাই প্রচার হচ্ছে জগৎ জুড়ে! ম্যাডাম কালভে নিজেকে 'Songbird' অর্থাৎ গায়ক-পক্ষী বলেছেন। ওয়েস্টের লোকেরাও

তাঁকে ঐ বলে। ও-দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ গায়িকা। মঠে দেখ, মেকলাউড পড়ে আছেন। অত অসুবিধা—ম্যালেরিয়া, ভিন্ন দেশ, ভিন্ন ভাষা, কত অসুবিধা, কিন্তু কিছুতেই লক্ষ্য নেই। কত ঐশ্বর্যের ভিতর এঁরা মানুষ হয়েছেন, আর এখন কোথায়! মায়াবতীতে মিসেস সেভিয়ারস্ থাকতেন। সাধুদের উপর কি স্নেহ এঁদের, কত আপন-বুদ্ধি! দেশ, ঐশ্বর্য, আত্মীয়কুটুম্ব ছেড়ে এখানে আছেন। গোপী-প্রেমের কথা শোনা যেত। তাই এখন প্রত্যক্ষ হয়েছে। নিবেদিতাকে দেখ, এ দেশের জন্য দেহপাত করলেন খেটে খেটে গুরুর কথায়। ক্রিষ্টিনও রয়েছেন। কত মহৎ লোকই না দেখা যাচ্ছে তিনি আসায়! যখন বড়লাট আসেন তখন গভর্নর ও অন্য সব বড় কর্মচারীকে আসতে হয়। ঠাকুর এসেছেন—ভগবান মানুষ শরীর নিয়ে। যত গুণবান ও ভক্তিমান লোক সবাইকে আসতে হবে তাঁর কাছে।

শ্রীম এইবার কাগজখানা চাহিয়া লইলেন। চোখ বুলাইতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—দেখুন, স্বামীজীকে কি চক্ষে ওঁরা দেখছেন। বলছেন, (He) 'truly walked with God, a noble being, a saint, a philosopher and a true friend. His influence upon my spiritual life was profound....my soul will bear him eternal gratitude.' কি কৃতজ্ঞতা, 'eternal gratitude'—অনন্তকালের জন্য কৃতজ্ঞ! অমৃতত্বের সন্ধান দিয়েছেন তাই অত কৃতজ্ঞ। তাই বলে গুরুর ঋণ শোধ হয় না। অহেতুক কৃপাসিন্ধু গুরু। কেমন বলছেন, ইনি যথার্থই ঈশ্বরের সহচর মহামনা মহাপুরুষ। ইনি পরমতত্ত্ববেত্তা সত্যিকার সুহৃদ। যিনি ঈশ্বরের পথে নিয়ে যান, এই সংসারের জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের ভিতর থেকে তাঁকেই বলে 'সত্যিকার সুহৃদ'। আবার বলছেন স্বামীজী 'extraordinary man' (মহামানব)। নিজের কথায় বলছেন, স্বামীজীর সঙ্গে প্রথম দেখার সময়, 'I was at that time greatly distressed in mind and body.' মানসিক কষ্টে শরীর-মন ভেঙ্গে গিছল। আবার দেখার পর কি হলো? 'I became once

again vivacious and cheerful, thanks to the effect of his powerful will. আমার নূতন জন্মলাভ হল, পুনরায় আনন্দ ফিরে এলো, আর আমি এই মহাপুরুষকে বহু ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি—তাঁর এই অমানুষী কৃপার জন্য।' তারপরই বলছেন 'He did not use any of the ordinary hypnotic or mesmeric influences. It was the strength of his character, the purity and intensity of his purpose that carried conviction....he lulled one's chaotic thoughts into a state of peaceful acquiescence.' তার মানে তাঁর কোন যাদুবিদ্যা ছিল না। তিনি লোকের মনে বিশ্বাস উৎপাদন করতেন তাঁর সুমহৎ চরিত্র, পবিত্রতা আর লোককল্যাণ সাধনের দৃঢ় সংকল্প দ্বারা। তাঁর কাছে বসলে মনের সকল সংশয় ও অশান্তি আপনি দূর হয়ে যায়। এ সব কি আর কবিত্ব, তা নয়। নিজের জীবনে যা বুঝেছেন তাই বলছেন। একেও স্তব বলা যেতে পারে। এ সব evidence (সাক্ষ্য); স্বামীজী কি ছিলেন আর ওঁরা কি পেয়েছিলেন তাঁর কাছে।

শ্রীম (দুর্গাবাবুর প্রতি)—আর এ সিনটি কি মহৎ। কায়রোতে বাজারের মেয়েরা স্বামীজীকে ঠাট্টাপরিহাস করছে। তিনি তাদের হীন দশা দেখে বলছেন, 'Poor children; Poor creature! They have put their divinity in their beauty. Look at them now.' বাছারা, কি হতভাগ্য, কি হীন তাদের জীবন! এরা দেহের নশ্বর রূপের কাছে নিজের দেবত্ব বিক্রয় করে ফেলেছে—এই বলে একেবারে কেঁদে দিলেন তাদের দুঃখে। আর বললেন, এইবার চেয়ে দেখ, এরা নূতন মানুষ হয়ে গেছে। এদের দেবত্ব আবার ফিরে এসেছে। মেয়েরা অনুশোচনায় বলতে আরম্ভ করলে, 'Homre de dios—হে দেবমানব, আমাদের ক্ষমা কর। অপরাধ মার্জনা কর।' প্রথমে পরিহাস তারপর পূজা। আহা, কি স্নেহ, কি দয়া, এই একটি ঘটনায় মানুষকে চেনা যায়। কি হৃদয়, কত বড় মন, কি শক্তি!

এ যেন ড্রামা। ঠাকুর এসেছেন তাই এ সব হয়েছে। অবতার এলে হয় এ সব, সত্যিকার অভিনয়। ম্যাডাম কালভে মঠে এসেছিলেন। সাধুদের বলছেন, 'gentle philosophers'. (সৌম্য দার্শনিক)। বলছেন, 'The hours that I spent with these gentle philosophers have remained in my memory as a time apart. These beings—pure, beautiful and remote seemed to belong to another universe, a better and wiser world'. মঠে কয়েক ঘণ্টা থেকে বুঝতে পেরেছিলেন যেন ভূস্বর্গে আছেন। তাই বলছেন, সাধুরা যেন অপর একটি জগতের লোক, উন্নততর চিন্ময় ধামের অধিবাসী। কি পবিত্র, কি মনোহর তাঁদের জীবন! তাঁদের মন যেন দূরে, অতি দূরে—একটি শান্তিময়, আনন্দময় ধামে বিরাজ করছে।

কত বড় মহৎ এঁর মন—এই শেষের কথাগুলিতে বেশ বোঝা যায়। সাধুদের যে যত বুঝবে সে তত উঁচুতে উঠবে। কি উচ্চ অনুভূতি সাধুদের সম্বন্ধে! নিজে সাধু না হলে সাধুকে ধরতে পারে না। ধন্য আমরা, ভগবানের এই দিব্য লীলা দেখতে পেয়েছি। আরও কত মহিমা প্রচার হবে দিনে দিনে।

শ্রীম কিয়ৎকাল নীরবে থাকিয়া পুনরায় বলিতেছেন।

শ্রীম (বড় জিতেনের প্রতি)—এমন একটা সময় এসেছিল এ দেশে যখন 'ওয়েস্টকে' অনুকরণ করাই খুব বড় কাজ বলে মনে করতো সকলে। এখন দেখতে পাচ্ছি সব উল্‌টে যাচ্ছে। 'ওয়েস্ট'ই এ দেশের কথা শুনতে আরম্ভ করেছে। এই মহাকার্যটির অগ্রদূত স্বামীজী। এক ধাক্কায় এই মোহ ভেঙ্গে দিয়েছেন স্বামীজী শিকাগোতে। তারপরই যখন এ দেশে ফিরে এলেন, তখন যুবকরা সব তাঁর গাড়ী টানতে আরম্ভ করলো। তাঁরই শিক্ষা ও প্রচারের প্রভাবে নিজেদের সভ্যতার দিকে নজর দিতে লাগলো—আহার-বিহার-পোষাকে, শিক্ষা-দীক্ষায়। তার আগে খালি অনুকরণ করতো ওদের। টনি সাহেব

আমাকে এক চিঠিতে লিখেছিলেন বিলেত থেকে, 'ইণ্ডিয়ানদের কোট-প্যাণ্ট পরার চাইতে চোগা-চাপকান্ পরা ভাল। কোট-প্যাণ্ট পরলে এদের বাঁদরের মত দেখায়।' ইনি প্রেসিডেন্সি কলেজে আমাদের পড়াতেন। তারপর 'ডায়রেক্টার অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশন' হলেন। রিটায়ার করে বিলেত চলে যান। ও-দেশে যাওয়ার পরও আমাদের সঙ্গে পত্র-ব্যবহার ছিল বহু বৎসর। ভাল লোক ছিলেন।

ভক্তগণ এইবার প্রসঙ্গান্তর আরম্ভ করিলেন। অল্পক্ষণ মধ্যেই শ্রীম পুনরায় ঈশ্বরীয় কথাপ্রবাহ ফিরাইয়া আনিলেন। একটি চঞ্চল শিশুকে যেন বাহির হইতে ফিরাইয়া আনিয়া আবার মাতৃ-অঙ্কে স্থাপন করিলেন। শ্রীম সাধুসঙ্গ-মাহাত্ম্য বর্ণনা করিতে লাগিলেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—গৃহীদের সাধুসঙ্গের বড় দরকার। সাধুসঙ্গই একমাত্র ঔষধ। আর মাঝে মাঝে নির্জনবাস করা উচিত। একদিন দুইদিন তিনদিন, কিংবা বেশী, যার যেমন সুবিধা হয়। এটা হলো partial (আংশিক) সন্ন্যাস। এ কথাটা খুবই বলতেন ঠাকুর। নির্জনে গেলে আপনিই মনে চিন্তা এসে যায়, করছি কি, দিন যায়। মরণ সম্মুখে হাঁ করে বসে আছে। ব্যাঙের মুখে মাছি, ব্যাঙ রয়েছে সাপের মুখে, আবার ব্যাধের শরে সাপ। এই precarious (বিপজ্জনক) অবস্থা। নির্জনে গেলে এ কথা মনে হয়। সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য ভগবানদর্শন—এ মহামন্ত্রও হৃদয়ে জাগ্রত হয়।

সৎসঙ্গ করলে নির্জন বাসের ইচ্ছা জাগ্রত হয়। আবার নির্জন বাস করলে সৎসঙ্গে রুচি বৃদ্ধি হয়। যদি বল, সাধুরা তো সিদ্ধপুরুষ নন সব, তাঁদের সঙ্গে কি লাভ? তার উত্তর, তাঁদের মধ্যে সিদ্ধপুরুষও কেউ কেউ আছেন। তা ছাড়া তাঁরা একটি ভাল রাস্তায় দাঁড়িয়েছেন—vantage groundএ। সেখান থেকে এগিয়ে যাওয়া খুব সুবিধা।

আর মুক্তির কথা যদি বল, তা কি আর এক জন্মে হয় সকলের? কারো এক জন্ম, কারো দশ জন্ম, কারো শত জন্ম লাগে। 'ঘুড়ি লক্ষে একটা দুটো কাটে, হেসে দাও মা হাত চাপড়ি'। গীতায় কি আছে ডাক্তারবাবু, 'মনুষ্যাণাং.... ?'

ডাক্তার—মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিৎ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ॥

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—এই দেখুন শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, 'কশ্চিৎ মাং বেত্তি'। মানে খুব rare (দুর্লভ)। কি সাধু, কি গৃহী, সকলের এক জন্মে মুক্তি হয় না। তবুও মুক্তির জন্য চেষ্টা করা উচিত, যেমন খানদানী চাষা করে থাকে। এক বছর দু'বছর ফসল না হলেও সে চাষবাস করতে থাকবে। চেষ্টা ছাড়তে নেই। সেই জন্য গৃহীর সাধুসঙ্গের বড় দরকার। সাধুরা একটানা ঈশ্বরের ভাবটি নিয়ে রয়েছেন কি না। গৃহী পাঁচটায় মন দেয়। সাধুর কাছে গেলে গৃহীদের ছড়ান মন কুড়িয়ে আসে। ঈশ্বরদর্শন জীবনের উদ্দেশ্য, এ কথা মনে আসে। সাধুসঙ্গ বই উপায় নেই।

তিনি কি শুধু 'সাধুসঙ্গ কর' বলে বসে আছেন? তা নয়। সাধু করে দিয়েছেন। এই (বেলুড়) মঠ তিনি করেছেন আমাদের কল্যাণের জন্য। এর advantage (সুযোগ) নেওয়া উচিত।

শ্রীম (বড় অমূল্যের প্রতি)—যারা বেশী সেয়ানা, তারা ঠকে যাবে। কাক বড় সেয়ানা, কিন্তু পরের গু খেয়ে মরে—ঠাকুর বলেছিলেন। বেশী calculation (লাভ-লোকসান খতান) ভাল না। এ সব লোক ঠকে যাবে, যারা খালি খাঁটি সাধু খুঁজে বেড়ায়। নিজে কি তার দিকে নজর নেই, ফিরেও দেখছে না একবার। খালি অপরের দোষ দেখে বেড়ায়, 'খাঁটি সাধু' খোঁজে। এ সব লোকের কখনও খাঁটি সাধু জুটবে না। এ কি দোকানদারী? ঠাকুর বলতেন, দোষে গুণে মানুষ। নির্দোষ এক ঈশ্বর—অবতার ঠাকুর। আহা, মা বলেছেন, ''চন্দ্রে বরং কলঙ্ক আছে, কিন্তু রামকৃষ্ণ-শশীতে কলঙ্ক নাই'।

শ্রীম (যুবকের প্রতি)—যারা বিয়ে করে নি তাদের বড্ড chance (সুযোগ)। তাদের কেস্ খুব hopeful (আশাপ্রদ)। কারণ গোলোক-ধাঁধায় পা পড়ে নি তাদের এখনও। এতে আটকে গেলে মহাসঙ্কট।

বড় অমূল্য অনেকগুলি প্রশ্ন করিলেন—বই পড়ে যেমন করে থাকে। প্রশ্নগুলির কতক খুবই বিরক্তিজনক আর চাঞ্চল্যকর। কিন্তু প্রশান্তচিত্ত শ্রীম জননীর মত অতি প্রসন্নভাবে এক কথায় সকল প্রশ্নের উত্তর দিলেন।

শ্রীম (বড় অমূল্যের প্রতি)—ও সব কথায় কি হবে ? অবতারের কথা আমাদের শোনা উচিত। তিনি যা বলেছেন তাই পালন করতে চেষ্টা করা আমাদের উচিত। তিনি বলেছেন, নিত্য সাধুসঙ্গ কর, আর ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা কর, দেখা দাও বলে। আর মাঝে মাঝে নির্জন বাস। এ সব চেষ্টা করা উচিত।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—কর্মের ভিতর থাকলে ব্রহ্মাবস্থা, সমাধি হয় না। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে শ্রীকৃষ্ণের একবার ঐ অবস্থা হয়েছিল। ঐ দেখে পাণ্ডবরা ভীত হয়ে গেলেন। ভেবেছিলেন, বুঝি দেহত্যাগ করলেন। খুব rare (কচিৎ) হতো বলেই ওঁরা বুঝতে পারেন নি। কত কাজ তাঁর, জন্ম থেকে শেষ পর্যন্ত সর্বদা কাজ করেছেন। কিন্তু ঠাকুরের সর্বদাই হতো। একদিনের মধ্যেই বহুবার হয়েছে। একবার ছ'মাস ঐ অবস্থায় সম্পূর্ণ লীন হয়েছিলেন। চৈতন্যদেবেরও হতো পুরীতে। শেষের বারো বছর প্রায় ঐতে ডুবে থাকতেন। যিনি সর্বদা ঈশ্বরের সঙ্গে এক হয়ে থাকতেন, তাঁরই কথা আমাদের নেওয়া উচিত। অন্য কথা সব ত্যাজ্য। ঠাকুর বলেছিলেন, পুকুরের জল কুচোপানায় ঢাকা। একটা ঢিল মারল, তাতে খানিকটা জল দেখা গেল। আবার সব নাচতে নাচতে গিয়ে ঢেকে ফেললো। তেমনি আমাদের মন। চোখের সামনে অবিদ্যার পর্দা পড়ে আছে। তাতে দেখতে দিচ্ছে না। এটি কখনও একটু সরিয়ে নিলে একটু দেখা যায়, একটু উদ্দীপন হয়। আবার ঢেকে যায়। সর্বদা সাধুসঙ্গ করলে এটি হয় না। তাই সাধুসঙ্গের বড় দরকার। সাধুসঙ্গে সর্বদা উদ্দীপন হয়।

কখনও মন একটু ওপরে উঠে আবার নেমে যাচ্ছে। মনের গতিই নিচে নেমে যাওয়া, যেমন জল নিচে যায়। পতনের ভয় পদে

পদে। পতনের সময় বোঝবার যো নেই যে পতন হচ্ছে। এমনি কলমবাড়া পথ। ঠাকুর বলেছিলেন কেল্লায় গাড়ী কত নিচে নেমে গেছে প্রথম বোঝা যায় না। যখন দেখতে পায় সামনে তিনতলা ঘর তখন বুঝতে পারে কত নিচে নেমে এসেছে। তাই ঠাকুরের এক কথা—সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ। নিত্য নিয়মিত সাধুসঙ্গ। তাতেই কেবল হুঁশ থাকে। ১০. ১০. ১৯২২

শ্রীম সিঁড়ির ঘরে উপবিষ্ট। এখন সন্ধ্যা। কয়েকজন ভক্ত আসিয়াছেন। একটি যুবক মঠের বিবরণ দিতেছেন। আজ তাহার পালা ছিল। এই যুবকটিকে মহাপুরুষ মহারাজ 'ল' ছাড়িয়া দিতে বলিয়াছেন। সমস্ত সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিতে বলিয়াছেন। মহাপুরুষ মহারাজ বলিতেছেন, এখনই ছেড়ে দাও। আমার পরামর্শ এই—এই মুহূর্তে ছাড়। এতে মনুষ্যত্ব নষ্ট হয়ে যায়। তাই ঠাকুর উকীলদের সেবা গ্রহণ করতে পারতেন না। বুদ্ধি নাশ হয়ে যায় এতে। ওটা আবার একটা ব্যবসা! ও ব্যবসা করতে নেই। অর্থের প্রয়োজন থাকলে অন্য ব্যবসা কর, ওকালতী নয়। প্রেস ও পাব্লিকেশন ভাল—ইনটেলেক্চুয়েল কাজ এ-ও।

শ্রীম (যুবকের প্রতি)—'ল' পড়া ভাল কিন্তু প্র্যাক্টিস ভাল না। 'ল' পড়লে অনেক কিছু জানা যায়, শেখা যায়। 'হিন্দু ল' কি সুন্দর, ধর্মমূলক। 'ল অব এভিডেন্স', 'জুরিস-প্রুডেন্স' এ সবও ভাল। যাজ্ঞবল্ক্য, মনু, পরাশর, ব্যাস, বশিষ্ঠ ঋষিরা 'হিন্দু ল' করেছেন। আর কিছু কথা হলো?

যুবক—মহাপুরুষ মহারাজ শুকলালবাবুকে একটা সংবাদ পাঠিয়েছেন আমার মারফৎ। বলেছেন ঠাকুরের কৃপা তার উপর হয়েছে। তাকে বলো অবসর নিয়ে একটু ঈশ্বরচিন্তা করুক দিন কতক। বড় ছেলেকে নিজের কাজকর্ম বুঝিয়ে দিক। জেনারেল লাইনে পড়িয়ে লাভ নাই আজকাল। এর চাইতে ঢের ভাল নিজেদের কাজ করা।

যুবক—একজন সাধু একজন ভক্তকে বলেছিলেন, সৎকাজে

শুকলালবাবুর কিছু দান করা উচিত। একখানা বাড়ীর আয় দেবসেবায় লাগান উচিত। একখানা বাড়ী দান করুক।

শ্রীম—ঠাকুর থাকলে বলতেন, টাকা কড়ি যা আছে তা দিয়ে পরিবারের provision (ব্যবস্থা) করে নিশ্চিন্ত মনে ঈশ্বরকে ডাক। পরিবারের পেটের টান থাকলে ঈশ্বরচিন্তা হয় না। ঠাকুরকে দেখতাম কিসে ভক্তদের অবসর হয়, আর তাঁর চিন্তা করতে পারে সেই ভাবনা সর্বদা ভাবতেন। পরিবারের জন্য ভাবনা থাকলে কোন কাজ হয় না। (যুবকের প্রতি) আর কারও সঙ্গে কিছু কথা হলো মঠে ?

যুবক—মিস ম্যাকলাউডের কথায় মহাপুরুষ মহারাজ বললেন, তিনি গেস্ট হাউসের ওপরের ঘর করে থাকবেন। বিলিতি নিয়মানুসারে সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েরা নিচের ঘরে থাকতে রাজী নয়। কালী মহারাজ ওখানে থাকতে চেয়েছিলেন। ইনি এখন তিব্বতে যাচ্ছেন হেমিস্ মঠে। ম্যাডাম কালভের কথা হয়েছিল। বললেন, মঠের ঠাকুরঘরে হাঁটু গেড়ে গান গেয়েছিলেন জোড়হাতে। সে কি গলা! সুর কোথায় ওপরে উঠিয়ে দিলে, আবার নামিয়ে আনলে ধীরে ধীরে—যেন অনন্তে মিলিয়ে দিলে। মনে হচ্ছিল যেন কতকগুলি কোকিল একসঙ্গে গাইছে। এত সুমিষ্ট আর উঁচু এঁর কণ্ঠস্বর। ওয়েস্টে, সারা জগৎ ভরে ওঁর নাম। স্বামীজীর বড় ভক্ত।

শ্রীম—আর কিছু কথাবার্তা হল কোন সাধু ভক্তের সঙ্গে ?

যুবক—মায়ের কথা বলেছিলেন বড় নলিনী। মা বলতেন, 'বাবুরাম একবার তার মাকে বলেছিল, মা, ঠাকুর যা ভালবাসেন, তোমার ভালবাসা তার কাছে কিছু না। চার বছর বয়সে বাবুরাম তার মাকে বলেছিল, আমার বিয়ে দিও না, তাহলে মরে যাব।'

একদিন বরাহনগর মঠে আহারের কিছুই নেই। ছেলেরা, নরেন, নিরঞ্জন স্থির করলে কারো কাছে কিছু চাওয়া হবে না। উপোস করে সকলে ধ্যান-ভজনে লেগে গেল সারাদিন। সন্ধ্যের সময়

লালাবাবুর বাড়ী থেকে আপনি সব এসে গেল। এরূপ প্রায়ই হতো।

আর একবার নরেন পশ্চিমে স্টেশনে শুয়ে আছে চাদর মুড়ি দিয়ে। আহারাদি কিছুই হয়নি। এক ময়রা পুরি আলুর দম এই সব খাবার নিয়ে উপস্থিত হল। আবার কুঁজোয় করে ঠাণ্ডা জল আর তামাক সেজে এনেছে। নরেনকে খেতে বললে, সে নিতে চায় না। ময়রা তখন বললে, রামচন্দ্র তাকে সাধুর জন্য এ সব নিয়ে আসতে স্বপ্নে বলেছেন। সে দোকানে খেয়েদেয়ে বিশ্রাম করছিল। রামচন্দ্র স্বপ্নে কয়েকবার বললেন, সাধু অভুক্ত স্টেশনে শুয়ে আছে। তুমি এই সব সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে তাকে খাওয়াও। নরেন সব শুনে তখন নিলে।

তপস্যার সময় আলমোড়ায় একবার তিনদিন আহার নেই। একজন কবর প্রহরী তখন একটি শসা দিলে খেতে। আমেরিকা থেকে ফিরে এসে আলমোড়ায় যায়। এক সভার মাঝে তাকে দেখতে পেয়ে নরেন ওর হাত ধরে বলেছিল, প্রাণদাতা। আর তাকে পঁচিশটি টাকা দেওয়ালে।

কাশীপুর বাগানে দুধের বাটি হাতে নিয়ে উপরে উঠছি, ঠাকুরকে খাওয়াব। ওমা, পিছলে গিয়ে পড়ে গেলুম। আর পা-টা মচকে গেল। তিনদিন ওপরে যেতে পারি নি। নরেন তখন খাওয়াতো। আমার নাকে তখন নথ ছিল। ঠাকুর তখন আঙ্গুল দিয়ে নথের মত গোলাকার চক্র দেখিয়ে রঙ্গ করে বলেছিলেন, ওকে ঝুড়িতে করে নিয়ে আয় না। তাঁর রঙ্গ তামাসাও শিক্ষার জন্য।

রাখালকে তোমরা এখন মহারাজ দেখছ। বাছা আমার কত কাজ করতো, কত ডেকচি মেজেছে।

আমেরিকা থেকে এসে নরেন মঠে দুর্গাপূজা করলে। ঐ প্রথম পূজা। তাতে চৌদ্দ শ' টাকা খরচ হয়। খুব ধুমধাম। সব আয়োজন ঠিক। নরেন এসে বললে, 'মা আমায় জ্বর এনে দাও।' সঙ্গে সঙ্গে জ্বর হলো। আমি তো একেবারে অবাক্, নরেন কি কাণ্ড

করলে। পূজাও শেষ হলো আর তার জ্বর গেল। ভাল থাকলে ভুলত্রুটির জন্য হয়তো কাউকে গালাগালি করতে হতো, তাতে তাদের মনে কষ্ট হতো। তাই জ্বর আনলে।

অসংযমী যত মেয়েগুলো। কেউ বিশটা কেউ পঁচিশটা বিয়োবে। এদের জন্যই তো শরীরের অত সব রোগযন্ত্রণা, এই জ্বালা। নইলে এ শরীরের রোগ কিসের! (বারণ সত্ত্বেও কলকাতার কতকগুলি স্ত্রী-ভক্ত মায়ের পা ধরে প্রণাম করায় অসহ্য জ্বালা হয় পায়ে, তাতেই ঐ কথা বলেন।)

মায়ের কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অনেকগুলি ভক্ত এক সঙ্গে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কয়েকজন নূতন লোকও আসিয়াছেন। একজন একটি পত্রিকা (The World Magazine of New York) বাহির করিলেন। একজন আমেরিকাবাসী ভদ্রলোক একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন—'India's latest saint'—ঠাকুরের জীবনচরিত। একজন ভক্ত উহা পাঠ করিলেন। এইমাত্র মঠের নিত্যকার বিবরণ শুনিয়াছেন। আজকাল মর্টন স্কুলের ভক্তগণ মঠে সাধুদের প্রণাম করিতে গিয়া পায়ে হাত দেন না। আর তাহাতে সাধুগণ সন্তুষ্ট। এই সম্বন্ধে কথা হইতেছে।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—সাধুদের পা না ছোঁয়াই ভাল, তাতে যখন তাঁরা অস্বস্তি বোধ করেন। উদ্দেশ্য তাঁদের শুভেচ্ছা লাভ করা। পা খাবলাখাবলি না করলে যদি তাঁরা সন্তুষ্ট হন তাই করা উচিত। মন-ভ্রমরকে পাঠিয়ে দাও ঐ পাদপদ্মে। সাধুদের পা নারায়ণের পা কিনা! সাধুদের শরীর খুব যত্নে রক্ষা করতে হয়। মাটির ছাঁচ অতি যত্নে রাখে স্যাকরা, যত দিন না তাতে সোনা ঢালাই হয়। সোনা ঢালাই হয়ে গেলে আর এর প্রয়োজন নাই, তখন ফেলে দেয়। তেমনি সাধুর শরীর। যতদিন না এই শরীরে ভগবানদর্শন হয়েছে ততদিন অতি যত্নে রক্ষা করতে হয়। তাই অত সাবধান।

সাধুদের সেবা করা উচিত সাধ্যমত—অসুখের সময়ই হোক,

কি সুস্থ থাকার সময়ই হোক। ভাগ্যে থাকলে, পূর্বজন্মে পুণ্য করলে, এঁদের সেবা করা যায়। নচেৎ ঐ দিকে মনই যাবে না। সাধুর সেবা করার মানেই ভগবানের সেবা। নারায়ণজ্ঞানে সেবা করা, তার ফল মোক্ষলাভ। এ-ই সেবার শ্রেষ্ঠ ফল। দয়া করে সেবা করা, অর্থলাভ কিংবা সুনাম অর্জনের জন্য সেবা, অথবা স্নেহে আত্মীয়-স্বজনের সেবা করা—বিভিন্ন ভাবে সেবার বিভিন্ন ফল। আর্ত, নিরাশ্রয়েও তাঁর বিশেষ প্রকাশ। ভগবদ্‌বুদ্ধিতে এদের সেবায়ও উত্তম ফল হয়। যতক্ষণ তিনি দ্বৈতভাবে রেখেছেন, নিজের দেহের ভালমন্দ বোধ আছে, ততক্ষণ নারায়ণজ্ঞানে সেবা করা দরকার।

আর একটি অবস্থা আছে। সে অবস্থায় subject and object merge in the highest state of consciousness, দ্রষ্টা দৃশ্য থাকে না। এই সব জগৎ এক অখণ্ড চেতন-সত্বাতে বিলীন হয়ে যায়। এটি-ই সমাধি। যেমন নুনের পুতুল সমুদ্রের জলের সঙ্গে মিশে সমুদ্র হয়ে যায়। সেখানে তুমি আমি নাই, সেব্য সেবক নাই, জগৎই নাই, একমাত্র অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম। সে অবস্থাকে লক্ষ্য করে বেদ বলেছেন, 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'। এ অবস্থা যাঁর সর্বদা হতো, এমন একজনকে আমরা দর্শন করেছি। সে অবস্থার পর কেউ গাছের পাতা ছিঁড়লে চীৎকার করে উঠতেন, কষ্ট হতো। তখন সর্বত্র ব্রহ্মসত্বা অনুভব করতেন।

শ্রীম কিয়ৎকাল নীরব রহিলেন, কি ভাবিতেছেন।

শ্রীম (যুবকের প্রতি)—ঠাকুর একবার নরেন্দ্রকে বেদান্ত শিখিয়েছিলেন। বললেন, দশটা পাত্রে জল রয়েছে আর তাতে সূর্যের প্রতিবিম্ব পড়েছে, এখন ক'টা সূর্য দেখছিস্? নরেন্দ্র বললেন, দশটা প্রতিবিম্ব সূর্য আর একটা সত্যিকার সূর্য। ঠাকুর বললেন, আচ্ছা, একটা পাত্র ভেঙ্গে ফেল্, এখন কটা? নরেন্দ্র উত্তর করলেন, ন'টা প্রতিবিম্ব আর একটা সত্যিকার সূর্য। ঠাকুর পুনরায় বললেন, এরূপ করে ন'টা পাত্র ভেঙ্গে ফেল্, এখন কি দেখছিস্? নরেন্দ্র জবাব দিলেন, একটা প্রতিবিম্ব সূর্য ও একটা সত্যিকার সূর্য। ঠাকুর আবার

বললেন, এই পাত্রটাও ভাঙ., এখন কি রইলো? নরেন্দ্র বললেন, একটা সত্যিকার সূর্য রইলো।, ঠাকুর উত্তর করলেন, না রে, ও হলো না। একটা রইলো কি, কি রইলো তা বলবে কে? যে বলবে সেই নেই।

তাই বলেছিলেন বিদ্যাসাগর মশায়কে, সব উচ্ছিষ্ট হয়ে গেছে, ব্রহ্ম উচ্ছিষ্ট হননি। মানে, মুখে যা বলা যায় তাই উচ্ছিষ্ট। ব্রহ্মকে মুখ দিয়ে অর্থাৎ বাক্যাদি দ্বারা প্রকাশ করা যায় না।

ব্রহ্মজ্ঞান, সমাধি কি—এ দুটি দৃষ্টান্তে বেশ বোঝা যায়। উপনিষদেও এমন সরল ও সুন্দর উদাহরণ নেই।

এখন রাত্রি দশটা।

মর্টন স্কুল, ১১ই অক্টোবর ১৯২২ খ্রীঃ। ২৪শে আশ্বিন, ১৩২৯ সাল, বুধবার, কৃষ্ণা অষ্টমী।

চতুর্থ অধ্যায়

ভক্তজীবন সংগঠনে শ্রীম

১

মর্টন স্কুলের ছাদ। এখন সন্ধ্যা হয় হয়। নিত্যকার ভক্তগণ অনেকে আসিয়াছেন। কেহ বা অফিস হইতে সোজা আসিয়াছেন। আজ পালা ছিল বড় অমূল্যের মঠে যাইবার। তিনি সরকারী কর্ম করেন। শ্রীম মঠের বিবরণ তাঁহার কাছে এই মাত্র শুনিলেন। তিনি চেয়ারে বসিয়া আছেন উত্তরাস্য।

আজ বৃহস্পতিবার, ১২ই অক্টোবর ১৯২২ খ্রীস্টাব্দ। বাংলা ২৫শে আশ্বিন ১৩২৯ সাল, কৃষ্ণা সপ্তমী। সন্ধ্যার আলো আসিলে আধ ঘণ্টা সকলে ধ্যান করিলেন। বাহিরে হিম পড়িতেছে। তাই সকলে সিঁড়ির ঘরে আসিয়া বসিয়াছেন। এইবার শ্রীম সৎসঙ্গের মাহাত্ম্য কীর্তন করিতেছেন।

শ্রীম (বড় অমূল্যের প্রতি)—সাধুসঙ্গ বই আর উপায় নেই। তাই

মঠে যাওয়া খুব ভাল। আবার ও-দিকটাও লক্ষ্য রাখতে হয়, অফিসের কাজে ক্ষতি না হয়। প্রথম স্টীমারে গিয়ে প্রথম ফিরতি স্টীমারে ফিরে এলে হয়।

বড় অমূল্য—আমার অফিস আজকাল এক্টায়।

শ্রীম (আহ্লাদে)—সব ঠাকুরের ইচ্ছা। এই যে সুবিধা হল তাও তিনিই করে দিয়েছেন। সকালে মঠে বসে এক ঘণ্টা বেশ জপধ্যান করতে পারবেন। একি কম সুবিধা হল, এটি উপভোগ করা উচিত। ঐ সব স্থানে জপধ্যান করা, আর বাড়িতে বসে করা অনেক তফাৎ। ও-সব স্থানে আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে। একটু কিছু করলেই চৈতন্য হয়ে যায়। ও-সব স্থানে সাধুরা কত সাধন-ভজন করেছেন, কত ভাবে কেঁদেছেন তাঁর জন্য। তারপর দর্শন। এখনও চলছে ঐ সব। স্বামীজী, রাখাল মহারাজ, বাবুরাম মহারাজ, হরি মহারাজ প্রভৃতি সাধুরা কত ডাকা ডেকেছেন ওখানে। এখনও তারক মহারাজ রয়েছেন। মঠ পবিত্র হয়ে গেছে, মহাতীর্থ।

আর একটি মহাতীর্থ দক্ষিণেশ্বর। পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ তীর্থস্থান। ভগবান নরদেহে ওখানে ত্রিশ বছর ছিলেন। ঠাকুরের লীলাস্থল দক্ষিণেশ্বর। প্রথমে সাধন, তারপর নানারূপে ঈশ্বরের সঙ্গে দিব্য বিলাস, আর শেষে ভক্তসঙ্গে প্রেম আস্বাদন—এ সবেরই লীলাভূমি দক্ষিণেশ্বর। ঠাকুর বলেছিলেন, তিনি পঞ্চবটীতে মাটির উপর পড়ে থাকতেন, দিনের পর দিন কত কান্না কেঁদেছেন জগদম্বার দর্শনের জন্য। সাপ উপর দিয়ে চলে যেত, হুঁশ নেই। তারপর মায়ের দর্শন পেয়ে, কথা কয়ে তবে শান্তি।

মঠের আর দক্ষিণেশ্বরের সব দেখতে হয় খুঁটিনাটি করে, গাছপালা পর্যন্ত। সবটা ছবি মনে এঁকে ফেলা। তবে তো ধ্যানের সময় সেই ছবি মনে উঠবে। ছোট একটি ফুলগাছের কথা মনে পড়লেও সম্পূর্ণ ছবিটি এসে পড়বে সঙ্গে সঙ্গে। তখন ক্রমে ঠাকুরকে মনে পড়বে, আর মা কালীকে। যাদের নিত্য কিংবা প্রায়ই যাবার সুবিধা হয় না, ভাল করে দেখা থাকলে বাড়ীতে বসেও তাদের মনকে ও-সব মহাতীর্থে

পাঠিয়ে দিতে পারে অনায়াসে। আমরা নিজেও তাই করি। ঠাকুরের মহাবাক্য রয়েছে, মন যেখানে তুমিও সেখানে।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—সাধু মাত্রেই নারায়ণ। তাই সকলকেই শ্রদ্ধা করা উচিত। সকলের কাছে বসতে হয় আর তাঁদের কথা শুনতে হয়। কিন্তু চলতে হবে একজনের কথায়, শ্রীগুরু যিনি। কাজ করা তাঁর কথা মত। নইলে যে গোলমাল হয়ে যাবে সব পাঁচজনের কথায় চলতে গেলে! নানা মুনির নানা মত। কিন্তু সকল সাধুদেরই ভক্তি শ্রদ্ধা করা, আর সাধ্যমত সেবা করা।

শ্রীম (রমেশের প্রতি)—সব তাঁর 'অণ্ডারে'—ঠাকুর বলেছিলেন। সব তাঁর হাতে। যারা খুব নিকটে থাকে তারা সব দেখতে পায়। যেমন পুতুলনাচ, যারা নিকটে বসে তারা দেখতে পায় অপর একজন ধরে নাচাচ্ছে। যারা দূরে থাকে তারা মনে করে পুতুল আপনি নাচছে। ঐরূপ মানুষ সব, যেন কাঠের পুতুল! সব করাচ্ছেন তিনি হৃদয়ে থেকে; মানুষ মনে করে 'আমি করছি'। যারা তাঁর নিকটে গেছে, তাঁর দর্শন লাভ করেছে তারা দেখতে পায় তাঁর হাত। 'যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া'।

জনৈক ভক্ত—ধ্যান করতে বসলে মন নানা দিকে ছড়িয়ে পড়ে, এখন স্থির হয় কি করে?

শ্রীম—অভ্যাস করতে করতে হয়। একদিনে কি আর হয় মন স্থির? বাসনায় সর্বদা দোলাচ্ছে। তবে যদি কেউ চায় মন স্থির করতে, তার উপায় আছে। ভগবান যা বলেছেন তা পালন করতে হয়, অন্ততঃ চেষ্টা করতে হয়। 'অভ্যাস' আর 'বৈরাগ্য' দ্বারা হয়, গীতায় আছে। অভ্যাস করতে যাওয়ার পূর্বে চাই দৃঢ় সঙ্কল্প—resolution 'আমি করবোই' এরূপ প্রতিজ্ঞা। তারপর সকাল, মধ্যাহ্ন ও সন্ধ্যায় বসতে হয় ঠিক সময়ে। আজ এখন, কাল তখন করলে হবে না। একটি আদর্শ স্থির করে তাতে ছড়ান মনটিকে ধৈর্য সহকারে কুড়িয়ে এনে লগ্ন করতে হয়। মন চঞ্চল বালকের মত পালাতে চায়। খুব যত্ন সহকারে বার বার চেষ্টা করে বসান চাই। একেই 'অভ্যাস'

বলে। আর 'বৈরাগ্য' মানে, সৎ অসৎ বিচার। ঈশ্বর সত্য আর সব অনিত্য। দেহ যে অত প্রিয় তা-ও অনিত্য, এ বিচার করতে হয়। কখন দেহ চলে যায় তার নিশ্চয় নাই।* জন্মের সময় যে প্রতিজ্ঞা করে এসেছি তাঁর ভজন করবো, সে কথা পালন করা উচিত। আর বেদ ও অবতার বলছেন মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য এই শরীরে ঈশ্বরদর্শন করা। আমি তার জন্য করলুম কি? এ সব চিন্তা করতে হয়।

আর এক উপায় আছে। প্রথমে মনকে মঠে পাঠিয়ে দিতে হয়। মঠের বাড়ীঘর, গাছপালা, মন্দির প্রভৃতিতে সে ঘুরতে থাকুক। তারপর ধীরে ধীরে ধ্যানের বস্তুটিতে, আদর্শে—যেমন ঠাকুর, বসিয়ে দিতে হয়। কখনও মনে করা সাধুদের সঙ্গে বসে আছি, তাঁরাও ধ্যান করছেন, আমিও ধ্যান করছি। ধ্যান মানে বাইরের নানা বস্তু থেকে মনটি উঠিয়ে নিয়ে আদর্শে, ধ্যেয় বস্তুতে লগ্ন করা।

একজন সেতার শিখছে। প্রথমটা ভারি বেসুরো হচ্ছে। আঙ্গুল ঠিক পড়ছে না তারগুলোতে। একটা ধরতে গিয়ে অপরটাতে হাত

---

*পূর্বযোনি সহস্রাণি দৃষ্ট্বা চৈব ততো ময়া। আহারা বিবিধা ভুক্তাঃ পীতা নানাবিধাঃ স্তনাঃ।
জাতশ্চৈব মৃতশ্চৈব জন্ম চৈব পুনঃ পুনঃ। যন্ময়া পরিজনস্যার্থে কৃতং কর্ম শুভাশুভম্॥

একাকী তেন দহ্যেঽহং গতাস্তে ফলভোগিনঃ। অহো দুঃখোদধৌ মগ্নো ন পশ্যামি প্রতিক্রিয়াম্॥
যদি যোন্যাঃ প্রমুচ্যেঽহং তৎপ্রপদ্যে মহেশ্বরম্। অশুভক্ষয় কর্তারং ফলমুক্তিপ্রদায়কম্॥
যদি যোন্যাঃ প্রমুচ্যেঽহং তৎপ্রপদ্যে নারায়ণম্। অশুভক্ষয়কর্তারং ফলমুক্তিপ্রদায়কম্॥

... ...

যদি যোন্যাঃ প্রমুচ্যামি ধ্যায়ে ব্রহ্ম সনাতনম্। (গর্ভোপনিষৎ)

আমি সহস্র সহস্র যোনি পরিভ্রমণ করিয়াছি। নানাবিধ আহার ও স্তন্য দুগ্ধ পান করিয়াছি। জন্মের পর মৃত্যু, তারপর আবার জন্মলাভ করিয়াছি। পরিজনের জন্য যে সকল শুভ ও অশুভ কর্ম করিয়াছি সেই সকল কর্মফলে আমি একাকী দগ্ধ হইতেছি। কর্মের ফলভোগী কুটুম্বগণ সকলে আমাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। হায়, এখন আমি মহা দুঃখসাগরে নিমগ্ন। পরিত্রাণের কোনও পথ পাইতেছি না। যদি এইবার যোনি হইতে মুক্ত হইতে পারি তবে অশুভ বিনাশকারী মুক্তিদাতা মহেশ্বরের নিশ্চয় শরণ লইব, নারায়ণের নিশ্চয় শরণ লইব, ব্রহ্মসনাতনের নিশ্চয় ধ্যান করিব।

পড়ে যাচ্ছে। দৃঢ় সঙ্কল্প থাকলে এই বেসুরো ভাব কেটে যাবে ক্রমে। তখন রাত দু'টোর সময় বসে বাজাও, ঠিক বাজবে অন্ধকারেও।

ডাক্তার কার্তিক—মানুষ ইচ্ছা করলেই কি ব্যাকুল হতে পারে ঈশ্বরের জন্য ?

শ্রীম—ব্যাকুলতা, ঈশ্বরলাভের তীব্র ইচ্ছা, তা কি আর তিনি আমাদের ইচ্ছায় দেবেন ? তা নয়। তাঁর যা ভাল মনে হয় তাই করেন। তবে আমাদের চেষ্টা করা উচিত, আর প্রার্থনা—বাবা, আমায় জানিয়ে দাও, আমি তোমার ছেলে, এই বলে। আমাদের ইচ্ছায় করতে গেলে যে তাঁর সব গোল হয়ে যাবে। তিনি সমস্ত বিশ্বটাই তাঁর ইচ্ছায় চালাচ্ছেন, আবার একটা ব্যক্তিকেও, individualকেও চালান। আবার পিঁপড়ের গতিবিধিও তাঁরই কাজ।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—বিকারের রোগী কি না চায় ? বলে, এক জালা ঠাণ্ডা জল খেতে দাও, এক থালা পান্তা ভাত খেতে দাও। কিন্তু কেউ তা দেয় না। তাতে দু'য়েরই বিপদ। কবরেজ বসে ভড়র্ ভড়র্ করে তামাক খাচ্ছে। যেন কোন কথা তার কানে যাচ্ছে না। আত্মীয়রা হয়তো কেউ বললে—মশায়, এক জালার জায়গায় একটুখানি জল তো দিন, আহা, চাইছে অমন করে। অমনি ধমক দিচ্ছে—না, ও বিষয় তোমরা কি জান ? যাতে ভাল হয় তাই আমি করবো। এক বিন্দুও দিলে না জল।

ছেলে মাকে ধরেছে, ঘুড়ি কিনবার পয়সা দাও। খাচ্ছে না, কাঁদছে আর আছাড় পিছোড় খাচ্ছে। মা এলো, কিন্তু পয়সা দেওয়ার নামটিও নেই। উল্টে ধম্ ধম্ করে পিঠে লাগিয়ে দিলে কয়েক ঘা। কেন ? না, মা জানে এতে ছেলের অনিষ্ট হবে। বাড়ীর ছাদ ভাঙ্গা। ঘুড়ি উড়োতে গিয়ে পড়ে যাবে, আর হাত পা ভাঙ্গবে।

যাতে আমাদের মঙ্গল হবে ঈশ্বর তাই করেন। ওঁর কার্যের criticism (সমালোচনা) করা উচিত নয়। ওসব করা একেবারে foolishness (মূর্খতা)। বেদ বলছেন ঈশ্বর সর্বমঙ্গলময়।

শ্রীম (ডাক্তার কার্তিকের প্রতি)—পূর্বজন্মের সংস্কার, এটা

হলো ব্যাকুলতার general rule (সাধারণ নিয়ম)। যত বড় *সংস্কার, ততখানি ব্যাকুলতা। কৃপার কথা স্বতন্ত্র। ঠাকুর বলেছিলেন,* একজন এক বোতল মদ খেল কিন্তু তার কিছুই হলো না। আর একজনের এক গ্লাস খেতে না খেতেই নেশা, একেবারে বেহুঁশ। তার মানে এই, সে সারা রাত ধরে মদ খেয়েছে। তাই এখন একগ্লাসেই বেহুঁশ।

শ্রীম (দুর্গাপদর প্রতি)—পূর্বজন্মের সংস্কার থাকলে এ জন্মে শীঘ্র হয়। ভগবান যে সৎবুদ্ধি দেন এ তাঁর কৃপা। বাকীটা নিজে করে নেবে, তিনি তা চান। অনেক তপস্যার ফলে লোক সাধুসঙ্গ করতে চায়। মঠাদিতে যায়। যারা নানা কাজের ভেতরও মঠে যায় বুঝতে হবে তারা সংস্কারবান্। এইরূপ ভক্তদের জন্য ঠাকুর মার কাছে কেঁদে কেঁদে প্রার্থনা করতেন—'মা এদের মনোবাসনা পূর্ণ কর'। ভক্তদের উপর কত কৃপা তাঁর! ঠাকুরের সেবা হচ্ছে না ভাল, তাতে মা হয়তো রাগ করছেন। কিন্তু ঠাকুর তাদের হয়ে প্রার্থনা করছেন, 'মা, ওদের কত কাজ, কত ঝঞ্চাট সংসারে। তাদের দোষ নিও না। তুমি কৃপা কর তাদের, মা।'

শ্রীম কিছুক্ষণ চুপ করিয়া আছেন। আবার কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (শুকলালের প্রতি)—কলুর বলদ দেখেননি আপনারা? ঘুরতে ঘুরতে এক এক গ্রাস খেয়ে নেয়। (সহাস্যে) গিন্নির কত কাজ। ভাত রাঁধা, খাওয়ান, ছেলেকে মাই দেওয়া, বাসন মাজা, ঘর নিকানো, আবার আলো দেওয়া—কত কি কাজ। এর ভেতরও পতিকে এসে একটু হাওয়া করে গেল। গৃহের শত ঝঞ্চাটের ভিতরও যারা সাধুসঙ্গ করে তারাই ধন্য। সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ, এ বই আর উপায় নেই।

ভক্তগণ কেহ কেহ অফিসে কর্ম করেন। সকালে মঠে গিয়া বেশীক্ষণ থাকিতে পারেন না, এই আক্ষেপ উক্তি শুনিয়া শ্রীম তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা দিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—প্রথম ফিরতি স্টীমার বুঝি ৭-৩৫ মিনিটে। এই যাওয়া-আসা কি কম কথা? ঠাকুর বলতেন, অমৃত-

সাগরের জল কলসী কলসী খেলেও অমর হয়, আর খড়কে দিয়ে একটু খেলেও অমর হয়। যাদের অন্য কাজ আছে তাদের পক্ষে রোজ গিয়ে অল্পক্ষণ থেকে এলেও যথেষ্ট। দর্শন করলেও কত লাভ। (একজন ভক্তের প্রতি) পত্র পাঠ হোক।

একজন ৺কাশী, বিন্ধ্যাচল ও প্রয়াগ দর্শন করিয়াছেন। তাঁহার পত্র পাঠ হইল। আর একজন সাধু ৺কন্যাকুমারী হইতে লিখিয়াছেন। তাঁহার পত্রও পাঠ হইল। ইনি খামের মধ্যে দেবীর প্রসাদী ফুল ও সিন্দুর পাঠাইয়াছেন। তীর্থযাত্রীদের প্রেরিত দেব-দেবীর প্রসাদ ভক্তগণ মস্তকে ধারণ ও গ্রহণ করিতেছেন।

শ্রীম (সকলের প্রতি)—প্রসাদ দর্শন, স্পর্শন ও ভক্ষণ করতে হয়। একস্থানে বসে কত তীর্থ আপনারা করছেন; দেখুন। আর পুরাণপাঠ শ্রবণ করলেন। ভক্তের চিঠি সব পুরাণ, ঠাকুর বলতেন। তিনি স্পর্শ করে বুঝতে পারতেন, চিঠি ভক্তদের কিম্বা অপর লোকের। ভক্তদের চিঠি হলে খুব সুখ্যাত করতেন। অপর লোকের চিঠি হলে ছুঁড়ে ফেলে দিতেন—যেমন সাপ দেখলে ভয় হয় তেমনি। অন্য লোকের চিঠিতে বিয়ের কথা থাকে। সাধু, ভক্তের চিঠি পড়লে ঈশ্বরের উদ্দীপন হয়।

"রাত হয়েছে ওঠা যাক্"—এই বলিয়া শ্রীম উঠিয়া পড়িলেন। ভক্তগণও প্রণাম করিয়া বিদায় লইলেন। এখন দশটা।

২

পরদিন শুক্রবার, বিকাল পাঁচটা। চারতলার সিঁড়ির ঘরে কয়েকজন ভক্ত বসিয়া আছেন। পাশেই শ্রীমর ঘর। তিনি দরজা বন্ধ করিয়া ভিতরে রহিয়াছেন। কিছুক্ষণ পর বাহিরে আসিয়া যুক্ত করে বলিতেছেন "নমস্কার, নমস্কার।" তারপর দরজার পাশে জোড়া বেঞ্চির পশ্চিম প্রান্তে বসিয়া পড়িলেন দক্ষিণাস্য।

শ্রীম (অন্তেবাসীর প্রতি)—আজ মঠের খবর কি বলুন।

অন্তেবাসী—আজ একজন ভদ্রলোক মহাপুরুষ মহারাজের

কাছে দীক্ষা চেয়েছিলেন। তিনি তাকে এইরূপ উপদেশ দিলেন।

মহাপুরুষ (দীক্ষাপ্রার্থীর প্রতি)—তোমরা দীক্ষা দীক্ষা কর। আরে বাবা, আমি কানে ফুঁ মেরে একটা কথা বলে দিলেই কি আর ঈশ্বরদর্শন হয়ে যাবে? মাকে জানাও। কাঁদ মার নিকট, প্রার্থনা কর মার কাছে। তাঁর কাছে চেয়ে কেউ খালি হাতে ফিরে আসে নি এ যাবৎ। তাঁকে জানাবে না, খালি বলবে 'দীক্ষা'। আরে, সাধুর বাক্য সবই দীক্ষা। ব্যাকুল হয়ে কাঁদ মার কাছে—মা, আমার অজ্ঞানতা দূর কর, ক্ষুদ্রতা ঘুচিয়ে দাও।

দীক্ষাপ্রার্থী সম্প্রতি বিপত্নীক হইয়াছেন।

মহাপুরুষ (দীক্ষাপ্রার্থীর প্রতি)—তোমার এখন মহা সৌভাগ্য। ঠাকুর কৃপা করেছেন। ঐ সব ক্ষুদ্র বিষয় থেকে মন উঠিয়ে নিয়ে মাকে ডাক প্রাণভরে। মানুষ মনে করে দু'টো টাকা, স্ত্রীপুত্র, এ সব খুব বড় জিনিস। কিন্তু তারা যখন বৃহতের আস্বাদ পায় তখন বুঝতে পারে এ সব অতি তুচ্ছ। তুমি এখন এই তুচ্ছ জিনিস ছাড়, ভুলে যাও সব ক্ষুদ্রতা। বৃহতের চিন্তা করে বৃহৎ হয়ে যাও, পরমানন্দ লাভ কর।

শ্রীম (সাহ্লাদে সকলের প্রতি)—বাঃ, কি অমূল্য কথা! একেবারে চৈতন্য করিয়ে দেয়। (অন্তেবাসীর প্রতি) আর কিছু কথা হলো?

অন্তেবাসী—আর একজন ভক্ত ৺কন্যাকুমারী যাবেন। তিনি শ্রীমহাপুরুষ মহারাজের আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি এই সব কথা বলেন।

মহাপুরুষ (তীর্থযাত্রীর প্রতি)—তীর্থ দর্শন, এ খুব ভাল। এতে ভগবানের উদ্দীপন হয়। কিন্তু আজকাল তীর্থস্থানগুলি যা হয়ে দাঁড়িয়েছে, যেন এক একটা ব্যবসার স্থান—টাকাকড়ি, জোর-জবরদস্তি। আর বিগ্রহ থাকলেই যে সেখানে দেবতা থাকেন তা নয়। কি সব কুৎসিত মন পুরোহিতগুলোর! কত কলুষিত বাসনা তাদের মনে! এ সব লোক পুজো করছে! ওখানে কি আর দেবতা থাকতে পারেন?

একবার ঠাকুর কালীঘাট দর্শন করতে গিছলেন। মাঝে মাঝে যেতেন। মন্দিরে ঢুকে দেখেন মায়ের মূর্তি আছে, কিন্তু মা নাই। এক কদাকার কুৎসিত-চিত্ত ব্রাহ্মণ মায়ের পুজো করছে। আর পূজোর যোগাড় দিচ্ছে একটি স্ত্রীলোক। সে আবার তারও বাড়া—এমনি মলিন মন। এই চিত্রটি দেখে ঠাকুরের মন খুব খারাপ হয়ে গেল। ভাবলেন, এলুম মাকে দেখতে আর না দেখেই চলে যাব, তা হবে না। আচ্ছা, গঙ্গা স্পর্শ করে আসছি। তারপর যেই ঠাকুর আদিগঙ্গার ঘাটে গেলেন অমনি দেখতে পেলেন, মা গঙ্গার উপর খেলে বেড়াচ্ছেন।

মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) গেছলেন তিরুপতি দর্শন করতে। সেখানে মন্দিরে বালাজীর পুজো হয়—বিষ্ণুমূর্তি। কিন্তু মহারাজ দেখলেন দেবীমূর্তি। বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলেন পূর্বে দেবীমন্দির ছিল সেটি। রামানুজ আচার্য বিষ্ণু স্থাপন করেছেন।

পুরীতে জগন্নাথের মন্দির খুব জাগ্রত স্থান। লক্ষ শালগ্রামের উপর মহাদেব বসে আছেন, মা-ঠাকরুণের এই দর্শন হয়েছিল মন্দিরে। আমি নিজে কিছু দেখতে পাইনি সেখানে। প্রথম যখন যাই, সঙ্গে মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ)। গর্ভমন্দিরে ঢুকেই তাঁর খুব উচ্চভাব হয়ে গেল। আমার মনও প্রেমভক্তিতে খুব উঁচুতে উঠে গেল। তারপর কি হলো আর বলতে পারি না।

শ্রীম স্থির, প্রসন্নবদন, মুখে কোনও কথা নাই। তিনি কি ভাবিতেছেন, 'আমিই জগন্নাথ' ঠাকুরের এই মহাবাক্য। পনের মিনিট পর সন্ধ্যার আলো আসিল। সকলে ঈশ্বরচিন্তা করিতেছেন। প্রায় একঘন্টা পর শ্রীম পুনরায় কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (একটি যুবকের প্রতি)—ব্রহ্ম মানে বড় জিনিস। 'বৃহ্' ধাতু থেকে হয়েছে। 'বৃহ্' ধাতুর অর্থ বৃহৎ। তাই ব্রহ্মদর্শন মানে বড় জিনিসকে দেখা; ছোটখাট জিনিসে তখন লক্ষ্য নাই—one who lives in eternity, not in time.

ঠাকুরের তাই শুভঙ্করীর ধাঁধা ভাল লাগতো না। কারণ এ সব

ছোট জিনিস—finite things. Time and space (স্থান কাল) যারা সীমাবদ্ধ। তাতে তাঁর প্রীতি নাই। অসীমে তাঁর নিবাস—He lived in eternity. অসীম তাই তাঁর প্রিয়।

শ্রীম (বড় জিতেনের প্রতি)—সাকার দর্শনে রূপ থাকে, তাই একটু অহংও থাকে। অহং লোপের পর যা দর্শন হয় তা মুখে বলা যায় না।

ঠাকুর সর্বদা 'বৃহৎ'কে দেখতেন। তখন ছোটখাট সব লোপ হয়ে যেতো। তখন কোন গণ্ডীতে থাকতে পারতেন না। স্থান, কাল, নাম, রূপ, জাতি—এ সব গণ্ডী। কেশব সেনের বাড়ী খেয়ে এলেন, তা বলছেন, বেশ খাওয়ালে। কার হাতে খেলেন সেদিকে খেয়াল নাই। অন্য সময় ব্রাহ্মণের রান্না চাই—পবিত্রভাবে—তবে খেতে পারতেন। এক এক অবস্থায় এক এক রকম।

শ্রীম (সহাস্যে ভক্তদের প্রতি)—নকুড় বোষ্টম আমাদের পাড়ার লোক। ঠাকুরবাড়ীর সামনে দোকান ছিল। তিনি ঠাকুরের কথা বলতেন। তাঁর বয়েস তখন সতের আঠার। ঝামাপুকুর অঞ্চলে পুজো করতেন। চাল কলা গামছায় বেঁধে বাসায় যাচ্ছেন। পাড়ার লোক ডেকে বললে, 'ও বামুন ঠাকুর, শোন শোন, একটা গান শুনিয়ে যাও।' ঠাকুর বসে গান শোনাচ্ছেন। ওদিকে ওরা সব কলাটলা খেয়ে ফেলতো, কিম্বা সরিয়ে ফেলতো। তারপর যাবার সময় গামছাটা ঝেড়ে হাসতে হাসতে চলে যেতেন।

শ্রীম (অন্তেবাসীর প্রতি)—ব্রহ্ম কি, ঠাকুর একটা সুন্দর দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়েছিলেন। বলতেন, একটা সমুদ্রের কথা ভাব। সব জলে জলময়। আর মানুষগুলি জলপূর্ণ কলসী ঐ সাগরে ভাসছে। কোন রকমে কলসী ভেঙ্গে গেল। তখন কলসীর জল আর সাগরের জল এক হয়ে গেল। সব সাগর। সচ্চিদানন্দ সাগর। এই ব্রহ্ম।

এই কলসীটা, অর্থাৎ উপাধি, separate individuality, ভাঙবার জন্য যত জপ তপ। ওটি ভাঙলে সব ব্রহ্ম। 'আমি মলে ঘুচিবে জঞ্জাল'।

এক অবস্থায় বলতেন, সব মোমের বাগান দেখছি। গাছপালা,

ফল, বেড়া সব বোধের। অতীত বোধের। 'নাম' রূপে দেখছেন। তখন মনে নিচে নামছেন খানিকটা। ব্রহ্ম ও জগৎ, এই দুটোর মাঝখান থেকে এ কথা বলছেন। নামরূপ দেখছেন কিন্তু সব সচ্চিদানন্দময়। মন সচ্চিদানন্দে জুড়ে আছে, তখন চেতনের ভাবা লেগেছে। চেতন টেনে রাখছে। সেখান থেকে অচেতনের অর্থাৎ জগতের প্রথম রূপ, এই নামরূপ দেখছেন—গাছপালা, ফল, বেড়া। এইটাই তার normal state (স্বাভাবিক ভাব) ছিল, যখন ভক্তসঙ্গে লীলা করতেন।

একটু কিছু উদ্দীপন হলো অমনি whole-এর (ব্রহ্মের) উপর দৃষ্টি চলে গেল। বলতেন, মনুমেণ্টের উপর উঠলে নিচের সব সমান। সব এক।

আর এক অবস্থায় মা আর ছেলে। বলতেন, মাইরী বলছি, মা এসেছেন। তখন হনুমানের কথা বলে নিজের অবস্থা বর্ণনা করতেন। হনুমান বলছেন, হে রাম, তুমি প্রভু আমি দাস। কখনও আবার বলছেন, তুমি পূর্ণ আমি অংশ। আর এক অবস্থায় বলতেন, তুমিই আমি। যতক্ষণ অহংকার আছে ততক্ষণ, 'প্রভু দাস', 'পূর্ণ অংশ'। অহংকার লোপ হলে, তুমি আমি এক।

একজন ভক্ত—আমাদের উপায় কি? আমরা গৃহী, মনের সঙ্গে পেরে উঠি না।

শ্রীম (সস্নেহে)—সাধুসঙ্গ, সাধুসঙ্গ, সাধুসঙ্গ। ঠাকুর বলতেন সাধুসঙ্গ-বই উপায় নেই। আর প্রার্থনা করা, ব্যাকুল হয়ে কেঁদে কেঁদে—দেখা দাও, দেখা দাও, এই বলে। আর মাঝে মাঝে নির্জন-বাস। এই তাঁর prescription (ব্যবস্থাপত্র)।

রাত্রি প্রায় দশটা। শ্রীম সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়াইয়া আছেন। পাশে একজন ভক্ত, হাতে হ্যারিকেন। সকলে প্রণাম করিয়া সিঁড়ি বাহিয়া নামিতেছেন।

৩

সোমবার, ১৬ই অক্টোবর ১৯২২ খ্রীঃ। কৃষ্ণা একাদশী। বিকাল চারটা। মর্টন স্কুলের চারতলার সিঁড়ির ঘরে শ্রীম ভক্তসঙ্গে বসিয়া

আসিয়াছেন। এখানকার অনেকগুলি ভক্ত—ছোট জিতেন, বিনয়, রাখাল, ছোট নলিনী, তারক, মনোরঞ্জন, জগবন্ধু প্রভৃতি দুই দিন মঠ বাস করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন। ঠাকুরের ভক্ত কালীপদ ঘোষ মহাশয়ের পুত্র বরেনবাবুর দেহত্যাগ হইয়াছে রেল দুর্ঘটনায়। সেই উপলক্ষে ঠাকুরের বিশেষ পূজাপাঠ ও ভাণ্ডারা হইয়া গিয়াছে। মঠে লোক খুব কম। তাই স্কুলবাড়ীর ভক্তদের সংবাদ দেওয়া হয়। তাঁহারা উৎসব করিয়া ফিরিয়াছেন। শ্রীম মঠের সকল কথা শুনিয়াছেন। এইবার সাধুসঙ্গ-মাহাত্ম্য কীর্তন করিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—মহা সৌভাগ্যবান এঁরা। কত জন্মের তপস্যা থাকলে এ সৌভাগ্য হয়। সাধুসঙ্গে মঠবাস, আবার সেবা, ঠাকুরের কৃপা হলেই এটি সম্ভব। তাঁর কৃপা হয়েছে বলেই তো এই সৎ বুদ্ধি হয়েছে। এঁরা স্বর্ণখনি আবিষ্কার করেছেন। শুধু তা নয় খনিতে নেমে আবার কাজ করছেন। হাতুড়ি-হাতে ধুপধাপ কাজ চলছে। উদ্দেশ্য সোনা বের করা।

যাওয়া-আসা করলে আপনার লোক হয়ে যায়। আবার এক সঙ্গে কাজ করলে ঘরের লোক হয়। সেখানকারই মেম্বর অন্যত্র থাকলেও। ঠাকুর বলতেন, মন যেখানে আমরাও সেখানে। মনটি মঠে রাখলে বাড়ীতে থেকেও সেখানকার মেম্বর। একটু কর্ম বাকী আছে—সেটা হয়ে গেলেই একেবারে মঠের মেম্বর। তখন whole-time man—সর্বত্যাগী সাধু। আর কয়দিন পরই কালীপূজা। কালীপূজার দিন মঠবাস খুব তপস্যার ফল। ঐ দিন সারা রাত ঈশ্বরচিন্তা করতে হয়। তাতে চৈতন্য হয়ে যায়। এই পূজার পিছনে কত বড় tradition (পুণ্য স্মৃতি) রয়েছে। ঠাকুর ঐ দিনে মুহুর্মুহুঃ সমাধিমগ্ন হতেন।

একজন ভক্ত—মঠবাসের সময় কোন ব্রত উপবাস, এ সব নিয়ম পালন করার দরকার আছে কি ?

শ্রীম—বাহ্য আড়ম্বরের দরকার কি ? শরীর রক্ষা করে ধর্ম করা। যতটা সয় ততটা করা। উদ্দেশ্য—কিসে তাঁ'তে মন থাকে, কিসে ভক্তি-

লাভ হয়। মধ্য পন্থা নেওয়া। গৃহীদের শাস্ত্রবিধি মেনে চলা উচিত। অবতার এলে সোজা পথ দেখিয়ে দেন, নূতন পথ, কালের উপযোগী যা। তিনি শাস্ত্রবিধির পার। অবতারের আচরণ আর তাঁর মহাবাক্য—এই সবই শাস্ত্র। এ সব পুরাতন শাস্ত্রের নূতন ভাষ্য। তিনি না এলে শাস্ত্রের মর্ম চাপা পড়ে যায়। ভক্তদের উপর কোনও জোর ছিল না ঠাকুরের। বলতেন, রয়ে সয়ে কর। সকল কাজেরই উদ্দেশ্য জ্ঞানভক্তি লাভ করা, তাঁতে মন রাখা। এটি যাতে হয় তাই করা।

শ্রীম (বড় জিতেনের প্রতি)—সাধুসঙ্গের মাহাত্ম্য অনেক সাধুও বুঝতে পারে না। তাই অন্যত্র থাকে। যে বোঝে সে কখনও সাধুসঙ্গ ছাড়ে না। সাধুরও দরকার সাধুসঙ্গ। (সহাস্যে) ব্রাহ্ম সমাজের লোক কেউ কেউ মনে করতো, ঠাকুর একজন সাধারণ সাধু। যোগেন স্বামী তাতে রাগ করতেন। ঠাকুর শুনে বলেছিলেন, ওদের কথায় তুমি অত চট কেন? তারপর একটি গল্প বললেন। একখণ্ড হীরা নিয়ে একজন গেল বিক্রী করতে বেগুনওয়ালার দোকানে। সে বললে এর দাম নয় সের বেগুন। তারপর কাপড়ওয়ালার দোকানে গেল। সে দিতে চাইলে ন'শ টাকা। 'আরও কিছু দাম বাড়াও, এক হাজার টাকা দাও'—হীরাওয়ালা চাইলো। কিন্তু কাপড়ওয়ালা জবাব দিলে, না মশায় এক পয়সাও বেশী দেওয়া যাবে না। তারপর জহুরীর দোকানে গেলে একেবারে একলাখ টাকা দাম দিল। তাই জহুরী চেনে হীরা। যেমনি আকর তেমনি বুদ্ধি।

জহুরী হতে হলে সর্বস্ব ত্যাগ চাই তাঁর জন্য। স্ত্রী-পুত্র-কন্যা, ধন-জনের, বন্ধন ছিন্ন করতে পারলে জহুরী হওয়া যায়। ত্যাগ তপস্যা কিছুই নাই তা হলে কি হয়? স্নেহই বন্ধন, স্নেহই সংসার।

গদাধর আশ্রমের মহন্ত স্বামী কমলেশ্বরানন্দ আসিয়াছেন, সঙ্গে দুইজন ভক্ত। নিত্যকার ভক্তগণও অনেকেই উপস্থিত।

আজ ১লা কার্তিক ১৩২৯ সাল, ১৮ই অক্টোবর ১৯২২ খ্রীঃ। বুধবার, ত্রয়োদশী। অপরাহ্ণ পাঁচটা।

মর্টন ইন্স্টিটিউশন। চারতলার সিঁড়ির ঘর। জোড়া বেঞ্চির উপর সতরঞ্চি পাতা। শ্রীম পশ্চিম প্রান্তে দক্ষিণাস্য বসিয়াছেন, কমলেশ্বরানন্দজী শ্রীমর বামে। সাধু ও ভক্তগণের মিষ্টিমুখ হইয়া গেল। শ্রীম ঈশ্বরীয় কথা কহিতে লাগিলেন।

শ্রীম (সঙ্গীদের প্রতি)—গৃহীদের সর্বদাই সাধুসঙ্গের দরকার। রোগ লেগে আছে। মনে হচ্ছে একটু ফরসা হলো, অমনি আবার মেঘ। সংসারে থাকতে গেলে মেঘ উঠবেই। সাধুসঙ্গ কর—মেঘ কেটে যাবে, ভয় নাই—এই সব কথা ঠাকুর বলতেন।

সাধুসঙ্গ, নির্জনবাস আর কেঁদে কেঁদে প্রার্থনা—এ তাঁর ব্যবস্থা। মাঝে মাঝে নির্জনে চলে যেতে বলতেন, অবসর করে। (সহাস্যে) তা জামাইয়ের বাড়ী নয় (সকলের হাস্য), যেখানে অপর কেউ পরিচিত লোক নেই এমনি স্থানে যেতে হয়। আর সর্বদা প্রার্থনা করতে হয়। প্রার্থনায় বড় শীগ্‌গীর কাজ হয়। ঠাকুর নিজে ঐ পথ দিয়ে গিছলেন কি না, তাই ও-কথা অত বলতেন।

মন যেতে চায় না সাধুসঙ্গে। প্রথম প্রথম জোর করে যেতে হয়। রোখ করতে হয়—কি যে আমি চাকরী করছি, পরিবার প্রতিপালন করছি, কত কি করছি, সেই আমি সাধুসঙ্গও করবো। রোখ চাই। লেদাড়ুর কর্ম নয়। প্রথমে খুব কষ্ট করে সাধুসঙ্গ করতে হয়। শেষে সহজ হয়ে যায়, ভাল লাগে। ও এক নেশার মত। পরে না করে থাকা যায় না—second nature (স্বভাব) হয়ে দাঁড়ায়।

সন্ন্যাসী স্ত্রীলোকের সঙ্গ ত্যাগ করবে, স্ত্রীলোকের চিত্রপট পর্যন্ত দেখবে না, ঠাকুর বলতেন। ওয়েস্টের একজন সাধুও (Thomas A. Campis—Author of the "Imitation of Christ") এই কথা বলেছিলেন—Give up the company of rich man, woman and young man (ধনী, কামিনী ও যুবক-সঙ্গ ত্যাজ্য)। 'Rich man' (ধনী) মানে, অনেক সময় ধনীর মনস্তুষ্টির জন্য মিথ্যা কথায় সায় দিতে হয়। তাই avoid rich man (ধনীর সঙ্গ ত্যাগ কর)। 'Woman' (কামিনী) সাধনপথের বিঘ্ন। আর 'young

man' (যুবক) বাচাল হয়, তাই avoid woman, young man—কামিনী ও যুবক সঙ্গও ত্যাজ্য।

একজন পঞ্চবটীতে একদিন একটি স্ত্রী ভক্তের সঙ্গে বেশী মেশামিশি করেছিলেন। ঠাকুর তাই খুব তিরস্কার করেছিলেন তাঁকে। এদিকে তাঁর উপর কত ভালবাসা। ঠাকুর নিজেও স্ত্রী ভক্তদের কাছে বেশীক্ষণ থাকতে পারতেন না। ওরা না যেতে চাইলে উনি দাঁড়িয়ে পড়তেন নিজে।

স্ত্রীসঙ্গে পতন হয়। হয়েছে, এমন ঘটনা অনেক ঘটেছে। সহরে সাধুদের বেশী বাস করা উচিত নয়। Environmentএর influence (পরিবেশের প্রভাব) মনের উপর এসে পড়ে। তাই ঠাকুরের ব্যবস্থা—নির্জনে থেকে গোপনে তাঁকে ডাক। ঈশ্বর গোপনের ধন।

আর একটি মহাশত্রু আছে সাধনপথের—লোকমান্য। এটা গ্রাহ্য করলে সব পণ্ড হবে। কেউ কেউ একটু জপতপ করেছিল। তাতে লোকমান্য হলো। বাস্, এই পর্যন্ত এই জন্মে। আর এগুতে পারলে না। ঠাকুর বলেছিলেন, 'ঝাঁটা মারি লোকমান্যে'—লঙ্কা ফোড়ন দিয়ে তাঁর এই মহাবাক্য স্মরণ করা এ দুর্জয় রোগের মহৌষধ।

শ্রীম (সকলের প্রতি)—ঠাকুরের সিদ্ধির অবস্থা হয় এইটিন ফিফ্‌টিএইটে, (১৮৫৮ খ্রীঃ)। তখন কেবল ছটফট করতেন। বলতেন—মা, চারদিকে কামিনীকাঞ্চন। আমার শরীর জ্বলে যাচ্ছে। আর সহ্য হচ্ছে না। দেহ বুঝি আর রাখতে পারলুম না। মা প্রবোধ দিয়ে বললেন, সবুর কর বাবা। শুদ্ধসত্ত্ব সব ভক্ত আসবে। তাদের সঙ্গে তুমি শান্তি পাবে। অন্তরঙ্গ ভক্তরা আসতে আরম্ভ করলে এর একুশ বাইশ বছর পরে। এই দীর্ঘকাল তাঁকে অপেক্ষা করতে হয়েছিল। মথুরবাবু মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করতেন, বাবা কখন আসবে তোমার অন্তরঙ্গ ভক্তরা? এতদিনে অন্য ভক্তরা কেউ কেউ এসেছিলেন কিন্তু থাকতে পারেন নি। ঠাকুর রহস্য করে বলতেন, ভূতের সঙ্গী খোঁজার মত আমার তখনকার অবস্থা ছিল। একটা ভূত সঙ্গী খুঁজছিল। এখন অপঘাত মৃত্যু ছাড়া ভূত হয় না। যেই কারো

মৃত্যু হলো অমনি ভূত গিয়ে হাজির। একটু পর দেখে, ওরা অদৃশ্য হয়ে গেল আবার। কাকেও আর খুঁজে পায় না। আমার অবস্থা ঠিক এইরূপ হয়েছিল। কেউ এলে ভাবতুম এই বুঝি এলো। কিন্তু তারপরই চলে গেল।

শ্রীম (সঙ্গীদের প্রতি)—কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ গৃহীদের পক্ষে মনে, বাইরে নয়। সাধুদের বাহির ভিতর দুই-ই, ঠাকুর বলতেন। গৃহীদের মনে ত্যাগ আর 'কেরমে' (ক্রমে), মানে একেবারে পেরে উঠবে না। প্রকৃতি রুখে দাঁড়ায়। তাই রয়ে সয়ে করতে বলছেন। নাইনথ্ ক্লাসের একটি ছেলেকে ফার্স্ট্ ক্লাসে বসিয়ে দিলে সে পারবে কেন? এতে কুফল হবে, তার অপকার হবে। তাই গৃহীদের পক্ষে 'কেরমে' ত্যাগ, একেবারে নয়। এ যেন কলার ভিতর কুইনাইনের ব্যবস্থা। সময়ে সব ত্যাগ হবে।

ঠাকুরের আর একটি মহাবাক্য, তুমি ঈশ্বরকে ডাক। তোমার যা দরকার সব তিনি দেবেন। তিনি জানেন সব, কি দরকার। এই দেখ, তোমার জন্মাবার পূর্বেই কত আয়োজন করে রেখেছেন—জল, বায়ু, চন্দ্র, সূর্য, মেঘ, অগ্নি, শস্য—আবার মাতৃস্তনে দুগ্ধ। আর পিতামাতার স্নেহ। যারা বিদ্যামায়ার আশ্রয় নেবে তাদের জন্য সাধুসঙ্গ, দেবালয়, শাস্ত্র, মঠ, আশ্রম, তীর্থ। যেখানে যা দরকার, যার জন্য যা সব আগে থেকেই ঠিক আছে।

রুচি আর প্রকৃতি দেখে এক এক জনের জন্য এক এক রকম ব্যবস্থা করতেন ঠাকুর। এক পথ সকলের নয়। ভিন্ন লোকের ভিন্ন পথ। তাই তিন জনকে তিন রকম বললেন। একজনকে বললেন, তুমি দিন কতক তীর্থ ও তপস্যা করে এস। একজনকে বললেন, তুমি যেমন আছ তেমনি গৃহেই থাক। আর একজনকে নিজের কাছে রেখে দিলেন, সেবা করুক। কেন এই ভিন্ন ব্যবস্থা? প্রকৃতি যে ভিন্ন। কিন্তু গন্তব্য সকলেরই এক, ঈশ্বর। এক জামা সকলের গায়ে লাগে না।

একজন ভক্ত—ঠাকুর কামারপুকুরে থাকতেন কোথায়?

শ্রীম—শুনেছি এখন যেখানে হেয়ার প্রেস, সেইখানে। মেছুয়াবাজারের ষ্ট্রীটে, সিটি কলেজের একটু আগে, রাস্তার ডান দিকে। বাঁ দিকে বেনেদের বাড়ী। তার কয়েকখানা বাড়ী পরই ঠাকুরের দাদার টোল। এখন বুঝি সেখানে মুড়ি মুড়কীর দোকান। খোলার ঘর ছিল যেখানে থাকতেন। এখন সব পাকা বাড়ী। ঠনঠনে মা কালীর কাছে রোজ গিয়ে বসতেন।

শ্রীম কি ভাবিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—কাল সেই কালীপূজো। কাল যারা মঠে রাত্রিবাস্ করবে আর পূজো দর্শন করবে তারা বিশ বছর এগিয়ে যাবে তপস্যায়। কি দিন কাল। এই দিনে মুহুর্মুহুঃ সমাধি হতো ঠাকুরের।

এক কথা ঠাকুরের—সাধুসঙ্গ। And the rest will take care of itself, বাকী সব আপনি হবে।

জনৈক যুবক—যোগ কাকে বলে? এ সম্বন্ধে ঠাকুর কি বলতেন?

শ্রীম—খুব সংক্ষেপে বলেছিলেন, যোগ যেন নিক্তির কাঁটা, উপরের কাঁটার সঙ্গে নিচের কাঁটার মিলন। আর একটি দৃষ্টান্ত দিয়েছিলেন—যেমন প্রদীপের শিখা—নিবাত নিষ্কম্প প্রদীপবৎ। পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার মিলন। আর বলেছিলেন, যোগ যেন পাখী ডিমে তা দিচ্ছে। চক্ষু ফ্যালফ্যাল, মনটা সব ডিমে। অন্য সময় মানুষ দেখলে ভয়ে উড়ে যায়। এখন আঙ্গুল দিয়ে ধাকা দাও, নড়বে না। এ রাজযোগের কথা। জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, কর্মযোগ—এও যোগ। যা দিয়ে তাঁর সঙ্গে যুক্ত হওয়া যায় তাই যোগ। জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম দ্বারা তাঁর সঙ্গে যুক্ত হওয়া যায়। এ সবের উদ্দেশ্যও তাই, ভগবানের সহিত, পরমাত্মার সহিত মিলন।

রামায়ণে একটি দৃষ্টান্ত আছে—ভরত। রাজধানী ছেড়ে নন্দীগ্রামে গিয়ে বাস করেছেন কুটীরে। কম্বলাসনে বসে আছেন, আর মুখে অহর্নিশ 'রাম রাম'। সুমন্ত্র, বশিষ্ঠ গেলে ঘণ্টাখানেক রাজ্যের কথা

আলোচনা হতো, বাকী সময়, 'রাম রাম' এই মহামন্ত্র মুখে। রাম-বিরহী ভরত, এও যোগের দৃষ্টান্ত।

শ্রীম (যুবকের প্রতি)—অবতার এলে ব্যাকুলতা বেড়ে যায়। কি করে তাঁর দর্শন হয় তার জন্য কেউ কেউ ব্যাকুল হয়। আর একটি প্রধান কাজ আছে অবতারের। তিনি ব্যক্ত ও অব্যক্তের যোগসূত্র, connection দেখিয়ে দেন। অবতার না হলে এটি বোঝা যায় না। বলেছিলেন, মনে কর দিগন্তব্যাপী মাঠ, তার মাঝখানে একটা দেয়াল। দেয়ালে একটা ফুটো। এই ফুটো দিয়ে দেখ, ও দিকে মাঠ, আর এ দিকে বাড়ীঘর লোকালয়। একজনকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, বলতো ঐ ফুটোটা কি? ভক্তটি বললেন, 'ঐটি আপনি'। শুনে খুব খুশী হলেন। এই ফুটোই অবতার। When he lives in time—যখন জগতের দিকে দৃষ্টি তখন ঠিক যেন মানুষ। কত চিন্তা জগতের জন্য, সকলের কল্যাণের জন্য। আহার বিহার, কথা, স্নেহ ভালবাসা, সব মানুষের মত। একটু পরই সমাধিস্থ, Now he lives in eternity. তখন এদিকের কোনও হুঁশ নেই—সচ্চিদানন্দ সাগরে বিলীন।

স্বামী কমলেশ্বরানন্দ ও সঙ্গীগণ বিদায় লইলেন। সঙ্গে সঙ্গে এটর্ণি বীরেন ও কয়েকজন ভক্ত প্রবেশ করিলেন। বেশী প্রশ্ন করিলে, শ্রীমর কথাপ্রবাহ বন্ধ হইয়া যায়। তিনি বলিতেন 'রসভঙ্গ' হয়। তারপর শাস্ত্র পাঠ, কিম্বা গান হয়। আজও তাহাই হইল।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—কই আমাদের গাইয়ে ফ্রেণ্ডস্‌রা কেউ নেই আজ? (অন্তেবাসীর প্রতি) গান্ না আপনি একটি।

অন্তেবাসী তেমন গাইয়ে লোক নহেন। আপনার ভাবে কখনও গাহেন। আজ শ্রীম ছাড়িতেছেন না। অগত্যা তিনি গাহিতেছেন।

গান। অকূল ভবসাগর বারি পার হবি কে আয় রে আয়।
অন্ধ আতুর অনাথ নিরাশ্রয় পাপী তাপী আছ কে কোথায়॥
আমি উচ্চ আশায় পাল তুলে দিয়েছি (তরী) হরি-
কৃপা পবনে বেগে ধায়।

শ্রীম—বাঃ, বাঃ। আর একটি হোক, বেশ গান।

অন্তেবাসী আবার গাহিলেন।

গান। এমন মধুমাখা হরিনাম নিমাই কোথা হতে এনেছে।
ঐ নাম একবার শুনে হৃদয় বীণে আপনি বাজিয়া উঠেছে॥
কতদিন শ্রবণে শুনেছি ঐ নাম কখনও এমন করেনি পরাণ,
আজি কি জানি কি এক নব ভাবোদয় হৃদয় মাঝারে হতেছে॥
কেটে গেছে মোর স্বপনের ঘোর গলে গেছে কঠিন হৃদয় মোর,
আজ কি যেন কি এক উজল জগতে, আমায় নিয়ে চলেছে॥
আজ হতে নিমাই তোর সঙ্গে রব জ্ঞানের গৌরব কভু না করিব,
আহা সব ছেড়ে দিয়ে হরি হরি বলে নাচিতে বাসনা হতেছে॥
কে যেন কহিছে মোর কানে কানে, পারের উপায় হল এতদিনে,
আজ প্রেমের পসরা ধরি নিজ শিরে, প্রেমের ঠাকুর এসেছে॥

বীরেন (শ্রীমর প্রতি)—সম্প্রতি এই গানটি আমি পুরীতে শুনে এসেছি—এমনি মধুর সুর।

শ্রীম—শুধু কি সুর, ভাবটি তেমন জীবন্ত—যেন টেনে নিয়ে যায় ভিতরে। প্রকাশানন্দ সন্ন্যাসী ছিলেন। জ্ঞানীদের গুরু, কাশীবাস করতেন। চৈতন্যদেবের মুখে হরিনাম শুনে এই অবস্থা হয়। প্রথমে অভিমান, পরে এই দশা। শোনা যায়, প্রকাশানন্দ প্রথমে বিরক্ত হয়েছিলেন চৈতন্যদেব সন্ন্যাসী হয়ে হরিনাম করেন এই কথা শুনে। ডাকিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন। চৈতন্যদেব বললেন, আমি হীন অধিকারী জেনে গুরুদেব আমায় হরিনাম কীর্তন করতে বলে দিয়েছেন, তাই করি। কি মধুর ভাব—প্রথমে গিয়ে পাপোষের কাছে বসেছিলেন। আর সব উপরে ভাল আসনে। তারপর যখন হরিনাম করলেন তখন প্রকাশানন্দের ঐ অবস্থা, গানে যা শোনা গেল। ঠাকুর বলেছিলেন, চৈতন্যদেবের অদ্বৈতজ্ঞান ছিল ভিতরে, বাইরে হরিনাম। বলতেন, যেমন হাতীর ভিতরের দাঁত আর বাইরের দাঁত, তেমনি ছিলেন তিনি। প্রথম একদিন নরেন্দ্রকে বলেছিলেন, নদের গৌরাঙ্গ আর আমি এক। তারপর অনেকবার বলেছেন,

ঐ কথা। অবতার যখন কথা কন, জগৎ স্তম্ভিত হয়ে যায়, তিনি আসেনই এই জন্যে, সাধুদের উদ্ধার করতে। তাইতো টান পড়েছে প্রকাশানন্দের উপর। নিরক্ষর ক্রাইস্টের কথার জের আজও চলছে। আর ঠাকুর, তাঁর প্রভাব চোখের সামনে—নূতন জগৎ গড়ছে।

৪

আজ শুক্লা প্রতিপদ, বুধবার, ২০শে অক্টোবর ১৯২২ খ্রীঃ, ৩রা কার্তিক, ১৩২৯ সাল। মর্টন স্কুলের চারতলার সিঁড়ির ঘর। এখন অপরাহ্ণ পাঁচটা।

গতকাল ৺শ্যামাকালীর পূজা গিয়াছে। ভক্তগণ অনেকে সাধু-সঙ্গে রাত্রিবাস ও পূজা দর্শন করিয়া ফিরিয়াছেন। শ্রীম জগবন্ধুর নিকট হইতে পূজার সমস্ত বিবরণ শুনিতেছেন। কে পূজারী, কে তন্ত্রধারক, কে ভাণ্ডারী—হইতে আরম্ভ করিয়া, কে কে উপস্থিত ছিলেন, কি কি গান হইল ও ভোগ কত রকমের হইয়াছিল, ইত্যাদি সমস্ত সংবাদ লইতেছেন। অল্পক্ষণ মধ্যে দুই জন গুজরাটী ভক্ত আসিলেন। তাঁহারা শ্রীমকে তাঁহাদের দেশের নানা সংবাদ বলিতেছেন। শ্রীমর অনুরোধে তাঁহারা তুকারামের কয়েকটি ভজন' শুনাইলেন। তারপর বিদায় লইলেন।

এইবার বারুইপুরের উকীল বৃদ্ধ কেদারনাথ আসিয়াছেন। ইনি শ্রীরাখাল মহারাজের (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) মন্ত্রশিষ্য। সম্প্রতি এই মহাপুরুষ কয়েকমাস হইল মহাসমাধি লাভ করিয়াছেন। ইনি প্রথম হইতে পঁচিশ বৎসর প্রায় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। নিত্যসিদ্ধ ঈশ্বরকোটি ঠাকুরের মানসপুত্র শ্রীরাখাল স্বীয় অলৌকিক আধ্যাত্মিকতার প্রভাবে আর অপার স্নেহে সাধু ভক্ত-গণকে নিবিড় বন্ধনে বদ্ধ করিয়াছিলেন। তিনি আনন্দধামে প্রয়াণ করিয়াছেন, পরমানন্দে তথায় বিরাজ করিতেছেন। ভক্তগণ তাঁহার অভাবে অনাথ ও নিরাশ্রয়। কেদার বিরহকাতর, শ্রীমর সহিত কথা কহিতেছেন।

কেদার (শ্রীমর প্রতি)—মাস্টার মশায়, কিছুই ভাল লাগছে না। মনে যে ধাক্কা লেগেছে তা সামলিয়ে উঠতে পারছি না। কাজ-কর্মে মন বসছে না। সর্বদা মহারাজের কথা মনে হচ্ছে।

শ্রীমর সহিতও শ্রীরাখালের ঘনিষ্ঠ স্নেহ-সম্পর্ক ছিল। রাখাল প্রথমে শ্রীমর ছাত্র, পরে প্রিয় গুরুভ্রাতা ছিলেন। তাঁহার শরীর ত্যাগে শ্রীমও মর্মাহত। শরীর ত্যাগের পরদিন শ্রীম অনাহারে দরজা বন্ধ করিয়া পড়িয়া ছিলেন। চক্ষু দেখিয়া মনে হইত যেন কাঁদিয়া ভাসাইয়াছেন। কখনও শ্রীমহারাজের শিষ্যদের কাছে গিয়া তাঁহার কথা বলিয়া শান্ত হইতেন। ইহার সঙ্গে শ্রীহরিমহারাজের (স্বামী তুরীয়ানন্দ) শরীর ত্যাগের ব্যথাও হৃদয়ে বাড়িতেছে। 'প্রবুদ্ধ ভারতে' এই দুই মহাপুরুষের কথা লিখিয়া শ্রীম স্নেহ ও শ্রদ্ধার অঞ্জলি প্রদান করিয়া কতক শান্ত হইয়াছেন। কেদারবাবুর কথা শুনিয়া শ্রীম যেন নূতন করিয়া আবার বিরহ ব্যথায় ব্যথিত হইয়াছেন। সহানুভূতিতে বিগলিত হইয়া বিজড়িত কণ্ঠে কেদার-বাবুকে বলিলেন, কি আর করা যায়। সবই তাঁর ইচ্ছায় হচ্ছে। চলুন, আমরা এখন তাঁদের চরিত্রের গুণগান করতে থাকি। এই কথা শুনিয়া কেদারের পরিপূর্ণ হৃদয়কলসী হইতে শ্রীরাখালের সুসঞ্চিত স্নেহ-পীযুষ যেন নির্ঝরবৎ বিগলিত হইতে লাগিল। কেদার শ্রীমহারাজের গুণকীর্তন করিয়া শেষ করিতে পারিতেছেন না। শ্রীম তাহা পান করিতেছেন।

কেদার—মহারাজ বলতেন, ঠাকুরের অহৈতুকী কৃপার কথা কত বলব। প্রথম প্রথম আমার জপ ধ্যানে মন বসতো না। ঠাকুরের সঙ্গে অভিমান করে তাই ঝগড়া করতুম। একদিন কাছে ডেকে নিয়ে বিড় বিড় করে কি বললেন, আর আমার জিভে তিনবার মৃদু আঘাত করলেন। তারপর থেকে সব ঠিক হয়ে গেল। তাঁকে প্রথম বুঝতে পারি নি। তাঁর স্নেহ ও মায়ের মত আদর যত্ন আমাকে ঘর থেকে টেনে বের করে নিয়ে যেত। একদিন ঠাকুর বললেন, ওরে, তুই আজ করেছিস্ কি? তোর মুখের দিকে তাকাতে পারছি না

যে। মিছে কথা বলেছিস্ বুঝি? আচ্ছা একটু গঙ্গাজল খেয়ে নে। আর রোজই অন্ততঃ খড়কের মাথায় করে হলেও একটু গঙ্গাজল খাবি। ইন্দ্রিয় চাঞ্চল্য হলে অকপটে তাঁকে বলতুম। তিনি বুকে হাত বুলিয়ে দিতেন আর সব ঠাণ্ডা হয়ে যেতো।

মহারাজ সকলের মনের কথা বুঝতে পারতেন, কিন্তু বলতেন না সবাইকে। এটা অবশ্য ওঁর পক্ষে সামান্য কথা। এক বার কোন্নগরের ডাক্তার একটু বিপথে যাচ্ছিলেন। একটি বিধবার দিকে তাঁর মন গেছলো। মহারাজ তা জানতে পেরে রহস্যচ্ছলে তাঁকে খুব শাসিয়ে দিছলেন। একবার একজন সাধুকে এক ব্যক্তি প্রলোভন দেখিয়েছিল। তাঁকে পথভ্রষ্ট করতে চেয়েছিল। সাধুটি বলেছিলেন, তা হবে না। আমাদের মহারাজ সব জানতে পারেন। তাঁর অগোচর কিছু নেই। লোহাপট্টির ভক্তরা এক বার বৃন্দাবন যাচ্ছিলেন। বাবুরাম মহারাজ তখন কাশীতে। ভক্তরা তাঁকেও ওঁদের সঙ্গে যেতে বলেছিলেন। মহারাজ শুনে উত্তর করলেন, না, ওঁদের সঙ্গে গেলে কি ভাব, কি উৎসাহ, কি উদ্দীপন হবে! যেতে দিলেন না। এক বার বলেছিলেন, দেখুন মানুষের মন কি ছোট! পুরীতে সমুদ্র স্নান করে সন্তুষ্ট হয় না। কোথায় কোন পুকুরে কিংবা সরোবরে আবার নাইতে যায়। কি আশ্চর্য! এ হচ্ছে ছোট মনের পরিচয়। বিরাট সমুদ্র সামনে, তাতে মন বসে না। বলতেন, জগন্নাথের মন্দিরে গিয়ে প্রণাম করে সামনে দাঁড়িয়ে বলতে হয়, 'প্রভো, তুমি জগতের নাথ। আমায় কৃপা কর।' দেহত্যাগের কিছুদিন পূর্বে আমায় বলেছিলেন, মঠে যাতায়াত করবেন। ওটি বন্ধ না হয়। নারাণ আয়াঙ্গার (স্বামী শ্রীবাসানন্দ) বলেছিলেন, আমি অনেক তীর্থ ঘুরে দেখেছি, কিন্তু তেমন ফল হয় নি। তবে মহারাজের সঙ্গে ছয় মাস বাস করে বুঝতে পেরেছি, সাধুসঙ্গ-বই আমাদের উপায় নেই।

বৈষয়িক বিষয়েও মহারাজের জ্ঞান ছিল অগাধ। কত জটিল বিষয়েও তিনি আমাদের উপদেশ দিয়েছেন। একবার একজন ভক্ত

মহারাজকে জিজ্ঞাসা করলেন, ঠাকুরকে অত লোক দর্শন করল, কিন্তু তাদের জীবন তেমন উন্নত হলো কই? মহারাজ উত্তর করলেন, মলয় পর্বতে সব গাছ চন্দন হয়। কিন্তু বাঁশ, কলাগাছ প্রভৃতি চন্দন হয় না। শুধু দর্শন করলে কি হবে? কৃপা, ভালবাসা হজম করার শক্তি চাই। মহারাজ আমাকে বলেছিলেন, কাশী প্রভৃতি সব শিব-ক্ষেত্রেই ভক্তির উদ্দীপন হয়। আর বলেছিলেন, মন যখন খারাপ হবে একবার গিয়ে দক্ষিণের তীর্থগুলি দেখে আসবেন—কন্যাকুমারী রামেশ্বর প্রভৃতি। ও সব খুব স্থান, খুব উদ্দীপন হয়।

শ্রীম (কেদারের প্রতি)—এক দিন ঠাকুর গিরিশবাবুকে বলেছিলেন—যাও, গঙ্গায় ডুব দিয়ে এসো। আর হাত জোড় করে বল, পতিতপাবনী মা, আমায় কৃপা কর। গিরিশবাবু অনিচ্ছা সত্বেও গেলেন। কিন্তু গঙ্গায় ডুব দেওয়ার পর অপার আনন্দে মন-প্রাণ ভরে গেল। এত মহিমা মা গঙ্গার! বলেছিলেন, কলিতে গঙ্গাবারি সাক্ষাৎ ব্রহ্ম।

গৃহীদের সাধুসঙ্গ-বই উপায় নাই। কত মাহাত্ম্য এর। ঠাকুর একটি গল্প করে বুঝিয়েছিলেন। একটা মাছ বড়শি শুদ্ধ পালিয়ে গেল সুতো কেটে। যাবে কোথায় বাছা! কিছুদূর গিয়ে ভেসে উঠলো। বড়শি হজম করার শক্তি নেই, তাই মরে ভেসে উঠেছে। তেমনি সাধুসঙ্গ। তাঁদের স্নেহ, ভালবাসা, কখনও নাশ হবার নয়। এর অপব্যবহার নেই। বিশ বছর পরে হলেও কাজ হবে—যেমন পারা, সে বেরোবেই খেলে। ঠাকুরকে যারা একবারও দেখেছেন ধন্য তাঁরা, ফল পরে হবে নিশ্চয়।

আজ আর অন্য কথা হয় নাই। আটটায় সভা ভঙ্গ হইল।

পরের দিন ২১শে অক্টোবর ১৯২২ খ্রীঃ, ৪ঠা কার্তিক ১৩২৯ সাল, শনিবার। সাড়ে বারটার গাড়ীতে শ্রীম মিহিজাম রওনা হইলেন, সঙ্গে বিনয়। ভক্তগণও সকলে এ সংবাদ জানিতেন না। যেন টলস্টয়ের মত সকলের অগোচরে চলিয়া গেলেন। কয়েকদিন পূর্বে "টলস্টয়ের গৃহত্যাগ" পাঠ শুনিয়াছিলেন অতি মনোযোগের

সহিত। ভক্তগণ আজ তাহার অর্থ বুঝিলেন। জামতাড়া আশ্রমে সাত দিন থাকিয়া মিহিজামে বিদ্যাপীঠে থাকেন। সবে বিদ্যাপীঠ আরম্ভ হইয়াছে। পরে ভক্তসঙ্গে ভিন্ন কুটীরে বাস করেন—তপোবনে, যেন ব্যাস, বশিষ্ঠ।

কলিকাতা ২১শে অক্টোবর, ১৯২২ খ্রীঃ; ৪ঠা কার্তিক, ১৩২৯ সাল শনিবার, শুক্লা দ্বিতীয়া।

পঞ্চম অধ্যায়

মুক্তি হবে কবে—'আমি' মরবে যবে।

১

মর্টন স্কুল। সন্ধ্যা সওয়া সাতটা। আজ ১৩ই সেপ্টেম্বর, ১৯২৩ খ্রীঃ, বৃহস্পতিবার, ২৮শে ভাদ্র ১৩৩০ সাল। শ্রীম দোতালার পশ্চিমের ঘরে বসিয়া আছেন। মেঝেতে মাদুর পাতা। পাশেই ছোট জিতেন, সুধীর, শচী ও ছোট নলিনী বসা। জগবন্ধু বেলেঘাটা গিয়াছিলেন, এইমাত্র ফিরিয়াছেন সঙ্গে শুকলাল। গৃহে প্রবেশ করিতেই শ্রীম জগবন্ধুকে বলিলেন, আপনাদের স্বামীজীর 'Lectures on practical Vedanta', (লেকচারস-অন-প্র্যাকটিকেল বেদান্ত), জ্ঞানযোগ আর রাজযোগ খুব ভাল করে পড়া উচিত।

জগবন্ধু—কোন ভাষায়—বাংলা কি ইংরেজী?

শ্রীম—অনেকেই ইংরেজীতে পড়ে। ইংরেজীতেই প্রথম বলেছিলেন কিনা। এ সব বিষয়ে যা বলবার আছে স্বামীজী তার শেষ কথা বলে গেছেন। তিনি নিজেকে নিজে জানতেন। তাই বলেছিলেন, এখন লোক দাগা বুলুক যা সব বলে গেলাম।

শ্রীম (শচী ও সুধীরের প্রতি)—তোমাদের নোট করা উচিত অভেদানন্দ স্বামীর ওখানে যা সব শোন। নোট করলে impression (রেখাপাত) হবে mindএ (মনে) ভাল। স্বামীজীর বই পড়ে লেকচার শুনলে আরও ভাল।

শ্রীম (একজন ভক্তের প্রতি)—হাঁ, কাল বেদান্ত সোসাইটিতে কি সব করা হলো, শোনান না একবার আপনার নোট পড়ে।

একজন ভক্ত নোট পড়িতেছেন। বিষয় 'আত্মসংযম' (self-control), উপস্থিত সভ্য পঞ্চাশ জন, অপরাহ্ণ সাড়ে পাঁচটা, ১২ই সেপ্টেম্বর ১৯২৩ খ্রীস্টাব্দ।

স্বামী অভেদানন্দ বলেন, মনকে control (সংযত) না করলে ঈশ্বরদর্শন হয় না। আগে এটি চাই। অতি যত্নে তার জন্য চেষ্টা করতে হয়। মন স্বভাবত চঞ্চল, যেন বানর। বানরকে মদ খাওয়ালে, বিছে কামড়ালে, কিংবা ভূতে পেলে চঞ্চলতা আরো বেড়ে যায়। মনও ক্রমাগত ভোগ পেয়ে বেশী চঞ্চল হয়ে পড়ে। প্রথম প্রথম খুব কষ্ট করে, সব ছেড়ে আগে তাকে বশ করতে হয়।

মন বশীভূত করার উপায় concentration (একাগ্রতা)। কোনও একটা বিষয়ে একে concentrate (একাগ্র) করা। ভগবানের কত রূপ রয়েছে, এর যে কোনও একটাতে কর না। একটি ideal (আদর্শ) ধর, তারপর সমস্ত মনকে তাতে আকর্ষণ কর। তোমরা ideal (আদর্শ)-হারা হয়েছো বাঙ্গালী যুবকগণ। দোষ তোমাদের নয়, পিতাদের। এঁরা নিজেরাও এই শিক্ষা পান নি, তাই তোমাদেরও এই শিক্ষা দিতে পারেন নি। তোমরা প্রথমে সত্য রক্ষা করতে শেখ। সত্য কথা বল, আর তা পালন করতে চেষ্টা কর প্রাণপণ। সত্যকে আশ্রয় না করলে ধর্মজীবন হয় না। সত্য প্রথম সোপান।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব যদি কখনও কোন বিষয়ে কথা দিতেন, তা রক্ষা করতেন শত বাধাবিঘ্ন থাকলেও। সত্যরক্ষায় তাঁর অমানুষিক আঁট ছিল। কথা দিয়ে কথা রক্ষা না করলে সত্যভঙ্গ হয়। তিনি এই যুগে সত্য, ধর্ম, জ্ঞান ও বিশ্বাস আশ্রয় করতে বলেছেন। তোমরা তাঁর কথা পালন করতে চেষ্টা কর।

রোজ ধ্যান কর। মনকে একটা আদর্শে নিবিষ্ট কর। আর বিচার কর, তোমার চারদিকে সব মৃত্যুর ছায়া। কিছুই তো থাকবে

না, মৃত্যু যে সব হরণ করে নিয়ে যাবে। শুধু নাম যশ দিয়ে করবে কি? শরীর যে মৃত্যুর কবলে। আত্মা ছাড়া, সত্যিকার আমি ছাড়া সব ধ্বংস হয়ে যাবে। ঠাকুর বলতেন, 'মুক্তি হবে কবে, আমি মরবে যবে'।

শবসাধনা কর। এক রকম সাধনা আছে তন্ত্রমতে। মড়ার উপর বসে জপ করতে হয়। একে শবসাধনা বলে। আমি বলি, এই 'শব' সাধনা নিজের শরীরেই হতে পারে। শরীর শব—নারায়ণকে তার ভেতর জাগ্রত কর, নারায়ণের প্রতিষ্ঠা কর। এই শরীরে তিনি আছেন। তাঁর ধ্যান কর।

ধ্যানেতে মন শান্ত হয়। যখনই বাইরের বিষয়ের সঙ্গে মিশে মন অশান্ত হবে তখনই ভিতরের আদর্শকে স্মরণ কর। বিচার করলে সব বুঝতে পারবে। তোমরাই শিব হতে পার। 'ভ্রান্তিযুক্ত ভবেৎ জীবঃ, ভ্রান্তিমুক্ত সদা শিবঃ।' শিব গায়ে ভস্ম মেখেছেন সব ছেড়ে। তার মানে কি? না, তিনি মৃত্যুকে জয় করেছেন, জেনেছেন এই শরীরটা ছাই। সংসারে তাঁর কোনও বন্ধন নাই। মৃত্যু হলো যম, তার চর কামক্রোধাদি রিপু। এদের পুড়িয়ে গায়ে ভস্ম মেখেছেন।

ভগবান বুদ্ধ ছয় বৎসর সাধন করেছিলেন বুদ্ধগয়াতে। তখন তিনটিমাত্র চাল গুণে খেতেন। শরীর কঙ্কালসার। মনে ইন্দ্রিয়ের বিষয় উঠলে বলতেন, যুদ্ধে হেরে যাওয়ার চাইতে সম্মুখ-সমরে প্রাণত্যাগ করা ভাল। ইন্দ্রিয়ের দাস হয়ে থাকা বিড়ম্বনা। ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে প্রলয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ করেছিলেন। আসনে বসে বললেন, 'ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং ত্বগস্থিমাংসংপ্রলয়ঞ্চ যাতু'। কিন্তু বহুজন্ম-দুর্লভ বোধি লাভ না করে এখান থেকে উঠবো না। 'ললিত বিস্তারে' আছে এ সব কথা। কি দৃঢ় প্রতিজ্ঞা—দেহ যায় যাক্, এ সবের মহাপ্রলয় হয় হোক, কিন্তু আমি আসন ছেড়ে উঠবো না যাবৎ না স্ব স্বরূপকে জানতে পারবো। এরূপ কঠোর সঙ্কল্প, কঠোর তপস্যার পর তিন দিনেই সিদ্ধ হয়ে গেলেন, ভগবানের দর্শন পেলেন।

তোমরাও ওরূপ করতে পার ইচ্ছা করলে। আদর্শ ঠিক কর

ছেলেবেলা থেকে। তোমরা বুঝতে পারছ না যে মৃত্যুকে নিয়ে ঘর করছ। আমরা বুঝেছি, এটি পরমহংসদেবের কৃপায়। তোমরাও বুঝতে পারবে, চেষ্টা কর তাঁকে ধরে।

প্রশ্ন—মন তুলে কোথায় স্থাপন করবো ?

উত্তর—ভগবানের যে কোনও একটি রূপেতে স্থাপন করতে পার।

প্রশ্ন—আমি কুণ্ডলিনী চক্রকে সর্বদা সামনে দেখতে পাই।

উত্তর—বেশ ভাল কথা। তোমার psychic power (মনের বল) খুব বেশী।

প্রশ্ন—মনের সূক্ষ্ম বাসনার দমন কি করে হয় ?

উত্তর—ধ্যান কর, বিচার কর, আদর্শে মনোনিবেশ কর। পরমহংসদেব এ যুগের আদর্শ—তাঁকে ধর। এমন আদর্শ কোথাও পাবে না এখন। তিনি মৃত্যুঞ্জয়। তাঁ'তে দেহ-বুদ্ধির লেশও ছিলনা। সমাধিস্থ অবস্থায় ডক্টর মহেন্দ্র সরকার চোখে আঙ্গুল দিয়ে পরীক্ষা করলেন, টিপে দেখলেন কিন্তু হুঁশ নাই। এ যুগের আদর্শ তিনি। তাঁকে ধরলে শীঘ্র হয়ে যাবে।

শ্রীম—বাঃ, বেশ সব কথা। তাইতো বলি সবাইকে যেতে।

একজন ভক্ত—তাঁর ইচ্ছা ওখান থেকে কর্মী শিক্ষা পেয়ে পল্লীগ্রামে গিয়ে ধর্ম কর্ম দুই-ই শিক্ষা দেবে। শুধু ভজনে আর ভোজনে এখন চলবে না, তিনি বলেন।

শুকলাল—সাধুদের ভজন ও ভোজন, আর গৃহস্থদের ভজন ভোজন কি এক রকম ?

শ্রীম—তা নয় বটে। সাধুরা মাধুকরী করে জীবিকা নির্বাহ করেন আর সর্বদা তাঁর সঙ্গে যোগে থাকেন।

ইতিমধ্যে যোগেন ও অমৃত প্রবেশ করিলেন। খানিক পর বড় জিতেন, ডাক্তার কার্তিক ও বিনয় আসিলেন।

বড় জিতেন (শ্রীমর প্রতি চাহিয়া)—political prisoners (রাজবন্দীরা) জেল থেকে এসে বেশ উৎসাহের সঙ্গে কাজ করছে—চন্দননগরের গান্ধীদলের লোকেরা।

শ্রীম—গান্ধী মহারাজ ঠিক জিনিসটি ধরেছেন। বলছেন, life simple (সহজ অনাড়ম্বর জীবন) কর। এটা খুব সত্য কথা। শরীর ধারণের জন্য আহার, এ কথাটা বিশেষ করে মনে রাখা উচিত। কর্ম বাড়ালেই মুস্কিল। এমন সব লোক আছে, হয়তো নিজে কিছু ভোগ করছে না, কিন্তু ছেলে মেয়ে জামাই এদের এমন সব styleএ (চালে) রাখে যাতে এদের ইন্ধন যোগাবার জন্য সর্বদা তাকে কর্ম করতে হয়। তাদের ভোগের উপকরণ যোগাবার জন্য তাকে ব্যস্ত থাকতে হয় সর্বদা। নিজের জন্য সময় হয় না ঈশ্বরকে ডাকবার। আবার এমন কর্তাও দেখেছি, নিজে অতি সরল জীবনযাপন করেন—আহার, পোশাক সব সাধারণ রকমের। ছেলেমেয়ে ভাইপো ভাগনে প্রভৃতি পরিবারের সকলকে এক স্টাইলে রাখতেন সব simple wayতে (অনাড়ম্বরভাবে)। বাড়ালে যে রক্ষে নেই। চন্দ্রকান্ত চক্রবর্তী ছিলেন এই শ্রেণীর লোক। হাইকোর্টের উকিল ছিলেন আর প্র্যাকটিস তত ছিল না।

বেলুড়মঠের স্বামী ধীরানন্দ ও বলরাম বসুর এক নাতজামাই আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

শ্রীম (বড় জিতেনের প্রতি)—কাশীপুর বাগানে ঠাকুর একজনকে বলেছিলেন, পুত্র উৎপাদনের শক্তি আর ঈশ্বর লাভ করার শক্তি দুই-ই কি এক? ঈশ্বর লাভ হয় যে শক্তিতে, তার কাছে ইন্দ্রিয়াদি দমন থাকে, দাস হয়ে থাকে। আর পুত্র উৎপাদনের শক্তি যা তা ইন্দ্রিয়ের দাস। (তর্জনী দেখাইয়া) এমন রোগা পটকা, গায়ে মাংস নাই বললেই হয়—ওমা, স্ত্রীসঙ্গের সময় অমিত বল তার। সরাটাও টা, ঘোড়াটাও টা? মুড়ি মিছরীর এক দর? মুড়ি মিছরীর এক দর করলে শূলে যেতে হয়। (মোহনের প্রতি) জানেন তো গল্পটা?

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—এক গুরুর একজন শিষ্য ছিল। গুরু শিষ্যকে উপদেশ দিলেন, যেখানে মুড়ি মিছরীর এক দর দেখবে সেখানে থাকবে না। শিষ্য অনেক পর্যটন করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। তার

বিশ্রামের প্রয়োজন। একটি স্থান বেছে নিলে। সেখানে দেখতে পেলে মুড়ি ও মিছরী এক্ দরে বিক্রী হচ্ছে। তখন গুরুর কথা স্মরণ হলো বটে, কিন্তু লোভ সামলাতে পারলে না। ভাবলো, কয়েক দিন থেকে হৃষ্টপুষ্ট হয়ে যাই। তাই আছে, খায় দায় বেড়ায় আনন্দে। শরীরও বেশ সতেজ হচ্ছে। সেই সময়ে সে দেশের রাজার কালীবাড়িতে নরবলি হবে—একটি লোকের দরকার। এক জন পাইক গিয়ে ধরে নিয়ে এলো একটি রোগা লোক। রাজার পছন্দ হলো না। হুকুম হলো, মোটা সোটা দেখে আন। রাস্তায় শিষ্যকে পেয়ে তাকে ধরে নিয়ে এল। বলির সব আয়োজন হয়ে গেছে। বহু লোক উপস্থিত। শিষ্য কত অনুনয় বিনয় করলে ছেড়ে দিতে। গুরুর আজ্ঞা অমান্য করায় এই বিপদ—এই কথা স্মরণ করে কাঁদতে লাগলো। ঈশ্বরকে শেষ ডাক ডাকার আদেশ হলো। শিষ্য বসে কাঁদছে আর জপ করছে, এক একবার চেয়ে সবাইকে দেখছে ব্যাকুল হয়ে। গুরুও ভ্রমণ করতে করতে ওখানে উপস্থিত হলেন। বহু লোকের সমাবেশ দেখে সেখানে গেলেন ব্যাপার কি দেখতে। দেখতে পেলেন আপন শিষ্য যূপকাষ্ঠে বাঁধা। সস্নেহে জিজ্ঞাসা করলেন, তোর এ দশা কি করে হলো? শিষ্য করজোড়ে বললে, গুরুদেব আপনার কথা অমান্য করায় এ দুর্দশা। রক্ষা করুন আমায়। গুরু আদেশ করলেন, গা খুলে বস্। গুরু তখন রাজকর্মচারীদের বললেন, এ বলি হতে পারে না, অশাস্ত্রীয়। এর গায়ে ঘা আছে। তার গায়ে ঘা ছিল একটা, গুরু তা জানতেন। তারপর রাজার আদেশে মুক্তিলাভ করে সে।

যে সর্বত্যাগ করে ভগবানকে ডাকছে, আর যে সংসারভোগের জন্য চেষ্টা করছে এ দু'জনের শক্তি এক নয়। যোগশাস্ত্রে দুটি শক্তির কথা আছে—একটি constructive (গঠনমূলক), অপরটি হলো destructive (ধ্বংসমূলক)। একটির রূপ "ইতি ইতি", অপরটি "নেতি নেতি"। প্রবৃত্তি আর নিবৃত্তি।

জগতের কল্যাণের জন্য যোগী, ঋষি, মহাপুরুষগণ এ সব কথা অতি স্পষ্ট করে বলে গেছেন। যার প্রকৃতি যেমন, সে তেমনি কাজ

করবে। একজনের প্রকৃতিতে প্রবৃত্তি অর্থাৎ কর্মশক্তি প্রবল থাকলে তাকে তা করতেই হবে। হাজার চেষ্টা করেও তা রোধ করতে পারবে না। তবে উপায় বলে দিয়েছেন মুক্ত হওয়ার—নিষ্কাম হয়ে কর। নিষ্কাম কর্মদ্বারা প্রবৃত্তিও ক্ষয় হবে অথচ বদ্ধ হবে, না কর্ম-ফলে। অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ এই সঙ্কেতটি বলে দিয়েছিলেন। নিষ্কাম কর্ম করলে মিথ্যা অহংকার নাশ হয়, তা'হলেই চিত্ত শুদ্ধ হয়। শুদ্ধ চিত্তে তাঁর ছাপ পড়ে। এটি হয়ে গেলেই মুক্তি—আর জন্মমরণ দুঃখে পড়তে হয় না।

যার যা প্রকৃতি সেটি জোর করে ছেড়ে যেতে চাইলেই যত বিপদ। ঈগলের ওড়া দেখে কচ্ছপ উড়তে চাইলো। ঈগল বারণ করেছিল। কচ্ছপ শুনলে না তার কথা। একটা কাঠিতে কামড়িয়ে রইল কচ্ছপ, আর ঈগল পায়ে করে উঠিয়ে নিয়ে উড়তে লাগলো। উঁচুতে উঠে যেই আনন্দ প্রকাশ করতে গেল কচ্ছপ, কাঠি থেকে মুখ আলগা হয়ে গেল, আর পাহাড়ের গায়ে পড়ে চুরমার হয়ে গেল। যার যা প্রকৃতি তার ভিতর দিয়েই তাকে যেতে হয়। যাদের প্রকৃতিতে বিয়ের বাসনা আছে তাদের, বিয়ে করো না বললে কি শুনবে? কি বল শচীবাবু?

শচীর বিবাহের কথা হইতেছে।

শ্রীম (ডাক্তারের প্রতি)—সবই তাঁর। তাঁর জিনিসেই তাঁর পূজা করা। বাপের টাকায় ছেলে বাপকে খাওয়াচ্ছে। ব্রাহ্ম-সমাজের একজন বলেছিলেন ঠাকুরকে, 'মশায়, ফুল দিয়ে পূজা, এতে কি হবে? তাঁর জিনিসে তাঁকে পূজা।' ঠাকুর তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমরা কি দিয়ে তাঁর পূজা কর?' উনি উত্তর করলেন, 'মনে'। তখন ঠাকুর বললেন, 'আচ্ছা, মন কি তোমাদের বাপের বাড়ী থেকে পেয়েছ? মনও যে তাঁরই।' (শচীর প্রতি) তিনিই আর এক রূপে মহামায়া হয়ে রয়েছেন। আগে তাঁকে সন্তুষ্ট করতে পারলে তবে হবে।

শ্রীম (স্বামী ধীরানন্দের প্রতি)—একদিন পঞ্চবটীতে ছাতা রেখে

এসেছি। ঠাকুরের সব দিকে হুঁশ, এটি লক্ষ্য করেছেন। ঘরে এসে বললেন, 'ছাতাটা আনলে না। এর (সমাধির) পরও এখানকার সব হুঁশ থাকে আর তোমাদের ভুল হয়ে যায়।' আর একদিন সমাধির পর নেমে এসে বলছেন, 'ওরে রামলাল, তেলের কোঁড়েতে তেল আছে তো'? এই বিরুদ্ধ ধর্মের সমাবেশ অবতারের জীবনে হয়। 'True to the kindred points of heaven and earth ?'—অখণ্ড সচ্চিদানন্দ-সাগরে বিলীন সমাধি অবস্থায়। বুত্থিত হয়ে, জগতের খুঁটিনাটি সব বিষয়ের কথা ভাবছেন।

শ্রীম (বড় জিতেনের প্রতি)—কি জানেন, ladders (সোপান) সব আছে feelings এর (ভাবের)। মার্টিনিউর এই মত। সিঁড়ির নিচের সব দেখতে পায় লোক। উপরে কি আছে তা জানে না। এক এক তলায় এক এক রকম। তাই রামপ্রসাদের সব গান লোক বুঝতে পারে না। এক এক stage এ (অবস্থায়) এক এক রকম। তারপর সাত তলায় উঠে তখন নিচের সব দেখতে পায়। ঠাকুর ফষ্টিনষ্টি করছেন সাত তলা থেকে নেমে এসে একতলায়। আবার ফস্ করে সমাধিস্থ—সব নীরব, প্রশান্ত। অতটা নেমে আসতে পারেন আবার ওপরে ওঠেন। রাজার ছেলে, সাত মহল বাড়ীর সর্বত্র তাঁর গতিবিধি। অপর লোক শুধু নিচের বা বাইরের মহলে যেতে পারে। তপস্যার দরকার। তপস্যা করলে তাঁর কৃপায় এ সব বোঝা যায়। অবতার যেমন বাউলের দল—ফস্ করে বাড়ীতে ঢুকে পড়লো, গান গাইলো আবার চলে গেল।

ভক্তগণ প্রসাদ খাইতেছেন—গিন্নি-মা পাঠাইয়াছেন। রাত্রি পৌনে দশটা।

২

১৪ই সেপ্টেম্বর। মর্টন স্কুলের আফিস ঘর। রেক্টারের আসনে শ্রীম বসিয়া আছেন। পাশেই অন্য চেয়ারে একটি যুবক শিক্ষক। দুই চারি জন অপর শিক্ষকও এদিক ওদিকে বসিয়া আছেন। কেহ খবরের কাগজ পড়িতেছেন। এখন স্কুলের কার্য চলিতেছে, বেলা

বারটা। এক কোণে নিচে মেঝেতে বসিয়া স্কুলের বেয়ারা পীতাম্বর। অদূরে মেছুয়াবাজার স্ট্রীট দিয়া একটি ইংলিশ ব্যাণ্ড যাইতেছে—কি মনোমুগ্ধকর বাজনা! বাজনার মধুর শব্দ শুনিয়া বেয়ারার তন্দ্রা ভঙ্গ হইল। সে অতি মনোযোগপূর্বক শুনিতেছে। পরমতত্ত্ববেত্তা জাগ্রতদৃষ্টি শ্রীমর দৃষ্টি এড়াইবার যো নাই। ইনি ইহা লক্ষ্য করিয়াছেন। গৃহের কাহারও এদিকে নজর নাই। প্রশান্তভাবে যুবক শিক্ষককে বলিতেছেন ক্ষীণস্বরে, "Shakespeare says, a man who has no taste for music can commit a treason. The bearer was dozing; but as soon as he heard the sweet music of the band he awoke, stood up and is all attention to it."

নবীন ভাস্কর ছ'মাস হবিষ্যি করে বেলা আড়াইটায় খেয়ে দক্ষিণেশ্বরের মা কালীর মূর্তি গড়েছিলেন। ঠাকুর বলতেন, ভাস্করের কাজ, চিত্রাঙ্কন, কবিতা, সঙ্গীত এ সব শিল্প মানুষকে চিন্তাশীল করে।

এখন সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা। দোতলার পশ্চিমের ঘরে ভক্তদের নৈশ মজলিস বসিয়াছে। অমৃত, সুধীর আর শচী, বড় অমূল্য ও সুরপতি বসিয়া আছেন। এইবার জগবন্ধু ও অপর একজন ভক্ত আসিলেন। সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীম প্রবেশ করিলেন। মেঝেতে মাছুরে শ্রীম বসিয়া আছেন পূর্বাস্য হইয়া। ক্ষণকাল পর শ্রীম আবার কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (বড় জিতেনের প্রতি)—আজ প্রকৃতির ব্যাপার দেখে এলাম। এক ধোপী, পিঠে কাপড়ের এক বোঝা—রাস্তা দিয়ে চলছে। তার আগে আগে একটি শিশুপুত্রও যাচ্ছে। দেখতে পেলাম তার পিঠেও একটি ছোট পুঁটুলি। Surroundings create (পরিবেশ সৃষ্টি) করছে এখন থেকেই। একেই তো men are born with past impressions (অতীত সংস্কার নিয়ে জন্ম), তার ওপর আবার এ সব শিক্ষা। শ্রীকৃষ্ণ এই প্রকৃতির কথাই অর্জুনকে বলেছিলেন—'প্রকৃতিস্ত্বাং নিয়োক্ষ্যতি'।

বড় অমূল্য—গীতার উপদেশ অর্জুনের জন্য। অর্জুন গৃহী। গৃহী হয়ে ভগবান লাভের চেষ্টা করতে হবে, কি, সাধু হয়ে?

শ্রীম—তাঁর যেমন ইচ্ছা। কোনটাই তো তিনি ছাড়া নন। তাঁর ইচ্ছায়ই সব হয়, আমাদের ইচ্ছায় কিছু হবে না। তাঁর দুটো ডিপার্টমেন্ট আছে, বিদ্যা ও অবিদ্যা—ঠাকুর বলতেন। বিদ্যার ডিপার্টমেন্টেও রাখতে পারেন, আবার অবিদ্যায়ও ফেলে দিতে পারেন। বিদ্যার এলাকার লোকদের দেখলে চেনা যায়। চারদিকে ছুটাছুটি—কোথায় তাঁর কথা হচ্ছে, কোথায় সাধুসঙ্গ। অবিদ্যার লোকদের সংসারে ভুলিয়ে রাখেন। ঈশ্বর, সাধু এ সব তাদের ভাল লাগে না। যাতে সংসারের ভোগ বাড়ে—টাকা, নাম যশ এই সব—সেই কামিনীকাঞ্চন নিয়ে মজে থাকে। ঠাকুর বলতেন, সংসারে থেকে বড় কঠিন, এই যা। বড় সাবধানে চলতে হয়। মায়াময় সংসার। তবে তিনি যদি ধরে রাখেন তাহলে আর ভয় নাই। বাপ ছেলের হাত ধরলে ছেলের পতনের ভয় থাকে না।

জাপানের যে এই কাণ্ডটা হয়ে গেল, কার ইচ্ছায় হলো—পাঁচ লাখ লোকক্ষয়? তাঁরই ইচ্ছায় হলো। যেমন সৃষ্টি আর পালন করেন, তেমনি বিনাশও তিনিই করেন। আর যে হবে না এইরূপ প্রলয়কাণ্ড, তা কেউ বলতে পারে না। তাঁর ইচ্ছা, তিনি লীলাময়, তিনি স্বতন্ত্র। যদি বল, কেন এ সব বীভৎস কাজ করছেন তিনি? তার এক উত্তর, 'জানি না'। লেডি 'হাউ' (How), ম্যাডাম 'হোয়াই' (Why) এ দুটি আছে। 'হাউ' বলা চলে, 'হোয়াই' বলতে পারে না মানুষ। ধ্বংসেও তাঁর আনন্দ আছে। 'আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তীতি'। ধ্বংসেও আনন্দ।

দক্ষিণেশ্বরে একদিন খুব জল ঝড় হচ্ছে তাই দেখে ঘরের ভেতর ঠাকুর বিভোর হয়ে নৃত্য করতে লাগলেন। মুখে গান—'কখন কি রঙ্গে থাক মা শ্যামা সুধা তরঙ্গিণী'। মায়ের প্রলয়ঙ্করী মূর্তি দেখে এই নৃত্য। মায়ের এই তাজ্জব কাণ্ড দেখে আর একটি গাইতেন—

'শ্যামা মা কি কল করেছে, কালী মা কি কল করেছে। চৌদ্দ পোয়া কলের ভিতরে কত রঙ্গ দেখাতেছে।' এটি তাঁর একটি favourite (প্রিয়) গান।

রাত্রি প্রায় নয়টা। ডাক্তার ও বিনয় গৃহে প্রবেশ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে শ্রীমও উঠিলেন—উপরে যাইতেছেন আহার করিতে। শ্রীমর উপদেশমত মণি ভাগবত পাঠ করিতেছেন—একাদশ স্কন্ধ, ষড়বিংশ অধ্যায়, উর্বশী-পুরুরবা সংবাদ। শ্রীম আহার করিয়া ফিরিয়াছেন। ভাগবত পাঠ এখনও চলিতেছে। শ্রীম বলিলেন, পুরুরবার গাথা আবার পাঠ হোক।

মণি—পুরুরবা বলিতেছে, 'অহো রে কামমূঢ়চেতা আমি! আমার কি মোহবাহুল্য···কি পরিতাপের বিষয়! উর্বশীর মোহে পতিত হইয়া কত বর্ষের অসংখ্য দিন যে চলিয়া গিয়াছে তাহাও অনুভব করিতে পারি নাই। অহো, আমার কি বিভ্রম! আমি রাজচক্রবর্তী হইয়াও নিজেকে রমণীর ক্রীড়াসামগ্রী করিয়াছিলাম।··· আমি নগ্নবেশে উন্মত্তবৎ কাঁদিয়া কাঁদিয়া রমণীর অনুসরণ করিয়াছিলাম।·· নারী যাহার মন হরণ করে তাহার তেজ, বল, প্রভাব এবং বিদ্যা, তপস্যা ও সন্ন্যাস, আর শাস্ত্রজ্ঞান, একান্ত সেবা ও বাক্যসংযম—এ সকলই বৃথা। আমি বহু বৎসর যাবৎ ভোগ করিয়াছি তথাচ তৃপ্তির শেষ হয় নাই। প্রত্যুত আহুতিলাভে অনলবৎ পুনঃ পুনঃ ঐ ভোগপিপাসা বৃদ্ধিই পাইয়াছে।···এখন আত্মারাম পরমেশ্বর ব্যতীত আমার ন্যায় ব্যক্তির আর মুক্তির উপায় নাই।'

শ্রীম—অনুশোচনা এসেছে তাহলেই হলো। ক্রাইস্ট বলেছিলেন, Repent and thou shall see God. আপনার ভুল বুঝে ঈশ্বরের স্মরণ নিলেই কাজ হয়ে গেল। তাঁর জন্য ব্যাকুল হলেই হল। তিনি সব মাপ করেন। 'অপিচেৎ সুদুরাচারো ভজতে মাম্ অনন্যভাক্। সাধুরেব স মন্তব্য সমাগ্ব্যবসিতো হি স'॥ ব্যাকুল হয় মানুষ ভোগ শেষ হলে। পুরুরবা রাজচক্রবর্তী, Emperor, ভোগান্তে তার ব্যাকুলতা হয়েছে। নিজের অবস্থা বেশ বুঝতে পারছে—কত

নেচে নেমেছে। তাই ঠাকুর বলতেন—কেল্লায় প্রথম জানতে পারে না লোক কত নিচে নামছে—কলমবারা রাস্তা যে। যখনই হুঁশ হয় তখন তিনি কোলে তুলে নেন।

পাঠক—পুরুরবা পুনরায় বলিতেছে, 'আমার রজ্জুতে সর্প ভ্রম হইয়াছে। আমি দ্রষ্টার স্বরূপ বুঝি নাই। দুর্গন্ধময় মলোচিত অশুচি দেহে আমি পরমেশ্বরের কুসুমবৎ সৌরভগুণ আরোপ করিয়াছি।… দেহ কাহার? উহা কি পিতামাতার, না, ভার্যার, স্বামীর, অগ্নির, কুকুরের, গৃধ্রের, নিজের বা বন্ধুজনের?…নারীদেহ, ত্বক, মাংস, রক্ত, স্নায়ু, মেদ, মজ্জা ও অস্থিপুঞ্জে গঠিত। ইহাতে যাহারা বিহারপরায়ণ হয়, বিষ্ঠা, মূত্র ও পূয-বিহারী কৃমিকুলের সহিত তাহাদের প্রভেদ কি?'

শ্রীম—ঠিক এই কথাই ঠাকুর একজন ভক্তকে বলেছিলেন। পুরুষদের মেয়ে সম্বন্ধে এইরূপ ভাবনা হয়, আবার মেয়েদেরও পুরুষ সম্বন্ধে এইরূপ ভাবনা হয়, যারা শ্রীভগবানকে চায়। তীব্র বৈরাগ্য হলে এই দৃষ্টি।

পাঠক (পড়িলেন)—বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হইলেই মন ক্ষুব্ধ হইয়া থাকে।…ষড়রিপু বিদ্বজ্জনেরও অবিশ্বাস্য।

শ্রীম—এইজন্য দূরে পালিয়ে যায় প্রথম প্রথম। চোর যেমন জেল থেকে পালায় তেমনি পলায়ন। অতি দূরে গিয়ে বাস করে। Out of sight out of mind—চোখের আড়াল হলে মনেরও আড়াল হয়ে যায় ক্রমে। সঙ্গদোষে পরমহংসেরও পতন হয়, ঠাকুর বলতেন। যারা শুধু তাঁকেই চায় তাদের জন্য এই ব্যবস্থা। অপরদের বলতেন, বেশ তো দিন কতক নির্জনে ঈশ্বরের ভজন করে জ্ঞানভক্তি লাভ করে সংসার কর। তখন পড়বার ভয় কম। কাঁচা মন নিয়ে সংসার করতে গেলেই বিপদ।

ভক্তগণ বিদায় লইতেছেন। শ্রীম সিঁড়ির সামনে দাঁড়াইয়া আছেন। রাত্রি এখন দশটা। বলিতেছেন, কর্ম প্রকৃতিতে থাকলে কি ছাড়বার যো আছে? আমরাই কি ছাড়তে পেরেছি? ঐ অবস্থাটা

তো খুব ভাল, তা হয় কই (নির্জনে তপস্যা)? তবে তাঁর কৃপা হলে হয়। (বড় অমূল্যর প্রতি) শাস্ত্র পড়বে তার interprete (ব্যাখ্যা) করে কে? অসার ভাগ বাদ দিয়ে সারটুকু বলতে পারেন কেবল গুরু। গুরু মানে ঈশ্বর, অবতার। সব তো ঠিক নাই— রিপোর্ট করতে ভুল হয়ে যায়, আবার interpolation (প্রক্ষিপ্ত) আছে। তাই গুরুবাক্য-বিশ্বাস একমাত্র পথ।

৩

পরের দিন শনিবার। শ্রীম মর্টনের দোতলার পশ্চিমের ঘরে মাদুরে বসিয়া আছেন। সম্মুখে ভক্তগণ—বড় জিতেন, বড় নলিনীর দাদা, ছোট নলিনী প্রভৃতি। ইটালীর হরেন বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়েতে কাজ করেন, ইনিও আসিয়াছেন। এখন রাত্রি আটটা। একটি ভক্ত বেদান্ত সোসাইটি হইতে ফিরিয়াছেন। অমৃত ও অপর একটি ভদ্রলোক গৃহে প্রবেশ করিলেন। ডাক্তার ও বিনয় সকলের শেষে আসিয়াছেন।

শ্রীমর জ্যেষ্ঠপুত্র প্রভাসবাবু বায়ু পরিবর্তন করিতে দেওঘর গিয়াছিলেন। আজ ফিরিয়াছেন। তাঁহার অনুপস্থিতিতে শ্রীমকে স্কুলের কাজ দেখিতে হইত। আজ ইনি আসায় শ্রীমর অবসর মিলিয়াছে। তিনি আনন্দে ভক্তদের সঙ্গে কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (হরেনের প্রতি)—অনেকে আছে ট্রামের পয়সা ফাঁকি দেয়, ছ'পয়সা। আবার এমনতর কেউ কেউ আছে কণ্ডাকটার না চাইলেও নিজে গরজ করে টিকিট কেনে। হয়তো খুব ভিড়, টিকিট করতে পারলে না—সে অবস্থায় পয়সা ট্রাফিক ম্যানেজারের কাছে পাঠিয়ে দেয়। কেউ কেউ ট্রানস্‌ফার টিকিট করে অর্ধেকখানা আজ আর বাকীটা অন্য দিন ব্যবহার করে। এ সব লোক pennywise pound-foolish (কড়ায় কড়া কাহনে কানা)। ছ'পয়সার জন্য বুঝতে পারলে না কত ক্ষতি হচ্ছে। 'And narrow is the way which leadeth into life', 'and broad is the way that

leadeth to destruction'। 'ক্ষুরস্য ধারা' বেদ বলেছেন, ভগবান লাভ এত কঠিন। কিন্তু নরকের পথ প্রশস্ত।

হরেন্দ্র চলিয়া যাইতে চাহিলে শ্রীম বাধা দিয়া বলিলেন—বস, শোনো একটু বেদান্ত সোসাইটির কথা। (একজন ভক্তের প্রতি) এদিকে আস্থন। বলুন কি হলো আজের ক্লাসে। ভক্তটি বলিতেছেন, আজ ছিল প্রশ্নোত্তর ক্লাস। সভ্য পঞ্চাশ জন। বিকাল ৫-৩০ মিনিটে আরম্ভ হয়। নিম্নলিখিত রূপ কথাবার্তা হইল। প্রশ্ন নানা জনের, উত্তর অভেদানন্দ মহারাজের।

প্রশ্ন—শঙ্কর বলেছেন জগৎ মিথ্যা, 'স্বামীজী' বলেছেন কাজ কর। মিথ্যা জগৎ হলে কাজ করে লাভ কি?

উত্তর—শঙ্কর কি অর্থে সংসার মিথ্যা বলেছেন সেটা দেখতে হবে প্রথমে। 'সংসার মিথ্যা' মানে name and formএ (নাম ও রূপে) মিথ্যা। চেয়ারটা পুড়ে গেলে চেয়ার মিথ্যা হয়ে গেল। জাপান ধ্বংস হয়ে গেল। বস্তুতঃ, in reality কিছু ধ্বংস হলো কি?—in matter? শুধু নামমাত্র changed (পরিবর্তন) হলো। সত্য অর্থ, যা তিন কালে থাকে—ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান, অর্থাৎ যার পরিবর্তন নেই। আর মিথ্যা মানে যা বদলায়, যা তিন কালে একরূপ থাকে না। নাম রূপই থাকে না, substance (মূল তত্ত্ব) থাকে, এটি সত্য।

স্বামীজী বলেছেন, দরিদ্র নারায়ণের সেবা কর। দরিদ্রের সেবা কর, এ কথা বলেন নি। 'নারায়ণের' সেবা করতে বলেছেন। 'দরিদ্র' এটা নামমাত্র, এর ভিতর যে 'ব্রহ্ম' রয়েছেন তাঁর সেবা করতে বলেছেন। ব্রহ্মকেই চলিত কথায় নারায়ণ বলে। 'সেবা' অর্থে শুধু খাওয়ান পরান নয়, ভালবাসা। তুমি নিজেকে যতটুকু ভালবাস তোমার প্রতিবেশীকেও ততটুকু ভালবাস। তোমার মধ্যে যিনি আছেন, ঐ 'দরিদ্র নারায়ণ' যাকে বল, তার মধ্যেও তিনিই আছেন। নিজের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য যেমন যত্ন কর, ওর সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্যও ঠিক তেমনি যত্ন কর। এতে চিত্ত শুদ্ধ হবে—'আমার আমার'

কমে যাবে। নিষ্কাম কর্মের মানেই ঐ—চিত্তশুদ্ধি করা। এখন একেবারে ভুলে রয়েছে—'আমার দেহ', 'আমার ছেলে', 'আমার গৃহ' এই সব নিয়ে। আর এদের আরাম খুঁজছ। আরে বাবা, শরীরটা তোর কিসে! তুই তার একটা চুল বা নখ তৈরী করতে পারিস? এই সব হীন ভাব থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্যই, ঈশ্বরের জন্য কর্ম। নিষ্কাম কর্ম করতে বলেছেন স্বামীজী। শঙ্কর 'মোহমুদ্গরে' বলেছেন, 'ব্রহ্মপদপ্রবিশাশু বিদিত্বা।' তা হলে দেখা যাচ্ছে শঙ্কর যা বলেছেন স্বামীজীও তাই বলেছেন—ব্রহ্মকে পূজা কর, যিনি দরিদ্রের ভিতর নারায়ণ রূপে রয়েছেন। একই কথা হলো।

এখন দুটো কথা naturally (স্বভাবতঃ) ওঠে—জগৎ মিথ্যা, কিংবা জগৎ সত্য, অর্থাৎ ভগবানের লীলাটি সত্য কিনা। এক অর্থে মিথ্যা তা পূর্বে বলা হয়েছে। ঠাকুর বলছেন লীলাও সত্য। 'কথামৃতে' আছে, ঠাকুর বলছেন, নিত্য ও লীলা দুই-ই সত্য—কারণ-অবস্থা ও কার্যাবস্থা। কারণ-অবস্থাতে সংসার গুটিয়ে নেন, কার্যাবস্থাতে বহুরূপে, জগৎরূপে খেলেন। দুই-ই Absolute (সত্য, নিত্য)। যদি বল, লীলার প্রয়োজন কি? তাঁর জবাব, তাঁর ইচ্ছা, তাঁর খেলা, তাঁর লীলা। অপর কেউ জানে না। তিনি ছাড়া অপর কেউ নাই যে—কে জানবে তা হলে? ঠাকুর বলতেন, সাপ কুণ্ডলী পাকিয়ে আছে—এটি ব্রহ্মের দৃষ্টান্ত, স্বরূপে আছেন। সাপ হেলে দুলে চলছে, এটি লীলার দৃষ্টান্ত।

'সংসার মিথ্যা'—এটা কার চক্ষুতে প্রতিভাত হচ্ছে—তোমার কি? তোমার নয়, কারণ তোমার জ্ঞানচক্ষু ফোটে নি। জ্ঞানীর চক্ষুতে জগৎ মিথ্যা বলে বোধ হয়—যেন মায়া মরীচিকা। এই চক্ষুতে নয়, এ হলো চর্মচক্ষু। জ্ঞানীদের কপালে একটি চক্ষু হয়, আর শরীরে একটি নাড়ি হয়—তার আলোতে সব দেখতে পায়—যা সত্য, যা যথার্থ। তার উত্তাপ নেই, কিন্তু আভা আছে। দেবতাদের শরীরের আলোও ঐ অর্থে। উহা spiritual light (ব্রহ্মজ্যোতিঃ) জড় সূর্যের light (জ্যোতিঃ) নয়। তুমি যদি

সূর্যেতে যেতে পার সেখান থেকে পৃথিবীর দিকে দৃষ্টি করলে সবই আলোময় দেখবে। সেইরূপ ভিতরে জ্ঞানসূর্য জ্বললে সবই সত্য বলে জ্ঞান হয়।

সংসারকে কিরূপ দেখছো জান? যেন মরুভূমিতে মরীচিকা। পথিক মরীচিকার অনুসরণ করে বিপদে পড়ে। সংসারের পেছনে ছুটলেও ওরূপ বিপদ হয়। মরীচিকার সৃষ্টি হয় কিরূপে জান? একটা vapour (বাষ্প) ওঠে পৃথিবী থেকে। তাতে সূর্যের আলো পড়ে। তাতে দূরের বৃক্ষাদি, জল এ সব reflected (প্রতিবিম্বিত) হয়। তখন মনে হয় ওখানে জল আছে, বাগান, শহর এ সব আছে। আমরা চিল্‌কা দেখতে গিছলাম একবার, সারদানন্দ, প্রেমানন্দ ও আমি। ওখানে আমাদের ওরূপ ভ্রম হয়েছিল। আমরা বলতে লাগলুম, কি সুন্দর স্থান! বাস্তবিক তা মিথ্যা। তেমনি সংসারকেও সত্য দেখে।

প্রশ্ন—পাপ, পুণ্য কি?

উত্তর—ছুটি forces (শক্তি), একটি constructive (গঠনাত্মক) অপরটি destructive (বিনাশাত্মক)—যেমন আলো ও আঁধার। আলোতে এলে আঁধার নেই। বস্তুতঃ পাপপুণ্য বলে কিছু নেই। তা মনের সৃষ্টি। যতক্ষণ অজ্ঞানে আছ, সংসারে ডুবে আছ বিষয়ে, ততক্ষণ পাপ। ওখান থেকে উঠে এলে পুণ্য। পাপ মানে অজ্ঞান, মিথ্যা জিনিসকে সত্য বলে ধরে নেওয়া। স্ত্রীপুত্রকন্যা, গৃহ—এ সবকে সত্য বলে ধরে নেওয়াই পাপ। ঈশ্বরকে ধরা, যিনি এদের ভিতর আছেন, পুণ্য।

প্রশ্ন—কেন মশায়, একজন মদ খাচ্ছে তার তো আমোদ সুখ আছে। একজন নিজের শরীরকে বেশ ভাল করে রক্ষা করছে, ছেলেমেয়েকে উত্তম আহার বস্ত্র দিচ্ছে—এ সবেতেও তো সুখ হচ্ছে?

উত্তর—না, এ প্রকৃত সুখ নয়। এ সুখ কতক্ষণ?—যতক্ষণ না নূতন আর একটা বিষয়ে মনকে বসাতে পেরেছে। তখন এ বিষয়ে আর সুখ থাকবে না। কিন্তু ভগবানের সুখের ক্ষয় বা হ্রাস নেই।

বিষয়-সুখ এই আছে, এই নেই। মদ খেলো একজন অমনি মাতলামি আরম্ভ করলো, এতে আর কি সুখ, কতক্ষণ থাকে? মদ খাওয়াটাই যে দুঃখ। ঈশ্বর হলেন সুখের সাগর। সংসারের যা সুখ তা তাঁর অনন্ত সুখ-সাগরের এক কণামাত্র। তুমি মিথ্যার পিছনে ঘুরে ঘুরে সুখ আনতে চাও, তাও কি কখন হয়? পরিণামে দুঃখই সার হবে।

ঠাকুর বেশ একটি গল্প বলেছিলেন। একজন কৃষকের একটি-মাত্র সন্তান পুত্র মারা যায়। কৃষক জ্ঞানী ছিল। সে নিজেকে সামলিয়ে নিয়েছে জ্ঞানবিচার করে। স্ত্রীর কিন্তু শোক অসহনীয়, খালি কাঁদছে আর আছাড়-পিছোড় খাচ্ছে। স্বামীকে স্থির দেখে বলছে, 'তুমি কি নিষ্ঠুর! এক ফোঁটা চোখের জলও পড়লো না একমাত্র পুত্রের মৃত্যুতে! কি পাষাণ তুমি!' কৃষক বললে, 'একটা কথা তোমায় বলছি। রাত্রিতে স্বপ্ন দেখলাম আমি হয়েছি রাজা আর তুমি হয়েছ রাণী। আমাদের সাত ছেলে হয়েছে। পরম সুখে আমরা রয়েছি। নিদ্রা ভঙ্গ হলে দেখলাম যে কৃষক সেই কৃষকই আমি। এখন ভাবছি, তোমার এক ছেলের জন্য কাঁদবো কি সাত ছেলের জন্য কাঁদবো?' জ্ঞানীর দৃষ্টিতে ঈশ্বর সত্য, জগৎ মিথ্যা এই রূপে।

হরেন্দ্র 'বেদান্ত সোসাইটি'র ঠিকানা একজন ভক্তের নিকট জানিয়া লইয়া নিজের নোট বইয়ে লিখিয়া লইতেছে। শ্রীমর দৃষ্টি এড়াইবার যো নাই। উহা লক্ষ্য করিয়া রহস্যচ্ছলে হরেনকে বলিতেছেন, ঐ কথাটিও kindly (দয়া করে) লিখে নাও নিচে— 'কাল মঠে যাব'। (বড় জিতেনের প্রতি) অনেক তীর্থ করেছে কিনা। সে দিনও এরা (জগবন্ধুকে দেখাইয়া) জোর করে মঠে নিয়ে গেল জন্মাষ্টমীর দিন রাত্রে। (উচ্চহাস্যের সহিত) তা চলে আসতে চায়। এরা সব জোর করে সারা রাত ধরে রেখে দিলে। (হরেনের প্রতি) আচ্ছা, তুমি এ সব কথাও লিখবে, প্রশ্নোত্তর ক্লাসের কথা যা সব হলো? যা এইমাত্র শুনলে?

হরেন্দ্র—এতে লিখি নাই। বড় ডায়েরী আছে তাতে লিখবো।

শ্রীম (কল্পিত বিস্ময়ে)—বড় ডায়েরী আছে, দেখলেন জিতেন-বাবু? তীর্থ করেছে বলে সব ঠিক আছে।

একজন ভক্ত—অভেদানন্দ মহারাজ সব কথার শেষেই ঠাকুরের কথা দিয়ে উপসংহার করেন। আজও বললেন, নিত্য ও লীলা দুই-ই সত্য, সাপের কুণ্ডলী পাকিয়ে থাকা আর হেলে দুলে চলা, স্বপ্নে রাজা ও সাত ছেলের বাপ হওয়া দেখা, এ সবই ঠাকুরের কথা।

হরেন্দ্র—ঠাকুরের কথার উপর কথা নেই, এর আর 'অ্যাপিল' নেই।

শ্রীম (অধিকতর বিস্ময়ে)—বটে! দেখ, কেমন সার বুঝেছে, তীর্থ করেছে কিনা তাই ধরতে পেরেছে।

হরেন্দ্র—ঠাকুরের কথা এত সরল ও সহজ, পাঁচ বছরের শিশুও বুঝতে পারে।

শ্রীম (বড় জিতেনের প্রতি)—দেখুন, আসলে ঠিক আছে।

হরেন্দ্র প্রণাম করিয়া বিদায় লইল। ভক্তগণ অন্য কথা সব বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

বড় অমূল্য (শ্রীমর প্রতি)—কোকিলেশ্বর শাস্ত্রী বেদান্তের বই লিখেছেন—শঙ্করের মত।

শ্রীম—হাঁ। পণ্ডিতদের কথা ছেড়ে দিন। ওঁরা যা বলেন তাই আমরা সাধুর মুখে শুনতে চাই—যিনি ঈশ্বরের জন্য সব ছেড়েছেন। পণ্ডিতদের কথা তো বরাবরই আছে। (জনৈক ভক্তের প্রতি)—হাঁ, সেদিন সাধুসঙ্গ-মাহাত্ম্য কি পড়া হয়েছিল সেটা আবার পড়ুন তো? ভাগবতখানা নিয়ে আসুন ঘর থেকে।

একজন ভক্ত ভাগবত পড়িতেছেন—১১ স্কন্ধ, ২৬ অধ্যায়—উর্বশী-পুরূরবা সংবাদ।

পাঠক (শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে কহিলেন)—যিনি বুদ্ধিমান হইবেন তিনি কুসঙ্গ ত্যাগ করিবেন; আর সাধুসঙ্গ করিতে থাকিবেন। সাধুগণের উপদেশগুণে তাঁহার মনের আসক্তি ছিন্ন হইয়া যায়। যাঁহারা নিরপেক্ষ, মদগত চিত্ত, প্রশান্ত, সমদর্শী, মমতাবর্জিত, নিরহঙ্কার, নির্দ্বন্দ্ব ও নিষ্পরিগ্রহ তাঁহারাই সাধুপদবাচ্য।

শ্রীম (পাঠকের প্রতি)—আবার পড়ুন এটা।

পাঠক—যাঁহারা নিরপেক্ষ, মদগত চিত্ত, প্রশান্ত, সমদর্শী, মমতাবর্জিত, নিরহঙ্কার, নির্দ্বন্দ্ব ও নিষ্পরিগ্রহ তাঁহারাই সাধুপদবাচ্য।

শ্রীম—ঠাকুরও ঠিক এই কথাই বলেছেন। যাঁর কাছে বসলে ঈশ্বরের উদ্দীপন হয়, অর্থাৎ ঈশ্বর সত্য সংসার অনিত্য—এ বোধ হয়, তিনিই সাধু।

পাঠক (পড়িতেছেন)—হে মহাভাগ উদ্ধব, সাধুগণ নিত্য হিত-জননী মদীয় কথারই আলোচনা করেন। ঐ সকল কথা শ্রোতাদিগের কলুষনাশিনী। যাঁহারা সাদরে সেই সাধুর কথা শ্রবণ, কীর্তন ও অনুমোদন করেন তাঁহারা মদেকতৎপর ও শ্রদ্ধাবান হইয়া আমারই ভক্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। মদ্ভক্তি অনন্ত গুণ ও আনন্দানুভবাত্মক। যে সাধু ঈদৃশ ভক্তিসম্পন্ন তাঁহার আর কি অবশিষ্ট থাকে?

ভগবান অগ্নিদেবের উপাসনায় মনুষ্যের যেমন শীতভয় ও অন্ধকার দূর হয়, সাধুগণের সেবা করিলেও নিখিল পাপ নষ্ট হইয়া যায়। জলে নিমজ্জনোন্মুখ ব্যক্তিগণের যেমন নৌকাই পরম অবলম্বন, উন্মজ্জন-নিমজ্জনশীল জীবগণের পক্ষে ব্রহ্মবেদী সাধুগণই তেমনি আশ্রয়। অন্ন যেমন জীবগণের প্রাণ, আমি যেমন দীনজনের শরণ, ধর্ম যেমন মানবের পারলৌকিক ধন, সাধুগণ তেমন সংসার-পতিত ভীত জীবগণের পরিত্রাণের কর্তা। সূর্য সম্যক্ প্রকাশিত হইয়া একটিমাত্র বহির্চক্ষু প্রদান করেন, কিন্তু সাধুগণ বহুচক্ষু অর্থাৎ সগুণ নির্গুণ বহু জ্ঞান প্রদান করেন। সাধুগণই দেবতা, তাঁহারাই বান্ধব এবং তাঁহারাই আমি।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—সাধুরাই আমি, ভগবান বলেছেন। আবার গীতায়ও ঠিক এ-কথাই বলেছেন, 'জ্ঞানী তু আত্মৈব মে মতম্' —জ্ঞানী আমার স্বরূপ। সেই সাধুগণের কথা আমরা শুনতে চাই। নইলে প্রাণ শীতল হবে কি করে? যাঁরা হাতে এনেছেন বাজনার বোল তাঁরাই সাধু। পণ্ডিতদের কথায় ঠাকুর বলতেন, খড়কুটোর মত মনে হয়। কিন্তু পণ্ডিত যদি বিবেক বৈরাগ্যবান্ হন তবে খুব

মাত্র দিতেন। বলেছিলেন, 'কে জানে বাপু তোর গাইগুঁই বীরভূমের বামুন মুই'। 'গাইগুঁই', মানে non-essential part (অনাবশ্যক ভাগ); 'বীরভূমের বামুন মুই' মানে ঈশ্বরের সন্তান, জগন্মাতার ছেলে—'মদগত চিত্ত', 'মদেকতৎপর'।

শ্রীম এইবার কথামৃত হইতে একটি সিন পড়িয়া ভক্তদের শুনাইতেছেন। ইতিপূর্বে আরো চারটি শুনাইয়াছেন। ঠাকুর অধরের গৃহে বৈঠকখানায় নৃত্য করিতেছেন। 'সেই অপরূপ নৃত্য' দেখিয়া নরেন্দ্র প্রভৃতি ভক্তেরা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। নাচিতে নাচিতে ঠাকুর একেবারে সমাধিস্থ হইতেছেন। তখন অন্তর্দশা। মুখে একটি কথা নাই। শরীর সমস্ত স্থির। ভক্তেরা তখন তাঁহাকে বেড়িয়া বেড়িয়া নাচিতেছেন। কিয়ৎক্ষণ পরই অর্ধবাহ্যদশা—চৈতন্যদেবের যেরূপ হইত। অমনি ঠাকুর সিংহবিক্রমে নৃত্য করিতেছেন। তখনও মুখে কথা নাই—প্রেমে উন্মত্তপ্রায়। যখন একটু প্রকৃতিস্থ হইতেছেন অমনি একবার আখর দিতেছেন। আজ অধরের বৈঠকখানা শ্রীবাসের আঙ্গিনা হইয়াছে। হরিনামের রোল শুনিতে পাইয়া রাজপথে অসংখ্য লোক জমিয়া গিয়াছে। ভক্তসঙ্গে অনেকক্ষণ নৃত্যের পর ঠাকুর আবার আসন গ্রহণ করিলেন। সেই অবস্থায় নরেন্দ্রকে বলিতেছেন—সেই গানটি, 'আমায় দে মা পাগল করে'।

অধর সেনের বাড়ীতে যত গান হইয়াছিল সবগুলি শ্রীম ভক্তসঙ্গে গাহিতেছেন। সকলের শেষে শ্রীমর ইচ্ছায় একটি ভক্ত শঙ্করাচার্যকৃত দুর্গাপরাধ ক্ষমাপণস্তোত্র আবৃত্তি করিতেছেন,—

ন মন্ত্রং নো যন্ত্রং তদপি চ ন জানে স্তুতিমহো।
 ন চাহ্বানং ধ্যানং তদপি চ ন জানে স্তুতিকথাঃ।
ন জানে মুদ্রাস্তে তদপি চ ন জানে বিলপনং
 পরং জানে মাতস্তদনুসরণং ক্লেশহরণম্ ॥

বেলেঘাটা, কলিকাতা, ১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯২৩ খ্রীঃ
২৮শে ভাদ্র, ১৩৩০ সাল, শনিবার।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ঈশ্বরদর্শনের কথাই ভারতের ইতিহাস

১

বেদান্ত সোসাইটি হইতে শচী ও জগবন্ধু এইমাত্র ফিরিয়াছেন। শ্রীম দোতলার ঘরে বসিয়া আছেন। এখন সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা। শুকলাল, যোগেন, রমণী, 'দীর্ঘকেশ', সুরপতি, নলিনী প্রভৃতি বসিয়া আছেন। একটু পর সুধীর, ডাক্তার, বিনয় এবং দুর্গাপদ আসিলেন।

আজ ১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯২৩ খ্রীঃ, ২৯শে ভাদ্র ১৩৩০ সাল, রবিবার। শ্রীমর ইচ্ছায় জগবন্ধু বেদান্ত সোসাইটির বক্তৃতার নোট পড়িয়া শুনাইতেছেন। আজ বিষয় ছিল বেদান্ত—কর্মযোগ। সাড়ে পাঁচটায় আরম্ভ হয়। সভ্যসংখ্যা পঞ্চাশজন ছিল।

স্বামী অভেদানন্দ বলেন, বেদান্তের ভিতর দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদ—এই তিন মতই রহিয়াছে। তাহা ছাড়া জ্ঞানযোগ, রাজযোগ, ভক্তিযোগ ও কর্মযোগ—এই চার প্রধান পথও রহিয়াছে। আজকার আলোচ্য বিষয় কর্মযোগ।

শ্রীম—কর্মযোগ মানে, যা কিছু করা যায়, ভাবতে হবে তাঁর পূজা করছি এই সব দিয়ে, তা হলেই কর্মযোগ হল। কর্মদ্বারা তাঁর সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকা। তাঁর কর্ম আমি করছি, আমি যন্ত্র মাত্র, মালিক তিনি। এই হল কর্মযোগের secret (কৌশল)। মাংসবিক্রেতাও এ দেশে ব্রহ্মজ্ঞানী হয়েছেন, ভগবান লাভ করেছেন এই কর্মযোগের দ্বারা।

যখন যা করা যায় তার ফল ভগবানকে সমর্পণ করলে পরে আর কোনও খারাপ কাজ করা যায় না। কর্মযোগের প্রথম সোপান প্রার্থনা। তোমরা রোজ দু'বার সকাল সন্ধ্যায় প্রার্থনা করতে শেখ। বল—হে প্রভো, সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত যা কিছু করেছি সব তোমাকে অর্পণ করলুম। আবার সন্ধ্যে থেকে সকাল পর্যন্ত যা কর—তার ফল সকালে সমর্পণ করে দেবে—প্রার্থনাদ্বারা। ভাল মন্দ সব

ফল তাঁকে দেবে। কিছু আমার, কিছু তাঁর—তা নয়, সব তাঁর। এইরূপে অভ্যাস কিছুকাল করলে শেষকালে দেখতে পাবে তুমি আর খারাপ কাজ কিছু করতে পারবে না। লজ্জা হবে খারাপ কাজ করতে এই ভেবে—আমার ইষ্টকে খারাপ জিনিস দিই কি করে?

এ করতে হলে একটি আদর্শ ধরে নিতে হবে। ঈশ্বরের যে কোনও রূপের ধ্যান চিন্তা করবে। তাঁকেই ফল সমর্পণ করবে, তাঁর নিকটই প্রার্থনা করবে। আর এক রকম আছে একটা ভাব, thought ধ্যান করা। এই একটি ভাব—পরমহংসদেব নিজের মাথার চুল দিয়ে হাড়ীর বাড়ী সাফ করেছেন। ধ্যান করলে এর অন্তর্নিহিত ভাবটি মূর্তিমান হয়ে দেখা দেবে। শুধু মূর্তিধ্যানের চাইতেও ভাবধ্যান বড়। অবশ্য সকলের ভাবধ্যান হয় না প্রথম প্রথম। যে কোনও ভাবধ্যান করলেই ফল উত্তম হবে। এই আর একটি ভাব—ঠাকুর বলেছেন—মা দিন যায়, দেখা দিলে না। এ কথাটি ভাব দেখি, কত আনন্দ পাবে তাঁর চিন্তায়। আনন্দের খনি তিনি।

লোক বিষয়ের পেছনে ছোটে; কি আনন্দ বিষয়ে? এক তিল মাত্র। ঈশ্বরের আনন্দ অনন্ত, এর শেষ নেই। এক তিল আনন্দের জন্য সব ছোটাছুটি করছে। তোমরা ব্রহ্মানন্দের সন্ধান কর। উহা আস্বাদন করতে পারবে—তোমাদের স্বরূপই যে ঐটি। নিজকে নিজে জান। এখন ভুলে আছ। তাই এ দুরবস্থা। বাড়ীতে নির্জন ছাদে, কিংবা নিজের ঘরে, কিংবা অপর কোনও নির্জন স্থানে ধ্যান কর দেখি। ছড়ান মনটাকে কুড়িয়ে একটা জিনিসের উপর স্থাপন কর দেখি। কত আনন্দ তাতে দেখতে পাবে। পাঁচ মিনিট বসলেও আনন্দ পাবে। রোজ অভ্যাস কর।

যে পথ দিয়ে ভাল লাগে সেই পথ দিয়েই যাও, অগ্রসর হও। জ্ঞান আর ভক্তি শেষে মোটামুটি দুটো পথ হয়ে দাঁড়ায়। তাই ঠাকুর বলেছিলেন, শুদ্ধা ভক্তি আর শুদ্ধ জ্ঞান এক জিনিস। এ কথা শাস্ত্রেও রয়েছে, কিন্তু তেমন প্রচার ছিল না। পরমহংসদেব নিজ জীবনে তা সাধন করে, সিদ্ধ হ'য়ে প্রচার করলেন, জ্ঞান আর ভক্তি

এক। কিন্তু শুদ্ধ হওয়া চাই। বুদ্ধ জ্ঞান নিয়ে চলেছিলেন, চৈতন্য ভক্তি নিয়ে। জ্ঞান ও ভক্তি দু'য়ের সমন্বয় রামকৃষ্ণে।

সামান্য বিষয়ের আনন্দে লোক ডুবে যায়—স্ত্রী পুত্র সংসার নিয়ে। অনন্ত আনন্দসাগরের সন্ধান তারা পায় না। ঈশ্বরকে ধরে সংসার করলে এই দুরবস্থায় পড়তে হয় না। জ্ঞানলাভ করে সংসার কর, তাতে দোষ নাই। তখন মনকে বাঁধতে পারবে।

এদেশের লোক খালি দোহাই দেয়—অমুক এই কথা বলেছে, অমুক ঐ কথা বলেছে। আমি বলি কি, তোমরা কারো দোহাই দিও না। নিজে হতে চেষ্টা কর। দু'টো ফুল চৈতন্যকে দিলে, কিংবা পরমহংস খুব বড় মহাপুরুষ বললে—শুধু এতে হচ্ছে না বাবা। নিজেরা করতে চেষ্টা কর তাঁরা যা বলে গেছেন তা। তবেই তুমি তাঁদের যথার্থ পূজারী। তাঁরা বলেছেন, আগে ঈশ্বর পরে জগৎ। এটা উলটে দিয়ে, আগে জগৎ পরে ঈশ্বর—এই করে বসো না। তা হলে আর কি করে তাঁদের মানছ বলবে? তাঁদের উপদেশ মত কাজ কর তবে তো তাঁদের মান্য করা হবে। শুধু 'ফুলে' কি আছে, কিংবা 'আহা' বলায়? কাজ কর।

অন্যকে নিজের মত ভালবাসতে শেখ। নিষ্কামভাবে কাজ করলে এটি হতে পারে। নিষ্কাম কাজ করতে করতে নিজের 'আমি'টা দূর হয়ে যাবে। তখন 'বিরাট আমি'র সঙ্গে যোগ হবে। তখন বুঝতে পারবে তোমার নিজের ভেতরে যে নারায়ণ আছেন অন্যের ভেতরেও সেই নারায়ণ আছেন। আগে নিষ্কাম কাজ কর, তাঁকে ভালবাস, শেষে দেখবে তিনিই জগৎময়। তখন কা'কে নিন্দা করবে, কার অনিষ্ট করবে? 'আমি'টা বিশ্বগ্রাসী হবে। এ জ্ঞান হলে তখন অন্যকে ঘৃণা করতে পারবে না। একজন ডাক্তার বলেছেন, ঘৃণাতে যে বিষ উৎপন্ন হয় তাতে বিশ জন লোক মরতে পারে। ক্রোধও ক্রমে ক্রমে যাবে। সব রিপু ধীরে ধীরে শান্ত হবে। সারা দিন কাজ করে যত energy (শক্তি) না ক্ষয় হয় একবারের ক্রোধে তার ঢের বেশী নষ্ট হয়। এ সব জানা উচিত। এ সব জানলে

চেষ্টা হবে যাতে ও সব আর না হয়। তখন মনে হবে নিজে কি করে করবো? এতে আমারই ভেতর বিষ উৎপন্ন হবে, আর তাতে আমারই প্রাণ যাবে।

এই সব কারণে নিষ্কাম কর্ম নিত্য অভ্যাস করতে হয়। এতে নিন্দা ঘৃণা ক্রোধ সব কমে আসে। শেষে একেবারে নষ্ট হয়ে যায়। তখন চিত্ত শুদ্ধ হয়। শুদ্ধ চিত্তে হৃদয়বিহারী নারায়ণকে দেখা যায়। 'আমি'টা যত গোলমেলে। এটাকে প্রথম থেকেই তাঁর সঙ্গে যোগ করে দাও। তবে বেঁচে যাবে। অনন্ত আনন্দের খনিকে আপনার করতে পারবে।

শ্রীম (জগবন্ধুর প্রতি)—একেই স্বামীজী বলেছেন Practical Vedanta (ব্যবহারিক বেদান্ত)—সকালে আপনার হাতে যে বইখানা (কর্মযোগ) ছিল। (ভক্তদের প্রতি) আপনারা ভাগবত পাঠ শুনুন, আমরা আহার করে আসছি।

শুকলাল ভাগবত পাঠ করিতেছেন—দশম স্কন্ধ, একচত্বারিংশ অধ্যায়। শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম মথুরায় রজক বধ করিয়াছেন। আহারান্তে শ্রীম ফিরিয়া আসিয়া কতক পাঠ শ্রবণ করিলেন।

শ্রীম—অক্রুর জলে ডুব দিলেন, সেখানে বিশ্বরূপ দর্শন করলেন। বলেছিলেন, তোমায় যখন সামনে দর্শন করছি তখন আবার আমার বাকী রইলো কি ব্রহ্মদর্শনের? অর্থাৎ, তুমিই পরম ব্রহ্ম। তাই ক্রাইস্ট বলেছিলেন, I and my father are one (পিতা পুত্র এক)। ঠাকুর বলেছেন, আমার চিন্তা করলেই হবে। তন্তুবায়ের উপর কৃপা হলো, আবার সুদামা মালাকারকেও তত্ত্বজ্ঞান দিলেন, কিন্তু রজক কর্তব্য পালন করতে গিয়ে মারা পড়লো। এতে কি তাঁর দৃষ্টির বৈষম্য আছে? না, তা নয়—তিনি সমদর্শী। এই বলে সুদামা স্তব করছেন—(পাঠকের প্রতি) পড়ুন তো আবার ওটা।

পাঠক পড়িতেছেন: সুদামা বলিলেন—এ জগতের চরম কারণ আপনারা। এ পৃথিবীতে আপনাদের অংশাবতার কেবল জগতের মঙ্গলের জন্যই হয়ে থাকে। প্রভো, যদিও ভজনকারী ব্যক্তিকে

আপনারা ভজনা করেন, তথাপি আপনাদের অসমান দৃষ্টি নাই। কেন না, আপনারা জগতের আত্মা, সকলের অনন্তকালের বন্ধু, পরম মঙ্গলময় ও সমদর্শী। আপনাদের দৃষ্টি সর্বভূতে সমান।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—ভগবানের দৃষ্টি সমান, শত্রু-মিত্র ভেদ নাই এতে। সূর্য সর্বত্রই আছেন কিন্তু কিরণ পেতে হলে ঘরের বাইরে যেতে হয়। তেমনি ঈশ্বরের কৃপা সকলের উপর সমান। এটা উপলব্ধি করতে হলে একটু চেষ্টার প্রয়োজন। সেই চেষ্টা যারা করে তাদেরই ভক্ত বলে, সাধক বলে। তাঁর কৃপা লাভ হলে তখন শান্তি-লাভ হয়, তাতেই সুখ, তাতেই অনাবিল আনন্দ, সর্বশেষে অমৃতত্ব লাভ হয়। রজককে মারার অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল কি ? তা নয়। যে ভাব নিয়ে সুদামাকে কৃপা করেছেন সেই ভাব নিয়ে রজককেও মারলেন। এতে তার মঙ্গল হবে। চণ্ডীতে দেবতারা মহামায়াকে স্তব করছেন—মা, তোমার তো শত্রু-মিত্র ভেদবুদ্ধি নেই। তবে তুমি অসুরদের মারলে কেন নিজ হস্তে ? তাদের সদ্য মুক্তি দেবার জন্য তুমি মারলে। তোমার স্পর্শে এরা মুক্ত হয়ে গেছে। যিনি সকলের আত্মা তাঁর বৈষম্য থাকবে কি করে ?

জগবন্ধু—কর্তব্যবুদ্ধিও কি বন্ধনের কারণ হয় ?

শ্রীম—হাঁ। কর্তব্য দুই রকম আছে। একটাতে বন্ধন, অপরটাতে মুক্ত হয়। যা অজ্ঞান থেকে করা যায়—যেমন ছেলে মেয়ে সংসারের জন্য যা করা, তাতে বন্ধন হয়। আর ঈশ্বরই পুত্রকন্যাদিরূপে আমার সেবা গ্রহণ করছেন—এই ভেবে কর্তব্য করলে তাতে মুক্ত হয়। একেই নিষ্কাম কর্ম বলে।

'দীর্ঘকেশ'—আচ্ছা শুকদেব গোস্বামীর কথা যে হলো, তিনি কি ব্যাসদেবের পুত্র ?

শ্রীম—তা বলেই তো মনে হয়। আর এ সব তো historical matters (ঐতিহাসিক বিষয়) নয় বিশ্বাসের কথা। ওরা (প্রতীচী) বলে আমাদের ইতিহাস নাই, তাই barbarous nation (বর্বর জাতি)। কি দরকার ওদের মত history (ইতিহাস) রেখে ?

নেপোলিয়ন গেলেন রাশিয়াতে দশ লক্ষ সৈন্য নিয়ে। নয় লক্ষ শীতে শেষ হয়ে গেল। এক লক্ষ নিয়ে ফিরে এলেন। এই তো তাদের ইতিহাস। কে কখন রাজা হল, কার কত টাকা ছিল, কে কত লোকক্ষয় করলো—এই সব জেনে লাভ কি? ভারত এ ইতিহাস রাখে না। ভারত রাখে কে আত্মদর্শন করেছিলেন, কত লোককে তা করতে সাহায্য করেছিলেন—এই সব কথা। ওরা ambitionএর (উচ্চাকাঙ্ক্ষার) দাস হয়ে করছে স্বার্থসিদ্ধির জন্য। কিন্তু এ দেশের history (ইতিহাস) তা নয়। এখানে যেই একটু অধর্ম হয়েছে অমনি তার ফলটা দেখিয়ে দিয়েছে। সমস্ত গীতায়, সমস্ত মহাভারতের gist (সার) কি? 'যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ'। পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত এদেশের ইতিহাস। এই সবের ভেতর ঈশ্বরের কথা লেখা। কি করে লোক পরমপুরুষার্থ লাভ করতে পারে, কি করে সকল দুঃখের হাত হতে নিষ্কৃতি লাভ হতে পারে, এই সব কথা লেখা আছে। যদিও বা ঐশ্বর্যের কথা কোথাও রয়েছে, তাও ঈশ্বরেরই ঐশ্বর্যের মহিমা প্রচারের জন্য—যেমন রামের রাজ্যাভিষেকের বর্ণনা, কি দ্বারকার বর্ণনা।

শ্রীম—দিলীপ ভারতের রাজচক্রবর্তী। বানপ্রস্থ অবলম্বন করে গুরুগৃহে গেলেন। গুরুসেবা করছেন নিজ হাতে। আবার আশ্রমের গরু চরাবার ভার তাঁর উপর পড়লো। একা নয়, আবার তাঁর স্ত্রী ভারতের মহারাণী, তিনিও সেবা করছেন। একদিন এক সিংহ এসে বলে, 'রাজন্, এই গো আমার ভক্ষ্য, অতএব একে আমায় প্রদান কর।' মহারাজ দিলীপ তাকে নানা ধর্মোপদেশ দিলেন। কে শোনে তাঁর কথা। অস্ত্রশস্ত্রও ছিল, কিন্তু তাকে মারলেন না। কারণ অহিংসা ব্রত নিয়েছেন কিনা বানপ্রস্থে—অহিংসা, সত্য ও ব্রহ্মচর্য এই তিনটি প্রধান পালনীয়। সিংহ কিছুতেই মানছে না দেখে শেষে বলছেন, 'পশুরাজ, গো তোমার ভক্ষ্য সন্দেহ নেই। কিন্তু এখন আমার careএ (আশ্রয়ে) রয়েছে। আশ্রিতকে ত্যাগ করা আমার অধর্ম। অতএব, তুমি ক্ষুধার্ত, আমার

শরীরটা খেয়ে ফেল; গরুটাকে ছেড়ে দাও? সিংহ ছিল স্বয়ং ধর্ম। স্বরূপ প্রকাশ করে অন্তর্হিত হলেন। এই history (ইতিহাস) ভারতের।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—আজকাল তেমন একটা যায় না বানপ্রস্থে। নাম শুনলেই ভয় পায়। ছেলেমেয়ে সংসারের মোহে জড়িত হয়ে পড়েছে। আগে খুব যেতো বানপ্রস্থে—শুনতে পাই। (শুকলালের প্রতি) আবার এও আছে—'যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ'। বৈরাগ্য হওয়া মাত্র চলে যাওয়া বনে।

জনৈক ভক্ত—বানপ্রস্থের সময় যদি বৈরাগ্য না হয় তা হলেও যাবে?

শ্রীম—হাঁ, তখন যেতেই হতো। এখন করে কই লোক? 'পঞ্চাশোর্ধে বনং ব্রজেৎ'—এটি সাধারণ নিয়ম। তার আবার ব্যতিক্রম আছে—'যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ'—এ অসাধারণ নিয়ম। কেউ কেউ contradiction (পরস্পর-বিরুদ্ধ উপদেশ) এ কথা বলে থাকে। কিন্তু তা নয়। শাস্ত্রের contradiction (বিরুদ্ধ উপদেশ) যাকে বলা হয়, তাও বাদ দেবার যো নাই। কারণ মানুষ বলে নি এ কথা। সব ভগবানের নির্দেশ। অর্থ না বুঝতে পেরে বলে ঐ কথা। স্থান কাল পাত্র ভেদে বিভিন্ন ব্যবস্থা।

এক স্যাকরা ছিল। ভাল লোক। তাই বহু লোক সোনা রূপো দিয়েছে তাকে অলঙ্কার গড়াতে। সে একটা পাত পিটছে। যে আসে তাকেই বলে, এই আপনারটাই হচ্ছে। একটা পাত থেকে বিভিন্ন গড়ন হবে। তেমনি এক ঈশ্বর থেকেই এই জগতের বিচিত্রতা। ভিন্ন ভিন্ন স্থান কাল পাত্র, তার ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম। বাদ দেবার যো নেই কিছু। পঞ্চাশ পার হলে বনে যাবে এ ব্যবস্থাও সত্য, আবার যখনই বৈরাগ্য হবে তখনই বনে যাবে, এও সত্য।

এই সাধারণ নিয়ম ছিল। প্রথমে গুরুকুলে বাস করে, গুরুসেবা দ্বারা বিদ্যা অর্জন ও চরিত্র সংগঠন করবে। একেই student life বা ব্রহ্মচর্য আশ্রম বলে। এখানে কঠোর discipline(নিয়মানুবর্তিতা)

শিক্ষা পায়। তারপর এই জীবন্ত শিক্ষা নিয়ে গৃহস্থ আশ্রমে প্রবেশ করবে। এখানে ধর্মপালন, অর্থলাভ ও কামভোগাদি করবে। পূর্বের আশ্রমের কঠোর শিক্ষার ফলে এখানে পদস্খলনের ভয় থাকা সত্ত্বেও, পঁচিশ বৎসর এ আশ্রমের সেবা করে তৃতীয় আশ্রম বানপ্রস্থ গ্রহণ করবে। এ একরূপ retirement-এর (অবসর গ্রহণের) মত আজকালকার। দীর্ঘকাল সংসারে কাজলের ঘরে থাকার জন্য মনে যে সব দাগ লেগেছে, সে সব ছাড়াতে চেষ্টা করে এই আশ্রমে। তারপর মন মলমুক্ত হলেই সন্ন্যাস গ্রহণ করবে। তখন সর্বদা ঈশ্বরচিন্তায় মগ্ন। এই হলো সাধারণ নিয়ম। কিন্তু কারো কারো পূর্বজন্মের সংস্কার সাহায্য করে। তাকে সবটা circle (চক্র) ঘুরতে হয় না এ জন্মে। তার জন্যই ব্যতিক্রম। তখনই ঈশ্বরচিন্তা করবার প্রবল বাসনা জাগ্রত হবে তখনই গৃহস্থ-আশ্রম অর্থাৎ কর্মকাণ্ড ত্যাগ করবে। এক নিয়মে কি সকলের চলে ? যার যেমন সংস্কার, তাকে তেমনি করতে হবে।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—ঠাকুর বলতেন, 'মা, জানতেও চাই না শাস্ত্রে কি আছে, তোমার পাদপদ্মে শুদ্ধাভক্তি দাও। আর তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ না হই।' ঈশ্বরের দুটি ডিপার্টমেণ্ট আছে। বিদ্যা ও অবিদ্যা। বিদ্যা ঈশ্বরের দিকে নেয় আর অবিদ্যা ধ্বংসের পথে নিয়ে যায়। বেদে আছে, যে বলে তাঁকে জেনেছি বুঝেছি, সে কিছুই বুঝে নাই—'মতং যস্য ন বেদ সঃ'। (জনৈক ভক্তের প্রতি) কি মন্ত্রটি ?

ভক্ত—যস্যামতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ সঃ।
অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতাম্॥

শ্রীম—'ডেলফিক অরেকল' (দৈববাণী) বললে, এই গ্রীসদেশে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী সক্রেটিস্। সক্রেটিস্ এই কথা জানতে পেরে পাহাড়ে নির্জনে বসে ভাবছেন, কেন এই দৈববাণী হল। অনেক চিন্তার পর বললেন, ও বুঝতে পেরেছি কেন এ কথা বলেছে। আমি জানি, ঈশ্বরের কিছুই জানতে পারিনি। অপর সব পণ্ডিতরা বলে ওরা

সব জেনে ফেলেছে। এ জগৎ, ঈশ্বর—এই সব তত্ত্বের কিছুই বুঝতে পারি নি।

শ্রীম (দীর্ঘকেশের প্রতি)—দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্রকে অশ্বত্থামা মেরে ফেলেছে। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন, এই আততায়ীর শিরশ্ছেদ বিধেয়। আবার দ্রৌপদী যখন গুরুপুত্র বধে বাধা দিলেন তখন শ্রীকৃষ্ণ বললেন, হাঁ গুরুপুত্র অবধ্য। প্রথমে অর্জুনের ভাবে কথা কইলেন। অর্জুন ক্ষত্রিয় রাজা। দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন রাজার ধর্ম। শেষে কইলেন দ্রৌপদীর ভাবে। আহা, দ্রৌপদীর কি উচ্চভাব! অত শোক, পাঁচ পুত্র নাশ হয়েছে তবুও ধর্মটি ছাড়েন নি। বললেন, আমার যা হয়েছে হোক গুরুপত্নীর মনে পুত্রশোক দিয়ে কাজ নেই। গুরুপুত্র অবধ্য। ভক্ত কিনা, তাই অত শোকে নিজের ধর্ম, নিজের কর্তব্য ভোলেন নি। এ-ই ভারতের ইতিহাস।

কিয়ৎক্ষণ পূর্বে দুর্গাপদ মিত্র আসিয়াছেন। ইনি 'হিলিংবামে'র ম্যানেজার। মঠে তাঁহার নাম তাই 'হিলিংবাম'। তিনি একজন প্রবীণ মেধাবী ভক্ত।

দুর্গাপদ (শ্রীমর প্রতি)—আমি বুধবার পুরী যাব মনে করেছি।

শ্রীম—বেশ, বেশ। আমাদের জন্যও একটা বাসা দেখবেন।

দুর্গাপদ (আক্ষেপে)—হয়তো আর পাঁচ ছ' বছর বাঁচবো। কিন্তু কিছুই হলো না। না পারলুম তাঁকে সন্তুষ্ট করতে, না আপনাদের। আপনারা যে message (উপদেশ) দিচ্ছেন সে জন্য তো ঋণী আমরা। পারলুম না, জীবনটা বৃথা গেল।

শ্রীম—তিনি সকলের জন্য ভাবছেন। আমরা তাঁর হাতে, না তিনি আমাদের হাতে? আমরাই তাঁর হাতে পড়েছি। তিনি ইচ্ছা করলে সব করতে পারেন। বিড়ালছানার মতও রাখতে পারেন, জ্ঞানভক্তি দিতে পারেন। আমাদের ভাববার দরকার নেই। একদিন রাত্রি দশটার সময় বলছেন, মা কেন ভাবাও। তুমি ইচ্ছাময়ী, তুমি যা ইচ্ছে করবে তাই তো হবে, তবে মিছে কেন ভাবাও। তাঁর যা ইচ্ছা তাই হবে।

দুর্গাপদ—এই স্ত্রী-পুত্র-পরিবার নিয়ে ভাবতে ভাবতে দিন কেটে যাচ্ছে।

শ্রীম—এদের ভিতর ঈশ্বর রয়েছেন—এই ভেবে তাদের সেবা করলে এতে তাঁরই পূজা হয়। বেশ তো, পুরীতে যান। জগন্নাথ, সমুদ্র, চৈতন্যদেবের সব স্থান, এই সব উদ্দীপনের জিনিস সব রয়েছে। তাঁর ইচ্ছায় আমাদেরও কয়েকবার হয়েছে।

ডাক্তার কাত্তিক (শ্রীমর প্রতি)—আপনার ক'বার হয়েছে পুরী?

শ্রীম—এই পাঁচ ছ' বার হয়েছে। কখনও পাণ্ডাদের বাড়ীতে কখনও শশি-নিকেতনে এইরূপে কয়েক স্থানে ছিলাম। একবার গিয়ে উঠেছি অন্যত্র। মন্দিরে দেখা হল প্রেমানন্দ, বলরামবাবু তাঁদের সঙ্গে। এঁরা ধরে নিয়ে এলেন শশি-নিকেতনে। তাঁদের বাড়ীতেই সেবারে থাকা হল। ঠাকুরের কথার manuscript (পাণ্ডুলিপি) সঙ্গে ছিল। তাঁদের পড়ে শোনাতাম। পরদার আড়ালে বসে মেয়েরা শুনতেন। আর একবার রাখালমহারাজ ও প্রেমানন্দ ছিলেন।

ভক্তরা সকলে প্রসাদী আঙ্গুর খাইতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—জাপানের detailed accounts (বিস্তৃত বিবরণ) পেলে kindly (দয়া করে) নিয়ে আসবেন। এই যে জাপান ধ্বংস হল, এটা ঈশ্বরের warning (সতর্কবাণী) ঈশ্বর warn করেন দুই এক বার, বার বার করেন না। অধর সেনকে ঠাকুর বারণ করেছিলেন ঘোড়ায় চড়তে। বলেছিলেন, পালকী তো বেশ! অধরবাবু শুনলেন না। দ্বিতীয়বার ঘোড়া থেকে পড়েই শরীর যায়। তখন ঠাকুর বলেছিলেন, মা বার বার বলেন না, দুই এক বার সাবধান করেন। বাংলায় যে flood (বন্যা) হচ্ছে বার বার লোকেদের সরে যাওয়া উচিত flood area (বন্যার স্থান) থেকে। তাঁর warning (সতর্কবাণী) না শুনলে কষ্ট পাবে. নাশ হবে নিশ্চয়।

২

মর্টনের দ্বিতল। একটি ভক্ত আসিয়া দেখিলেন শ্রীম পশ্চিম দিকে হল ঘরে বসিয়া ধ্যান করিতেছেন পূর্বাস্য। পাশে সুধীর ও যোগেন। এখন সন্ধ্যা সওয়া সাতটা। ক্ষণকাল ধ্যানের পর শ্রীম গান গাহিতেছেন। আজ বিশ্বকর্মা পূজা।

গান। তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা।
এ সমুদ্রে আর কভু হব নাক পথহারা॥
যথা আমি যাই নাকো, তুমি প্রকাশিত থাক,
আকুল নয়নজলে ঢাল গো কিরণ ধারা॥
তব মুখ সদা মনে, জাগিতেছে সঙ্গোপনে,
তিলেক অন্তর হলে না হেরি কুলকিনারা॥
কখনও বিপথে যদি, ভ্রমিতে চায় এ হৃদি,
অমনি ও মুখ হেরি সরমে সে হয় সারা॥

গান। আছি মা তারিণী ঋণী তব পায়।

গান। হরি জগৎ জীবন জগবন্ধু।
শুনেছি পুরাণে কয় পুনর্জন্ম নাহি হয় হেরিলে তব মুখইন্দু॥

গান। শ্রীহরি কাণ্ডারী যেমন আর কি তেমন আছে নেয়ে।
পার করেন দীনজনে অধমতারণ চরণ দিয়ে॥
তরণীর এমনি গুণ নাইকো হাল তার নাইকো গুণ;
চলে সে আপনি তরী অধমতারণ চরণ পেয়ে॥

বড় জিতেন গৃহে প্রবেশ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে অমৃত, চাটার্জী ও শুকলাল আসিলেন। তারপর ডাক্তার, বিনয় আর ছোট নলিনী আসিলেন। শ্রীম আবার গাহিতেছেন।

গান। গৌর প্রেমের ঢেউ লেগেছে গায়।
তার হুঙ্কারে পাষণ্ডদলন এ ব্রহ্মাণ্ড তলিয়ে যায়॥
মনে করি কূলে দাঁড়িয়ে রই, গৌরচাঁদের প্রেম-কুমীরে গিলেছে গো সই।
এমন ব্যথার ব্যথী কে আর আছে হাত ধরে টেনে তুলায়॥

শ্রীমর শরীর আজ তেমন ভাল নাই—পিঠে ব্যথা। কথা কহিতে কষ্ট হয়। তাই তাঁহার ইচ্ছায় ভাগবত পাঠ হইতেছে। সত্ব রজঃ তমঃ গুণের কথা শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিতেছেন।

শ্রীকৃষ্ণ—হে পুরুষবর উদ্ধব, সত্বগুণের বৃত্তি এইগুলি—শম, দম, তিতিক্ষা, বিবেক, স্বধর্ম-নিষ্ঠা, সত্য, দয়া, পূর্বাপর স্মৃতি, যথালব্ধ বস্তুতে সন্তোষ, দান, বৈরাগ্য, আস্তিক্য, অনুচিত কার্যে লজ্জা, সারল্য, বিনয় ও আত্মরতি প্রভৃতি।

রজঃগুণের বৃত্তি এইগুলি—ইচ্ছা, চেষ্টা, দর্প, লব্ধবস্তুতে অসন্তোষ, গর্ব, ধনাদি কামনায় দেবতার নিকট প্রার্থনা, ভেদবুদ্ধি, বিষয়-ভোগ, মত্ততাপ্রযুক্ত যুদ্ধাভিনিবেশ ও স্তুতিপ্রিয়তা, উপহাস, প্রভাব বিস্তার ও বধচেষ্টা প্রভৃতি।

তমঃগুণের কার্য এইগুলি—অসহিষ্ণুতা, ব্যয়বিমুখতা, অশাস্ত্রীয় কথা, হিংসা, প্রার্থনা, ধর্মধ্বজিতা, শ্রম, কলহ, অনুশোচনা, ভ্রম, দুঃখ দৈন্য, তন্দ্রা, আশা ভয় ও উদ্যমহীনতা প্রভৃতি।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—বেশ সব কথা। যেন গীতার তিন গুণের commentary (ব্যাখ্যা)। যারা ভগবানকে চায়, তাদের এ সব মুখস্থ রাখা উচিত। তখন নিজের সঙ্গে মিলান যায় আমি কোথায় রয়েছি—where do I stand। লম্বা লম্বা কথা কেবল মুখে বললে কি হবে, হাতে আনতে হবে। এ সবের সঙ্গে মিলিয়ে নিলে দেখতে পাবে ভিতর ফাঁকা, অসারে পূর্ণ। যেতে হবে সকলকে ভগবানের কাছে নিশ্চয়; কিন্তু এখন কোথায় আমি রয়েছি, এটা জানা না থাকলে কি করে বোঝা যাবে কতটা বাকী। তখন চেষ্টা ও প্রার্থনা এক সঙ্গে করতে হয়। তিনি কৃপা করে তখন সহায় হন। এই তিন গুণেই মানুষ বদ্ধ হয়। তবে তমঃ থেকে রজঃ ভাল, রজঃ থেকে সত্ব ভাল। ভগবান বলছেন, ভক্তিযোগ অবলম্বন করলে, মৎপরায়ণ হলে, এই গুণত্রয়কে জয় করা যায়—ত্রিগুণাতীত হওয়া যায়। উহাই মুক্তি।

বড় জিতেন—পিঠে ব্যথাটা কেন হচ্ছে?

শ্রীম (সহাস্তে)—এ আর কি ব্যথা, old man (বৃদ্ধ) কেবা বার্ধক্যে কত বিঘ্ন। কিন্তু তার বাড়া ব্যথাও সামনে আছে।

শুকলাল এই ব্যথার জন্য এক শিশি 'অয়েল গলথেরিয়া' আনিয়াছেন। কিছুক্ষণ ডাক্তার ইহার উপকারিতা সম্বন্ধে কথা কহিলেন। শ্রীম পুনরায় কথা কহিতেছেন—এবার আত্মচরিত।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—একবার একটা miracle (অলৌকিক ব্যাপার) হয়েছিল। কি আশ্চর্য! সাদা বাড়ীতে ঘর ঝাড়ু দিচ্ছি। একটা বিচ্ছুতে কামড়িয়ে দিলে। কি যন্ত্রণা! চোখ জলে জলময়। কতজনে কত কি এনে দিলে। তামাকপাতা-বাঁধাবাঁধি সব করলে। কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। হঠাৎ ঠাকুরের রোগক্লিষ্ট মূর্তিটির কথা মনে এলো। আমি ইচ্ছা করে আনি নি, ভেতর থেকে আপনি এলো। কি আশ্চর্য, মুহূর্তের মধ্যে এই প্রাণঘাতী যন্ত্রণা কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল! কি অদ্ভুত miracle (দৈব ঘটনা)!

ক্যানসার হয়েছে। মাকে বলছেন—মা, বড় লাগছে সারিয়ে দাও। একটু পরই আবার বলছেন, তা আমি বলবো বই কি? মা যে আমায় বালকের অবস্থায় রেখেছেন। যার মা আছে সে কি করে? সব কথা মাকে বলে। মা সব করেন ছেলের জন্য। আমার মা আছেন আর আমি আছি। আমায় তো এখন জ্ঞানীর অবস্থায় রাখেন নি যে অমনি (চুপ) করে থাকবো। মাকে সব বলতে হয়। মার ইচ্ছায়ই সব হয়।

সুখ দুঃখের পারে গেলে কি অবস্থা হয় তাও তাঁ'তেই দেখেছি। অহর্নিশ হচ্ছে সে অবস্থা। এই মাত্র যা পড়া হলো ভাগবতে, ত্রিগুণাতীত অবস্থা। 'যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে।' যন্ত্রণায় কাঁদছেন আবার সব স্থির—মুখমণ্ডল যেন প্রস্ফুটিত কমল। মহেন্দ্র সরকার অত বিচার করতেন, কিন্তু ঠাকুরের এ অবস্থা দেখে নির্বাক হয়ে যেতেন। তাঁর ডাক্তারী সায়েন্সে যে নেই এ অবস্থার কথা!

লোকে যাকে সুখ বলে তা worldly (জাগতিক) সুখ, বিষয়সুখ। এ আসে যায়। জ্ঞানীগণ একে সুখ বলে থাকেন। এই সুখ দুঃখের

ধারে আর এক সুখ আছে। এ বদলায় না, সর্বদাই সুখ, একটানা সুখ। সেটি ভগবানের কাছে আছে—তার নাম ব্রহ্মানন্দ। এইটিই মানুষের চরম লক্ষ্য।

এক দিন মার সঙ্গে কথা কইছেন ঠাকুর। বলছেন—মা, তুই ইচ্ছাময়ী, তোর ইচ্ছাই তো পূর্ণ হবে। এত করে বললুম তোর ভুবন-মোহিনী রূপ একবারটি ওকে দেখা। সে রূপ দেখলে শোক দুঃখ সব দূর হয়ে যায়। সংসার খসে যায়। তা তুই তো দিবি না।

তাঁকে দেখলে সব ভুল হয়ে যায়। মুহূর্তের বিরহ সহ্য হয় না তখন। আহা, ঠাকুর কি কান্না কেঁদেছিলেন—যাকে বলে এক ঘটি কান্না। পঞ্চবটিতে যত সব রাস্তার লোক জমে যেতো। আর প্রবোধ দিয়ে বলতো, তোমার হবে, তোমার হবে। চৈতন্যদেবও সর্বদা কাঁদতেন। সংসার ভুল হয়ে গিছলো। একবার জগন্নাথের মন্দিরের দেয়ালের কাছে পড়ে রইলেন—বাহ্যজ্ঞান নেই। মহাভাবে সব ভুল হয়ে গেছে। ভক্তরা খুঁজে খুঁজে আর পাচ্ছে না। আর একবার সমুদ্রে ভাসছিলেন। জেলেরা তুলে নিয়ে এলো। মাটি, জল কোনও জ্ঞান নাই। আবার কোথায় গেলেন কেউ জানে না। কেউ বলে, টোটা গোপীনাথে মিশে গেছেন। কেউ বলে জগন্নাথে। Third theory (তৃতীয় মত) বলে, সমুদ্রে।*

ভক্তদের জন্য কত plead (প্রার্থনা) করতেন মার কাছে। দুপুর রাত। ঘুম থেকে উঠে পড়েছেন। মাকে বলছেন, 'ওকে ডুবিও না মা।' একটি ভক্তকে শ্বশুরবাড়ী পাঠিয়ে দিয়েছেন। পাছে স্ত্রীসঙ্গ হয় তাই কল টিপছেন।

আর একটি ভক্তের জন্য বলছেন, 'এ বড় সরল। চুপ করে বসে থাকে—এত করে বলছি তোমায়, একে টেনে নাও মা'।

শ্রীম (বড় জিতেনের প্রতি)—ঠাকুর বলতেন, অসুখ হওয়ায় একটা খুব ভাল হল।—কে আপন, অন্তরঙ্গ, কে পর, তার বাছাই

* দীনেশ সেন 'বৃহৎবঙ্গে' বলেন, বিষাক্ত জ্বরে গুণ্ডিচা মন্দিরে রথের সময় শরীর যায়। ওখানেই সমাহিত হন।

হয়ে যাবে এতে। অন্তরঙ্গ যারা, তারা ছাড়তে পারবে না। বাড়ীর লোকের, আপন লোকের অসুখ হলে কি ছাড়তে পারে? অন্য লোক সরে পড়ে। আর বলে, ইনি নিজেকেই রক্ষা করতে পারছেন না, তা আমাদের কি করে রক্ষা করবেন? আর একটি ভাল হল এই,—ঠাকুর বলতেন, 'এখানকে হাসপাতাল ডিসপেন্সারী হওয়ার হাত থেকে বাঁচিয়েছেন। সিদ্ধাই-ফিদ্ধাই রাখলে লোক আসতো রোগ সারাতে, কি মোকদ্দমা জিততে। অনেকেই এই সব নিম্নভাব নিয়ে আসে কিনা সাধুর কাছে।

তাঁর অসুখের সময় সকল ভক্ত সব সময় সেবা করতে পারে নি, বাড়ীতে অনেক কাজ। মাকে তাই বলছেন, মা, কি করে ওরা আসে? ওদের কত কাজ—সংসার দেখতে হয়। সময় কই মা তাদের? পাছে ওদের অপরাধ মা ধরেন, তাই মার কাছে নিজেই প্রার্থনা করছেন।

টাকাপয়সা বেশী চাইলে যদি না আসে ভক্তরা, তাই বলতেন, এখানে পেলা নেই। বলতেন, আহা, ওদের অত প্রিয়, তা ওদেরই থাক। ভক্তদের দুই এক পয়সার এলাচ, এমনতর কিছু আনতে বলতেন। যাদের পয়সা নেই তাদের আবার যাতায়াতের গাড়ীভাড়া দিতে বলতেন, যাদের পয়সা আছে এমনতর ভক্তদের—বলরাম-বাবুটাবুদের। বলতেন, হাঁ তুমি এর গাড়ীভাড়াটা দিও। ভক্ত না হলে থাকতে পারেন না, তাই তাদের জন্য ব্যাকুল হতেন। কিন্তু কোনও জোর নেই ওখানে। কখনও হেসে হেসে বলতেন, একখানে যাত্রা হয়েছিল। তাতে পেলা নেই, সব ফুরণ। তাই লোকে লোকারণ্য।

একবার পঞ্চবটীতে একটি হঠযোগী সাধু এসেছিল—আফিং খায়। রোজ তার দেড় সের, না, কত দুধ লাগে। রাখালকে বলেছিল, আফিং ও দুধের টাকা জোগাড় করে দিতে। রাখাল বলেছিল, ভক্তরা এলে বলবে। ঠাকুরের ঘরে সব ভক্ত এসে বসেছেন। হঠযোগী এলো খড়ম পায়ে চটর চটর করে। রাখালকে ঐ কথা জিজ্ঞাসা করতেই ঠাকুর রাখালের হয়ে ভক্তদের বললেন,

তোমরা কিছু দেবে? তা তোমরা বুঝি দাও না? কই, কেউ যে কিছু বলে না? ভক্তদের উপর press (পীড়ন) না হয়। তাই কি সুন্দরভাবে কথাটি বললেন।

আর. মিত্র আমাদের পাড়ার লোক, প্রয়াগে কুম্ভমেলায় গিছলেন? এসে ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করতে গেছেন। ঠাকুর জিজ্ঞেস করলেন, কেমন দেখলে সব? উনি বললেন, বেশ। কিন্তু সাধুরা অনেক পয়সা নেয়। ঠাকুর বললেন, পয়সা নেয়—তুমি এটি শুধু দেখলে? তাদের ভাল কিছু দেখতে পেলে না? পয়সা না হলে খায় কি ওরা?

বাহিরে তীর্থ-ভ্রমণে গেলে কোথায় কি সুবিধা-অসুবিধা এই সব কথা হইতেছে।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—তীর্থে থাকলে বেশ। আগুন সর্বদা জ্বলছে সেখানে। পোহালেই হলো। অন্যখানে আগুন করে নিতে হয়। বৈদ্যনাথ, পুরী—কাছের মধ্যে এ সব স্থান ভাল। পুরীতে এর ওপরও একটা মস্ত সুবিধা আছে। সেখানে রাঁধতে হয় না। কিনে খাও। প্রসাদ কিনতে পাওয়া যায়। রান্নাবান্না করতে গেলে সব সময় এতেই চলে যায়। ঈশ্বরচিন্তার সময় কম হয়ে যায়। পুরীতে সখীচরণ দু'বার ডেকেছেন। উনি জগন্নাথের ম্যানেজার। উনি ডেকেছেন তার মানেই জগন্নাথই ডেকেছেন।

মণি ও যোগেন এঁরা সম্মুখে ঝুঁকিয়া বিষণ্ণভাবে বসিয়া আছেন। উহা দেখিয়া শ্রীম কথা বলিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—ঠাকুরের তখন খুব অসুখ। একটি ভক্ত বিষণ্ণ হয়ে বসে আছেন তাঁর সামনে। ঠাকুরের শরীর শুকিয়ে ধনুর মত হয়ে গেছে বেঁকে। হাড় কয়খানা রয়েছে মাত্র। এই অবস্থায়ও বিষণ্ণ ভক্তটিকে উত্তেজিতভাবে বললেন, 'একি! কোমরে জোর কর! এমন হলে চলবে কেন? বিষণ্ণভাব পরিত্যাগ কর'।

শ্রীম (মণি ও যোগেনের প্রতি)—এরূপ হলে চলবে না। সংসার যুদ্ধক্ষেত্র—অনবরত যুদ্ধ চলছে। খাপখোলা তরোয়াল হয়ে

থাকতে হয়। সর্বদা সজাগ থাকতে হয়। কখন কি বিপদ হয়। সশস্ত্র সৈনিক যেমন থাকে। "ক্যাম্পপেনবেল" অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ছিল, তবুও ডুবে গেল হঠাৎ একটা গোলা লেগে। সংসারে কত ছিটে গুলি চলছে। চার দিকেই বিপদ। তার জন্যই সর্বদা তরোয়াল খোলা রাখতে হয় এই ভেবে, কখন বিপদ আসে। মহাযুদ্ধ-ক্ষেত্রে অলস অমনোযোগী হলেই বিনাশ। ক্রাইস্ট তাই ভক্তদের বলেছিলেন, তোমরা আমোদ কর আর আমায় অনুসরণ কর। আমি সংসার জয় করেছি। আমায় ধরলে তোমরা অনায়াসে জয় করতে পারবে—'but be of good cheers ; for I have overcome the world !' তাই ভক্তরা সর্বদা আনন্দে থাকবে, ভগবানকে ধরে। অবসাদগ্রস্ত হলে এ দিক সে দিক ছু' দিকই যাবে। 'আত্মানম্ নাবসাদয়েৎ'।

শ্রীম উপরে গেলেন খাইতে। ভক্তরা অনেকেই চলিয়া গিয়াছেন। ডাক্তার, বিনয়, ছোটনলিনী ও জগবন্ধু বসিয়া আছেন শ্রীমর অপেক্ষায়। রাত্রি ১০টা ১৫ মিনিট।

কলিকাতা, ১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯২৩ খ্রীঃ, ৩০শে ভাদ্র ১৩৩০ সাল, সোমবার।

সপ্তম অধ্যায়

'স্বামীজী'কে বুঝবার সময় হয় নাই এখনও

১

মর্টন স্কুলের দ্বিতলের পশ্চিমের ঘরে শ্রীম বসিয়া আছেন। তিনদিকে শুকলাল, শচী, সুধীর, যোগেন প্রভৃতি ভক্তগণও বসিয়া আছেন। আজ ১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯২৩ খ্রীঃ, ১লা আশ্বিন, ১৩৩০ সাল। এখন সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা। একটি ভক্ত প্রবেশ করিয়া দেখিলেন শ্রীম গুনগুন করিয়া রামপ্রসাদের গান গাহিতেছেন। 'আমি ঐ খেদে খেদ করি। তুমি মাতা থাকতে আমার জাগা ঘরে চুরি।' একটু পর ভক্তদের সহিত কথা বলিতেছেন।

শ্রীম (দৃষ্টি অতীতে নিবদ্ধ করিয়া)—ঠাকুরের হাত পা বাঁধা। যন্ত্রণায় খুব কাঁদছেন আর এই গানটি গাইছেন, 'তুমি মাতা থাকতে আমার জাগা ঘরে চুরি।' তারের বেড়া ছিল, ঝাউতলায় যাচ্ছিলেন। ভাবে ছিলেন—wireএ (তারে) লেগে পড়ে যান আর হাত ভেঙ্গে যায়। এত যন্ত্রণা যে কাঁদছেন। কিন্তু কি আশ্চর্য! ভক্তরা যেই এলেন, তাঁদের দেখে একেবারে সমাধিস্থ। নেমে এসে কত হাসি-খুসি। সুখদুঃখের পার তখন। এই অবস্থায় শুধু ঐ একজনকেই দেখেছি—সুখদুঃখের পারের অবস্থা। 'যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে।' গানে আছে 'কমলাকান্তের মনে আশাপূর্ণ এতদিনে। সুখদুঃখ সমান হল আনন্দসাগর উথলে।' ঈশ্বরদর্শনের পর ঐ অবস্থা হয়।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—ভক্ত হলে, ঈশ্বরকে ডাকলে দুঃখকষ্ট হবে না, এ কথা কেউ মনে না করে। পাণ্ডবদের দেখ, ভগবান স্বয়ং এঁদের সঙ্গে। তবুও তাঁদের দুঃখের সীমা নাই। মহাভারত আমাদের পড়া উচিত। তাতেই এই মহাশিক্ষা রয়েছে—সুখদুঃখ দেহ ধারণ করলে হবেই। তবুও ভগবানকে ডাকতে হবে। ঠাকুর তাই বলতেন, 'পঞ্চভূতের ফাঁদে ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে।' এই কথাটা বুঝতে পারলে অনেকটা হয়ে গেল। একজন বলেছিল, ইয়াকুব খুব ভক্ত, কিন্তু জেলে গেছে। তা যাবে না? সুখদুঃখের অধীন এই শরীর। অবতার এইটে দেখিয়ে গেছেন। ক্রাইস্টও এই কথাই বলেছেন, In the world ye shall have tribulation'। অর্থাৎ এখানে থাকতে গেলে সুখদুঃখ থাকবেই। কেন দেখিয়েছেন এ সব অবতারগণ? ভক্তদের ভরসার জন্য। তবে ভক্তরা সুখদুঃখকে বরণ করে নেবে, আর এর ভিতর থেকেই পরমসুখের সন্ধান করবে, যে সুখের সঙ্গে দুঃখ জড়িত নেই, সেই একটানা সুখ।

অমৃত আসিয়া প্রণাম করিলেন। ইনি রাজকর্মচারী।

ভক্তগণ শ্রীমর ইচ্ছায় গান গাহিতেছেন—'গুরুপদ ভরসা কর।' বড় জিতেন ও বিরিঞ্চি কবিরাজ গৃহে প্রবেশ করিলেন। গান শেষ

হইলে শ্রীম পূর্বকথিত উপদেশ তাঁহাদের শুনাইতেছেন। একটু পর ডাক্তার, বিনয় ও ছোট নলিনী আসিলেন। পুনরায় আবৃত্তি করিয়া শুনাইতেছেন। বলিতেছেন, দেখুন কি আশ্চর্য লীলা! যিনি ভগবান পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ তাঁরই কিনা দুঃখ! এ খেলা মানুষ বোঝে, কি সাধ্য? তিনি বোঝালে বুঝতে পারে। এর এই শিক্ষা—শরীর ধারণ করলে এ দুঃখকষ্ট হবেই। রোগ যন্ত্রণাদি নিজ শরীরে গ্রহণ করে—সংসার দুঃখময়, শরীর ধারণ বিড়ম্বনা—এই মহাসত্যের মৌন ব্যাখ্যা চলছে। নির্বাক উপদেশ দিচ্ছেন, নৌকো ডুবছে—মাঝি, তবুও হাল ছেড়ো না।

সকলে ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিলেন। বড় জিতেনের প্রশ্নে পুনরায় কথা হইতেছে।

বড় জিতেন (শ্রীমর প্রতি)—তীর্থ একবার দর্শন হলেই তো হলো?

শ্রীম—দর্শন, তারপর তাঁর সঙ্গে কথা কইলে দর্শনটা একেবারে পাকা হয়ে যাবে। যেমন বিয়েতে কাঁচা-পাকা হয়। কথা কয়ে পাকা হলে তখন সব ঠিক।

বড় জিতেন—স্বামীজী অধিকাংশ স্থলে কর্মযোগের কথা বলেছেন। কর্ম করতে বলেছেন, কিন্তু ঠাকুরের কথা ছিল কর্মত্যাগ।

শ্রীম—ঠাকুরের ঐ কথা কি সকলে একেবারে ফস্ করে ধরতে পারে? ভিতরে কর্মপ্রবৃত্তি রয়েছে, করে কি এখন! অর্জুনের ভিতর কর্মপ্রবৃত্তি রয়েছে। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে থেকেও বদলালো না। তাই উপায় বলে দিয়েছিলেন, নিষ্কাম কর্ম দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ কর। তখন ঐ কথা ধরা যায়। কর্মত্যাগ মানেই ঈশ্বরদর্শন। শেষ কথা। তারপর স্বামীজী ও-দেশে (পাশ্চাত্ত্যে) বলেছেন। ও-দেশের লোক সব রজোগুণী। এদের কর্ম কি শীঘ্র কমে? তাই স্বামীজী গিয়ে উপায় দেখিয়ে দিয়েছেন। বলেছেন, 'নিষ্কামভাবে, সব তাঁর কর্ম জেনে কর, এতেও ঈশ্বরলাভ হয়।' তবে কিছু দেরী হয়। আবার কারো কারো এমনি সংস্কার যে ধেই ধেই করে এগিয়ে যায়। আমেরিকার একটি মেম, খুব ঐশ্বর্য তাদের, স্বামীজীর মুখে ঠাকুরের

কথা শুনে সব ছেড়ে দিলেন। তাঁর সংস্কার ছিল ভাল। কিন্তু ও-দেশে অধিকাংশ লোকই হয় রাজসিক।

স্বামীজী যেমন কর্মযোগের কথাও বলেছেন, তেমনি জ্ঞানযোগ, রাজযোগ, ভক্তিযোগের কথাও বলেছেন। যাদের ঐ সব সংস্কার আছে, তারা কি কর্মযোগ নেবে? সংস্কার অনুযায়ী ঐ সব যোগ নেবে। তিনি সবই তো বলেছেন। এখন যার যেমন সংস্কার নাও।

আলমবাজার মঠ থেকে সন্ন্যাস নিয়ে দু'জন বের হলো। হাঁটতে হাঁটতে পাটনার দিকে গিয়ে পৌঁছাল। এক বনের ভিতর দিয়ে যাচ্ছে। একজন বলে উঠলো, 'বাপ রে বন দেখে আমার ভয় হচ্ছে। ঘরে যে আমার বাপ-মা রয়েছে।' অপর ব্যক্তি তিরস্কার করায় তার সঙ্গে চলতে লাগলো। যেতে যেতে আর চলতে পারছে না। এক জায়গায় বসে পড়লো। সঙ্গী তখন বললে, 'শালা, সন্ন্যাস নিয়েছিস আবার! থাক্ পড়ে আমি চল্লুম'। সঙ্গী চলে গেল। খানিক পর এক এক্কাওয়ালার সঙ্গে দেখা হয়। সাধু বলে সে তুলে নিয়ে যায়। সঙ্গীর সঙ্গে মিলিত হয়ে দু'জনে শেষে কাশী যায়। কাশী থেকে ঐ ব্যক্তি বাড়ীতে চিঠি দিলে, 'আমায় কিছু টাকা পাঠাও, আমি বাড়ী ফিরে আসছি।' টাকা পেয়ে গেরুয়া ছেড়ে পরের গাড়ীতে বাড়ী ফিরল। তারপর বিয়ে হলো, কয়েকটি ছেলেমেয়ে হলো। চাকরী করত। একটু বৈরাগ্য ছিল তাই মাঝে মাঝে তীর্থে চলে যেতো। কর্ম গেলে বড় কষ্ট পেতো। বাপ ভাইদের সঙ্গেও মিলতো না, বাক্যবাণ ছিল। সকলেই অসন্তুষ্ট। সর্বশেষে consumption (ক্ষয় রোগ) হয়ে কষ্ট পেয়ে দেহত্যাগ হয়।

এই তো মানুষের অবস্থা। জোর করে কিছুই হয় না। 'প্রকৃতিস্ত্বাং নিয়োক্ষ্যতি।' এখন যাদের ভিতর রজঃপ্রকৃতি রয়েছে তারা দাঁড়ায় কোথায়? রজঃ না গেলে 'বিরজা' হয় কি করে? তাই স্বামীজী ঐ পথ বলে দিয়েছেন। নিষ্কামকর্ম কর, চিত্ত শুদ্ধ হবে, তখন 'বিরজা', মানে সর্বত্যাগ হবে।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—দেশের কি না দুরবস্থা হয়েছিল।

ইংরেজরা আসাতে তাদের সব অনুকরণ করতে শুরু করলো। দেশটা একেবারে hypnotised (সম্মোহিত) হয়ে গিছলো। ওদের আদেশে নিজেরা সাহেব সাজতে আরম্ভ করলো, আর মেয়েদের বিবি সাজাতে লাগলো। মানুষগুলো ইংরেজদের কাছে জোড়হাত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতো। ইংরেজদের অনুকরণে কেউ কেউ আবার বলতে লাগলো, 'Away with idolatry and caste system'—মূর্তিপূজা আর জাতিভেদের মুখে আগুন, একেবারে জোর গলায়। আবার এমনি খেলা যে, যিনি ঐ কথা বলেছিলেন সেই ব্যক্তি কিছুদিন পর বলছেন, মৃন্ময় আধারে চিন্ময় মাকে পূজা কর।' পরমহংসদেবের সঙ্গে সাক্ষাতের পর ঐরূপ মতের পরিবর্তন হলো। ঠাকুরের অনেক কথা কেশববাবু নিয়েছেন, শেষে সম্পূর্ণ পরিবর্তন।

বিদ্যাসাগর মশায়ের মত লোকও সেই ধাঁধায় পড়ে গিছলেন, hypnotised (সম্মোহিত) হয়ে গেলেন, কি আশ্চর্য! তিনিও চরিতাবলীতে ইউরোপীয় জীবনাবলী লিখতে লাগলেন। তাতে আছে কি, না, বহু কষ্ট করে এক একজন লেখাপড়া করলে ; শেষে বড় হলো। বন-বিড়াল মেরে তার চামড়া বেচে কষ্ট করে পড়েছিল। এই সব কাহিনী। কম lower (নীচু) হয়ে গিয়েছিলো ideal (আদর্শ)।

আগে এ দেশ থেকে লোক ওয়েস্টে যেতো ওদের কাছ থেকে ভিক্ষা মেগে আনবে বলে। স্বামীজী বললেন, 'আমি যাই ওদের শেখাতে।' কি না করেছে ওদের আদর্শ! ঘরের মেয়েদের বাইরে আনলে দরবারে। লজ্জা গেল। সকলের সামনে হারমোনিয়াম বাজাতে শেখালে। একেবারে বিবি সাজালে। ওদের মত 'কিস' (চুম্বন) করতে লাগলো। ভাতার বসে, পরিবার হারমোনিয়াম বাজাচ্ছে। বাপটাও সামনে আছে, আরো সব লোক। বাপটা আবার বলছে, 'বিমলা বেশ গায়।' ভাতার 'বিমলা বিমলা' বলে হাঁকছে (সকলের হাস্য)। মাথায় ঘোমটা নেই। স্ত্রীলোকের লজ্জা গেলে রইলো কি, ঠাকুর বলতেন।

বড় জিতেন—কেন, কি হয় এতে ?

শ্রীম—ঘোমটা রেখেই মহামায়ার খেলায় রক্ষে নাই, আবার ঘোমটা খোলা! পুরুষগুলোর যে পতন হবে। এই ঘোমটা-প্রথা কি মানুষ কমিটি করে ঠিক করেছে! ঈশ্বর ঋষিদের দিয়ে করিয়েছেন। চণ্ডীতে আছে, ব্রহ্মশক্তি লজ্জারূপে সর্বভূতে বিরাজ করছেন। 'যা দেবী সর্বভূতেষু লজ্জারূপেণ সংস্থিতা।' মা লজ্জারূপ ধারণ করেছেন স্বয়ং। এই সব উচ্চ ভাব ঐ আদর্শে শেষ হয়ে গিছলো। শেষে কেশববাবুও 'স্ক্রিন' (পরদা) দিলেন নববিধানে। এই সম্বন্ধে একটা sermon (বক্তৃতা) দিয়েছিলেন নববিধানে—'মা, লজ্জারূপিণী'। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে স্ক্রিন নেই।

স্বামীজীর পূর্বে ব্রাহ্মরা কেউ কেউ বলতেন, হিন্দুধর্মে কিছু নেই। স্বামীজীর আমেরিকা ও ইউরোপ যাওয়ার পর, ব্রাহ্মরা যাদের পূজা করতো তারাই যখন স্বামীজীর পূজা করতে লাগলো, আর তার রিপোর্ট এ দেশে আসতে লাগলো, তখন সকলে অবাক হয়ে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লো। শিবনাথ শাস্ত্রী ইতিপূর্বে ঠাকুরকে fanatic—পাগলটাগল বলতেন। এখন বুঝতে পারলেন, হিন্দুধর্মের ভিতরও কিছু আছে। আমরা নিজচক্ষে দেখেছি, স্বামীজীর পায়ের বুট ওরা পরিয়ে দিচ্ছে—স্বামীজীর সঙ্গে এসেছিল সব সাহেব মেম ও-দেশ থেকে। অত রজোগুণী ও-দেশের লোক, তবুও ঐ করেছে। করবে না, কত উপকার পেয়েছে—অমৃতত্ব দিয়েছেন যে স্বামীজী তাদের! গঙ্গায় স্নান করতে গেছেন স্বামীজী, আর সাহেবরা এমনি এমনি (হস্তচালনাদ্বারা শরীর মার্জনার অভিনয় করিয়া) গা রগড়িয়ে দিচ্ছে গামছা দিয়ে, ঠিক যেন ভৃত্য! .

বড় জিতেন—তা হলে ওরা উল্টো hypnotised (সম্মোহিত) হয়েছে?

শ্রীম—একে কি hypnotised (সম্মোহিত) বলে! অন্য শাক খেলে অম্লশূল হয়, হিঞ্চে শাক খেলে হয় না। হিঞ্চে শাক শাকের মধ্যে নয়, ঠাকুর বলতেন। সাধু, মহাপুরুষদের সেবা করলে মুক্ত হয় মানুষ, অমৃতত্ব লাভ করে। স্বামীজীকে বুঝবার সময় এখনও হয় নি।

তিনি কি করে গেছেন, ভবিষ্যতের লোক বুঝবে। স্বামীজী নিজেই বলেছেন, 'আমি যা করে গেলাম অনেক দিন লাগবে তা বুঝতে। ওদের (অনুবর্তীদের) আর কিছু করতে হবে না, খালি দাগা বুলুক।' মহাপুরুষ ছাড়া কে বলতে পারে এ কথা। উচ্চকণ্ঠে, সিংহনাদে প্রচার করলেন, সনাতন হিন্দুধর্মে সব আছে—মানুষ 'অমৃতস্য পুত্রাঃ', 'জীব শিব'। জাহাজে একজন সাহেবকে বলেছিলেন, তিনি আমেরিকার লোক ছিলেন, 'তোমরা ইণ্ডিয়াতে ধর্ম শেখাতে যেয়ো না—ধর্ম শেখাবে, তার আছে কি তোমাদের?'

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—ও-দেশ থেকে আসার পর গান হচ্ছে। নিজেই (পাখোয়াজ বাজনার অভিনয় দেখাইয়া) বাজিয়ে গান গাইছেন। কি গন্ধর্ব কণ্ঠ, মন স্থির হয়ে যায় শুনলে। শেষ হলে আমরা খুব সুখ্যাত করলাম। তখন স্বামীজী বললেন, 'আমার তো ইচ্ছাই ছিল এই। Himalayan silenceএ (হিমালয়ের নিভৃত স্থানে) গিয়ে কেবল তাঁর চিন্তা করবো। কিন্তু পারি কই? আমি বুঝতে পারছি এই কয়টা বছর কে যেন আমার ঘাড়ে ধরে (ঘাড়ে হাত দিয়া অভিনয় করিয়া) কাজ করিয়েছে। আমি আর কি করব বলুন'?

শ্রীম (বড় জিতেনের প্রতি)—কি ত্যাগ দেখুন। ইচ্ছা করলে অন্যের মত বসে বসে শুধু ঈশ্বরচিন্তা করতে পারতেন। তা না করে জীবের কল্যাণের জন্য চারতলা থেকে এক তলায় আসতে হয়েছে। একেই বলে মহাপুরুষ। এর থেকে বড় ত্যাগ আর কি আছে? কত বড় genius (প্রতিভা)।

হাজরা একবার ঠাকুরকে বলেছিলেন, 'তুমি অত কেন করতে যাও এদের জন্য? ইচ্ছা করলে তো সমাধিতে থাকতে পার।' এই কথা শুনে ঠাকুর বললেন, 'শালা বলে কি? এদের মঙ্গলের জন্য জনমে জনমে আসতে হয়, আসবো।' বলতেন, 'নিজের বাড়ীর কড়ার ডাল তো আছেই। ভক্তের নেমন্তন্ন খেতে ইচ্ছা হয়।' 'কড়ার ডাল' মানে, ঈশ্বরভাব—'ভক্তের নেমন্তন্ন' মানে ভক্ত নিয়ে লীলা। লীলার জন্য অবতার আসেন।

তিনি সকলের past, present and future (ভূত-ভবিষ্যৎ, বর্তমান) জানতেন। তাই স্বামীজীকে প্রথমে দেখেই কেঁদে ফেলেছিলেন আনন্দের উচ্ছ্বাসে। বলেছিলেন, 'তুই এত দিন কোথায় ছিলি, তোর অপেক্ষায় বসে আছি।' স্বামীজী আমাদের গল্প করেছিলেন, 'এই কথা শুনে আমি ভাবলাম লোকটা পাগল।' ঠাকুর দেখতে পেয়েছিলেন অতি বড় আধার। এলো, আবার ছাড়াছাড়ি হলো। ব্রাহ্মসমাজ, এখানে সেখানে, অনেক কাণ্ড হয়ে গেল। তারপর আবার এলো। তা হবে না, বড় মাছ যে। বলেছিলেন, 'মাছের মধ্যে নরেন্দ্র রুই, অন্য সব কাটিবাটা।' বঁড়শিতে বড় মাছ ধরলে কি করে লোক? সুতো ছাড়তে থাকে আর মাছ খেলে। খেলতে খেলতে যখন মাছ অবশ হয়ে যায়, সব শক্তি চলে যায় তখন সুতো টেনে আনে আর মাছ ডাঙ্গায় তোলে। স্বামীজীকেও এই করলেন।

যারা ইংরেজী শিক্ষা পেয়েছে ঠাকুর তাদের বলতেন, 'সংস্কার বিশ্বাস করতে হয়।' বলতেন, কারো কারো সংস্কার এমনি, একটু মদ পেটে পড়তেই নেশা। সারা রাত ধরে যে খেয়েছে আর, একজন এক বোতল খেল, কিন্তু কিছুই হলো না। এই ব্যক্তির ঐ-ই প্রথম জন্ম। ডাকতে থাকুক অনেক জন্ম ধরে। শ্রীকৃষ্ণ তাই নানা প্রকৃতির জন্য নানা পথ দেখিয়ে দিয়েছেন। এক পথে সকলের হয় কি করে?

ঈশ্বর কি এইটুকু। তিনি কি কেবল কয়টি ভক্তের জন্যই ভাবছেন? তাঁর ভাবনা সমস্ত জগতের জন্য। তাঁর অনন্ত কাণ্ড, সকলের জন্য ভাবছেন তিনি। ইউরোপ, আমেরিকায় যারা আছে তাদের জন্যও ভাবছেন। (প্রথম বিশ্ব) যুদ্ধের পর ও দেশের better minds (মনীষিগণ) ইণ্ডিয়ার দিকে তাকিয়ে আছেন। এখানে যা হয়েছে তাই ঠিক।

শ্রীম (বড় জিতেনের প্রতি)—সংস্কারের খেলা দেখুন না। (শ্রীমর অতিথি একটি বিড়াল-শিশুকে দেখাইয়া) এইটুকু বিড়াল,

মাছের জন্য কি লাফালাফিটাই না করছে! মাছ খাওয়ার instinct (সংস্কার) নিয়ে জন্মেছে যে। না করে উপায় আছে! এরই নাম প্রকৃতি। কত রকমের প্রকৃতি দিয়ে তিনি এই জীব সৃষ্টি করেছেন তার ইয়ত্তা নাই।

কিন্তু বাপ যদি ছেলের হাত ধরে তবে পড়বার ভয় থাকে না। ছেলে বাপের হাত ধরলে পড়বার আশঙ্কা পদে পদে।

বড় জিতেন—এখন বাপ ধরেন তবে তো হয়!

শ্রীম (সহাস্যে)—হাঁ। বাপ ধরেন তবে তো!

শ্রীম (স্বগত)—বুড়োদের ইচ্ছা হয় নির্জনে থাকতে। যুবকদের তা হয় না, মনে কত বাসনা। ঐ প্রকৃতির খেলা।

রাত্রি ১০টা ১৫ মিনিট।

২

শ্রীম আজ ধর্মালোচনার এক অভিনব উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। বিগত দুই দিন স্বামী অরূপানন্দ 'মায়ের কথা'র পাণ্ডুলিপি শ্রীমকে পড়িয়া শুনাইয়াছেন। আজের সভায় সেই 'মায়ের কথা'র অনুকীর্তন চলিতেছে। নিজে মায়ের কয়েকটি উপদেশ আবৃত্তি করিলেন। তৎপর ভক্তগণকে 'মায়ের কথা'র স্মৃতিকীর্তন করিতে বলিলেন। শ্রীমর এই অনুকীর্তন-প্রথা ভক্ত-সংসদে নূতন হইলেও শ্রীমর নিকট নূতন নহে। স্কুল ও কলেজে অধ্যাপনার সময়ও সর্বদা উহা প্রয়োগ করিতেন। এই অনুকীর্তন-প্রথা শ্রীমর আদর্শ শিক্ষকতার অন্যতম প্রধান কারণ। তিনি উহা স্বীয় গুরুদেব পরমহংসদেবের নিকট শিক্ষা করিয়াছিলেন। পরমহংসদেব প্রায়শঃ নিজের উপদেশসমূহ 'মাষ্টারের' দ্বারা অনু-কীর্তন করাইতেন।

আজ শনিবার ২২শে সেপ্টেম্বর ১৯৩২ খ্রীস্টাব্দ, ৫ই আশ্বিন ১৩৩০ সাল।

শ্রীম বলিতেছেন, মা বলেছেন—promise (প্রতিজ্ঞা) করেছেন,

(১) ঠাকুরের শরণাপন্ন যারা, অন্ততঃ মৃত্যুর সময় হলেও ঠাকুরকে তাদের কাছে দেখা দিতেই হবে। (২) দেহ ধারণ করলে দুঃখকষ্ট আছেই। বিধাতারও ক্ষমতা নেই এ রোধ করবার। তবে শান্তি চাইলে সাধন ভজন কর। (৩) মৃত্যু কখন আসে তার যখন নিশ্চয় নাই, তখন কালাকাল বিচার করে বসে না থেকে তীর্থ করা ভাল, যত শীঘ্র হয়। (৪) মা কর্ম ফুরুচ্ছে না কেন—এ প্রশ্নের উত্তরে মা বললেন, লাটাইয়ে অনেক সূতো আছে। সেই সব বের হলে তবে তো খালি হবে। (৫) ঠাকুর একদিনের জন্যও আমাকে কষ্ট দেন নি।

শ্রীম এই পঞ্চরত্ন উপহার দিয়া ভক্তদের আহ্বান করিলেন— আপনারা বলুন যার যা মনে আছে 'মায়ের কথা'। একের পর এক ভক্তগণ বলিতে লাগিলেন। (৬) (ঠাকুরের শরীর ত্যাগের পর) বৃন্দাবনে যাবার সময় আমাকে ঠাকুরের ইষ্ট-কবচ পূজো করতে (ঠাকুর) বলেছিলেন রেলের পাদানে দাঁড়িয়ে। (৭) ঠাকুরের ভাবনা হয়েছিল আমার জন্য। বলেছিলেন, পাড়াগাঁয়ের মেয়ে (দক্ষিণেশ্বরে) এসে কত লজ্জা না জানি দেয়। আমি মাকে (জগন্মাতাকে) প্রার্থনা করেছিলাম, তাই কিছু হয় নি। (৮) সাতবার স্বপ্ন দেখে শ্রীহট্ট থেকে একটি ভক্ত (আমাকে) দেখতে আসে। (৯) ঠাকুরের ঘরে তিনি ভক্তসঙ্গে নৃত্য কীর্তন করতেন, আমি ন'বতে বেড়ার ফাঁক দিয়ে দাঁড়িয়ে দেখতাম। (১০) দেখতে সুশ্রী এমন লোকদের সঙ্গে কখনও বাগানে বেড়াতেন ঠাকুর। পরে এসে আমাকে জিজ্ঞাসা করতেন, বল দেখি কে সুন্দর? (১১) ন'বতের ঐ ছোট্ট ঘরটিতে সব জিনিস থাকতো। ভক্ত-মেয়েরা—গৌরীদাসী, যোগেন, গোলাপ এরাও কখনও কখনও আমার সঙ্গে ঐ ঘরেই থাকতো। আবার ঐ ঘরেই টিনে মাছ জিয়ান, কলকল করছে। ঐটুকুতে থেকেও আমার কোন কষ্টবোধ ছিল না—এক পায়খানা ছাড়া। সকালে বাহ্যে পেলে রাত্রে যেতাম গঙ্গার ধারে। (১২) আমার অত কাজ, তবুও ঠাকুর শিকা পাকাতে পাট এনে

দিতেন। বলতেন, সন্দেশ রাখতে হবে, একটি শিকা পাকাও। অলস হয়ে বসে থাকলে স্ত্রীলোকের মনে কুভাব আসে। তাই এরূপ করতেন লোকশিক্ষার জন্য। (১৩) পুরীতে ঠাকুরের ছবির কাছে একটি ঘিয়ের টিন ছিল। ঘর দরজা বন্ধ করে আমরা মন্দিরে যাই। ফিরে এসে ঘর খুলে দেখি ঘিয়ের টিনে পিঁপড়ে উঠেছে। আর ঠাকুরের ছবি মেঝেতে শুয়ে আছে।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—এতে বলা হচ্ছে ছবিতেও ঠাকুর আছেন।

(১৪) ঠাকুর মাতৃভাব ভালবাসতেন খুব। লোকশিক্ষার জন্য তাই আমায় রেখেছিলেন। (১৫) অল্প বয়সের সুন্দরী বিধবাদের কোনও পুরুষকে বিশ্বাস করতে নেই, বাপ ভাইকেও না। (৬) গর্ভপাত করেছে, কি বিশ পঁচিশটা সন্তান প্রসব করেছে, এরূপ অসংযমী, বা রুগ্ন সব লোক (শ্রীচরণ) স্পর্শ করাতেই তো রোগ। নইলে এ শরীরের আবার রোগ কি? (১৭) ঠাকুরকে বলেছিলাম, একটিও ছেলে নেই কি করে আমি দিন কাটাব? তিনি প্রবোধ দিয়ে বলেছিলেন, একটি ছেলের জন্য তুমি ভাবছো? কত অমূল্যধন ছেলে আসবে এর পর। এখন তাই দেখছি। (১৮) কামারপুকুরে লাহাদের বাড়ী থেকে লক্ষ্মীপুজোর দিন মা লক্ষ্মী এসেছিলেন। ঠাকুরের মা চিনতে না পেরে বিদায় দিলেন। তখন মা লক্ষ্মী বলেছিলেন, এমনি আমার দৃষ্টি থাকবে। এইজন্য কামারপুকুরে মোটা ভাত কাপড়ের অভাব হয় না। (১৯) দিন যায় রাত আসে, রাত যায় দিন আসে, এই সন্ধিক্ষণে জপ ধ্যান করতে হয় নিয়মিতভাবে। কারণ কখন সুসময় এসে পড়ে। (২০) ঠাকুর সব খান, যা দাও সবই খান। তবে কোনটা ভাল করে খেলেন, কোনটায় দৃষ্টিভোগ। কোনটা বা মাত্র স্পর্শ করলেন। ঠাকুর খেলেন কি না খেলেন তা কি আমি দেখি না? তিনি না খেলে কি আমি খেতে পারি? তিনি খান। তাঁর চক্ষু থেকে একটি জ্যোতিঃ এসে সব রস শোষণ করে নেয়। তারপর তাঁর অমৃত হস্তের স্পর্শে সব আবার পূর্ণ হয়ে যায়।

(২১) যে স্থানে তাঁর পুজো হয়, বা কথা হয়, কিম্বা তাঁর পীঠ হয় সেখানে তাঁর দৃষ্টি থাকে। (২২) ঠাকুরের শরীর খুব মোটা ছিল আর খুব সুন্দর ছিল। পিঁড়িতে বসলে ধরতো না। (২৩) ষোড়শী-পুজো হয়েছিল গঙ্গাজলের জালার কাছে। (২৪) কামারপুকুরে মাঠে শুকনো গু মাড়িয়ে আসতাম। বাড়ী এসে 'শ্রীবিষ্ণু শ্রীবিষ্ণু' বলে শুদ্ধ হয়ে যেতাম। (২৫) মঠ আজকাল খুব তীর্থস্থান। যোগেনের অসুখে বৃন্দাবনে আমার বড় ভাবনা হয়েছিল। (২৬) কাশীপুরে ঠাকুরকে খাইয়ে দিতাম। একবার পা মচ্‌কে যাওয়ায় কয়দিন যেতে পারি নি ওপরে। হাতে নথ দেখিয়ে নরেন্দ্রকে ইঙ্গিতে বললেন, ঝুড়িতে করে নিয়ে আয় না। রসিক পুরুষ ছিলেন ঠাকুর। (২৭) কখনও কখনও ছ'মাস পর ঠাকুরের দর্শন পেয়েছি।

আজের অনুকীর্তন এইখানে শেষ হইল।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—দেখছেন, কত উপকার হয় পরস্পর তাঁর কথা বললে?

আজের বৈঠক বসিয়াছে তিন তলার পশ্চিমের ঘরে। মেঝেতে শ্রীম বসিয়াছেন মাদুরে। তিন দিকে ভক্তগণ। ছোট জিতেন, যোগেন, মণি, ছোট ললিত ও রমণী, বড় জিতেন আর বিরিঞ্চি। তারপর আসিলেন ডাক্তার, বিনয়, ছোট নলিনী ও সুধীর। এখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, প্রায় সাড়ে সাতটা। জগবন্ধু ফিরিয়াছেন বেদান্ত সোসাইটি হইতে। অনুকীর্তন শেষ হইলে গৃহে প্রবেশ করিলেন এটর্নি বীরেন বোস। তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীম কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (বীরেনের প্রতি)—পুরী থেকে আবার চিঠি এসেছে। লিখেছেন, 'Don't trouble yourself about rented house, come soon' (বাড়ী ভাড়ার কথা না ভেবে শীঘ্র চলে আসুন)। (ভক্তদের প্রতি)—রায় বাহাদুর সখীচাঁদ জগন্নাথ মন্দিরের ম্যানেজার-সেবক। তাঁর call (ডাক) মানে Lord of the Universe-এর (জগন্নাথের) call (ডাক)। আমার বিশ্বাস

করতে পারি না, জীবভাব কিনা। জৈবধর্মের লক্ষণই এই—সংশয় হয় পদে পদে, বিশ্বাস হয় না।

সখীচাঁদ ডাকছেন—(সহাস্যে) এখন জগন্নাথ নিয়ে যান তবে তো হয়! জগন্নাথের প্রসাদ আর দুধ পেলে আর কি চাই? অন্ন আর দুধ। দুধ কি কম জিনিস?

শ্রীম (বীরেনের প্রতি)—আমরা যাকে অজ্ঞান বলছি তাঁর কৃপাতে সেই জীব এক জন্মে হয় তো মানুষ হলো। আর এক জন্মে ভক্ত হলো। আর এক জন্মে তিনি সাধু করে দিতে পারেন তাকে। বিদ্যা অবিদ্যার পার হলে তবে তাকে দেখা যায়।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—বেশ হলো আজ মায়ের কথা। (জগবন্ধুর প্রতি) এই যে রিপোর্ট করা এ সব কি ঠিক ঠিক হয়? যার যেমন ভাব সে-ভাবের কথাই বেশী রিপোর্ট হয়। এ বড় শক্ত কাজ, সকলের কর্ম নয়।

অমৃত—পণ্ডিত শশধরকে ঠাকুর বলেছেন, এখন ভক্তিযোগ, কর্মযোগ নয়।

শ্রীম—কর্ম, in the comprehensive sense (ব্যাপকভাবে) সকলকেই করতে হয়। জপ, ধ্যান, পূজা, পাঠ, এ-সবও কর্ম। তবে গৃহস্থের যে আদর্শ কর্মের, এখন তা পালন করার শক্তি নেই জীবের। তার জন্য যারা বিয়ে করে নি তাদের বারণ করেছেন বিয়ে করতে। যারা করে ফেলেছে, দু' একটি সন্তান হয়ে গেলে ভাইবোনের মত থাকতে বলেছেন তাদের। অর্জুন রাজা, শক্তি ছিল তাঁর কর্মের। তারপর দ্বাপর যুগ। তাঁকে তাই সংসার করতে বলেছিলেন শ্রীকৃষ্ণ, অনাসক্তভাবে।

রাত্রি ১০টা ১৫ মিনিট।

৩

পরের দিন রবিবার। শ্রীমর শরীর কিছুদিন হইতে তত ভাল যাইতেছে না। বার্ধক্যের রোগ, কখনও একটু বাড়ে আবার কমে।

ইহা লইয়াই স্কুলের কাজ, বাড়ীর কাজ কতক দেখেন। আর প্রধান কাজ—ভক্তগণের কথা ভাবেন, কি করিয়া তাহারা অবসর পায়, আর ঈশ্বরচিন্তা করিতে পারে। তিনি ভক্তদিগকে দিনের মধ্যে অন্ততঃ আট ঘণ্টা ঈশ্বরীয় কথা শুনান। কখনও প্রায় সারা দিন-রাত্রিই ঈশ্বরীয় কথার প্রবাহ চলিতে থাকে। ইহাতে তাঁহার পরিশ্রম বোধ নাই। প্রাণ যেন জীবন্ত হইয়া উঠে ঠাকুরের কথা কহিতে কহিতে। নেহাৎ অসুখের দরুণ তত কথা কহিতে না পারিলে ভক্তগণকে পাঠ বা ভজন করিতে বলেন, তিনি শোনেন। আজ শ্রীমর শরীর একটু বেশী অসুস্থ, বিছানায় শুইয়া আছেন মর্টন স্কুলের তিনতলার কোণের ঘরে। ভক্তসভা ঐ ঘরেই বসিয়াছে। ছোট জিতেন, রমণী, শুকলাল, যোগেন ও আরও কয়েকজন ভক্ত বসিয়াছেন মেঝেতে মাতুরে। শ্রীমর বিছানাও মেঝেতেই। একটু পর অমৃত, তারপর জগবন্ধু আসিলেন বেদান্ত সোসাইটি হইতে সাড়ে সাতটায়। সকলের শেষে আসিয়াছেন ডাক্তার, বিনয় ও ছোট নলিনী। আজ অনন্ত চতুর্দশী, ১৩৩০ সাল।

শ্রীম (জগবন্ধুর প্রতি)—ঐ গানটি গান না—'গুরুপদ ভরসা কর'। (রমণীকে দেখাইয়া) ইনি আর আপনি। রমণী ও জগবন্ধু ঐটি গাহিয়া শেষ করিলেন। শ্রীম পুনরায় বলিলেন, ঐটিও হোক্, —'মা আমার বড় ভয় হয়েছে'। ঐটিও শেষ হইতেছে। পুনরায় বলিলেন, শেষের তু'টি পদ repeat (পুনরাবৃত্তি) করতে থাকুন।

তুই জনে তন্ময় হইয়া গাহিতেছেন—

জন্ম জন্মান্তরের যত কর্ম মা বকেয়া বাকীর জের টেনেছে।
শ্রীরামপ্রসাদ বলে, মনের মাঝে কালী নাম ভরসা আছে ॥
মা, কালী নাম ভরসা আছে।

শ্রীম আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। বিছানায় উঠিয়া বসিলেন, আর ঐ কীর্তনে যোগদান করিলেন। এতক্ষণে সকল ভক্তগণও যোগদান করিলেন। ধুম কীর্তন চলিতেছে। বারান্দায় হ্যারিকেনের আলো জ্বলিতেছে। তাহার আভায়

দেখা যাইতেছে, শ্রীমর দুইটি নয়ন বহিয়া প্রেমাশ্রু বিগলিত হইতেছে।

কীর্তন থামিলে শ্রীম কিছুকাল স্থির হইয়া বসিয়া আছেন। ভক্তগণও শান্ত। এইবার পুনরায় কথা হইতেছে। গতকাল মায়ের কথার অনুকীর্তন হওয়ায় বেদান্ত সোসাইটির কথা শুনিতে পারেন নাই। তাই আজ উহা শুনিতেছেন। জগবন্ধু তাঁহার নোট পড়িয়া শুনাইতেছেন।

প্রশ্নোত্তর ক্লাস। শনিবার বৈকাল ৫-৩০ মিঃ। বেদান্ত সোসাইটি, সেণ্ট্রাল এভিনিউ। প্রশ্নকর্তা সভ্যগণ, বক্তা স্বামী অভেদানন্দজী।

প্রশ্ন—ভোগের জিনিসকে ত্যাগ করার preliminary stage (প্রথমাবস্থা) কি?

উত্তর—ভোগত্যাগ বাইরের জিনিসে হয় না। মনের বাসনা ত্যাগই ত্যাগ। সকলেই সুখ খোঁজে, এটা ওটা দেখে, যদি সুখ পায়। এইরূপে যখন বুঝতে পারে পৃথিবীর কোনও জিনিসে সুখ দিতে পারে না, তখনই সকল সুখের আকর ভগবানে মনোনিবেশ করে। তখন সংসার ছেড়ে যায় আপনিই। স্বাধীনতায় সুখ, দাসের সুখ নাই। আমি ঈশ্বরের দাস, সংসারের দাস নই, এরই নাম স্বাধীনতা। এতে সুখ, এতে আনন্দ। আর সব দুঃখময়। 'And don't ye shall know truth will make ye free' (ব্রহ্মজ্ঞানই মুক্তি)।

ঋষিকেশে একবার একটি মারোয়াড়ী ভক্ত সাধুদের কম্বল দিচ্ছিল। একটি সাধু নিলেন না। তাঁর সামনে ধুনী কৌপীনমাত্র পরা। মারোয়াড়ী ওভারকোট, শাল এই সব জড়িয়ে এসেছে। কম্বল গ্রহণ করার জন্য সাধুকে পীড়াপীড়ি করতে লাগলো। সাধু তখন ভক্তকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার মুখটি কেন ঢাক নি—এত শীত? সারা শরীর ঢেকেছ মুখেও ঢাকনা দাও।' সে বললে, 'মুখে শীত লাগে না, অভ্যাস হয়ে গেছে।' সাধু তখন বললেন, 'অভ্যাসের দ্বারা তুমি মুখে শীত সহ্য করতে শিখেছ। তেমনি আমি সমস্ত

শরীরে শীত সহ্য করতে শিখেছি।' কিছুতেই সাধু কম্বল নিলেন না। এঁর মন অন্য দিকে নিয়ে গেছেন, এই সবে সুখ নাই দেখে।

ঠাকুর বলতেন, কি রকম জান, যেন দশ-পঁচিশের ঘুঁটি। সব ঘর ঘুরে পাকবে। জীবও তেমনি, সব ঘুরে ফিরে দেখে শেষে ঈশ্বরের কাছে তাকে যেতে হবে। সকলকেই যেতে হবে—কেউ এক জন্মে কেউ দশ জন্মে। ঘুরতেও হবে, শেষে যেতেও হবে। তোমরা সংসার কর কিন্তু লক্ষ্যশূন্য হয়ো না। যা কর সব তাঁর কাজ মনে করে কর, তবেই মুক্ত হবে। আর ল্যাজা মুড়ো বাদ দিয়ে সব নেবে, তাহলে বন্ধন হবে না।

প্রশ্ন—What is synthesis of yoga (যোগের সমন্বয়) কি?

উত্তর—এর মানে এই জ্ঞানযোগ, রাজযোগ, ভক্তিযোগ ও কর্মযোগ—নানা পথের যোগ রয়েছে। সকলের ভেতর সবগুলিই সমানভাবে থাকবে এমন কিছু কথা নেই। কারো কারো ভেতর কোন একটার আধিক্য দেখা যায়। কিন্তু কম বেশী সবগুলিই একত্রে থাকে। যে জ্ঞানযোগী—জীবনধারণের জন্য তাকে কর্ম করতে হয়, আবার রাজযোগের ধ্যানাদিও করে আর ঈশ্বরে ভক্তিও রাখে, এই রকম। They are interconnected—একের সঙ্গে অপরের যোগ রয়েছে। এই যেমন তুমি। ইচ্ছা করলে সংসারে থেকে কর্মযোগের দ্বারাও পার, কিংবা ভক্তিযোগ কি রাজযোগের দ্বারাও পার। আবার সব ছেড়ে গাছতলায় বসেও পার।

পরমহংসদেবের কাছে যাবার পূর্বে ভাবতুম, যে সাধু হবে তার মাথায় লম্বা লম্বা জটা থাকবে আর হাতে চিমটে, সর্বাঙ্গে ছাই মেখে বাঘছালে কিংবা কম্বলে বসে থাকবে। তাঁর কাছে গিয়ে দেখি ও সব কিছুই নেই। ভাবনা হলো, এ আবার কি রকম সাধু! জটা চিমটে—এ কিছুই নেই! আবার খাটের উপর গদীতে বসে আছে। পায়ে কাল চটীজুতা। ক্রমে সব বুঝতে পারলুম। প্রথম কত কঠোর করেছেন। দিনের পর দিন পড়ে আছেন মাটির ওপর গাছতলায়, বাহ্যজ্ঞানশূন্য।

প্রশ্ন—মানুষকে মানুষ প্রণাম করে কেন?

উত্তর—দেবতা, সাধু ও রাজাকে প্রণাম করে ঈশ্বরের শক্তি এদের ভিতর আছে বলে। বাপ-মাকে প্রণাম করে কৃতজ্ঞতায়, ভক্তিতে। আর কতকগুলি দাঁড়িয়েছে পরিচয়ের জন্য। ইংরেজরা হ্যাণ্ডশেক করে friendship-এর (বন্ধুত্বের) চিহ্নস্বরূপ। ওদের পূর্বপুরুষরা যখন বর্বর ছিল তখন সকলেই একটা করে sword (খড়গ) বাঁ দিকে ঝুলিয়ে রাখতো। কারো সঙ্গে হঠাৎ দেখা হলে তক্ষুনি ঐ sword (খড়গ) বার করতো। যখন বুঝতে পারতো শত্রু নয়, তখন হাতে হাত দিয়ে ধরতো, অস্ত্র ছেড়ে। এটি বন্ধুত্বের চিহ্ন—sign of friendship, এখন এটাই চলছে।

মুসলমানরা সেলাম করে, অর্থাৎ আল্লার দাসকে শ্রদ্ধা করে। সাধুতে সাধুতে দেখা হলে বলে, 'ওঁ নমো নারায়ণায়'। বৈষ্ণবরা বলে, 'সীতারাম', 'রাধেশ্যাম' কিংবা 'হরেকৃষ্ণ'—এই সব। প্রণাম ঈশ্বরের উদ্দেশ্যেই করা হয়। আর এক মত আছে কিছু লাভের জন্য প্রণাম করে।

ঠাকুর সাধুসঙ্গ করতে বলতেন। বলতেন, 'সাধুরা, আগুনের কুণ্ড, আর সংসারী ভিজে কাঠ। আগুনের কাছে গেলে জল ক্রমশঃ শুকিয়ে যায়। সাধুসঙ্গ করলে মনের বিষয়-বাসনা শুকিয়ে যায়। ভিজে কাঠ মানে বিষয়-বাসনা দ্বারা কলুষিত মন।' আর বলতেন, 'ঐ তিন জায়গায় গেলে—দেবতা, সাধু ও রাজা—হাতে করে কিছু নিতে হয়।' ঠাকুর বলে দিছলেন আমাদেরকে, 'এখানে এলে একটু কিছু হাতে করে আনতে হয়—অন্ততঃ লবঙ্গ, এলাচ কি একটি হরিতকী।' আর কিছু দেবার শক্তি না থাকলে অন্ততঃ ঐ করতে হয়। আমাদের দেশের লোক এ সব ভুলে গেছে। ফল দিতে হয় দেবতার স্থানে। কেন? তার মানে, হে ভগবান, আমার কর্মের যত সুফল সব তোমায় দিচ্ছি। ফুল মানে কি? না, মনফুল। Abstractএ (অমূর্ত ভাবে) মন সব সময় বসে না। তাই concrete (প্রতীকী রূপ) করে নেয়। এই ফুল মনফুলেরই concrete form

(প্রতীকী রূপ)। ঠাকুর সব কথা বলে গেছেন। তাঁর কথা যারা শুনবে তারা বেঁচে যাবে। তিনি ছিলেন personification of truth and morality, honesty and purity, truthfulness and real spirituality (সত্য ও ধর্ম, সততা ও পবিত্রতা, সত্য ভাষণ ও যথার্থ আধ্যাত্মিকতার মূর্তিমান বিগ্রহ)।

প্রশ্ন—দৈব আর পুরুষকার কি?

উত্তর—(ক) ইংরেজরা destiny-কে (অদৃষ্টকে) দৈব বলে। ওরা মানে একটি personality (ব্যক্তিত্ব), যে সব চালায়। (খ) মুসলমানরা দৈবকে 'কিশমৎ' বলে। ওরা ঐ রকম একটি ব্যক্তি মানে। (গ) হিন্দুদের একটা section (অংশ) দৈব অর্থে fate (অদৃষ্ট), বিধি, বিধাতা-নামীয় personified একটা কিছু মানে। উনি লোকের fate (অদৃষ্ট) ঠিক করে দেন। ষষ্ঠী ঠাকুর আঁতুড়-ঘরে কপালে সব লিখে দেন। (ঘ) কিন্তু বেদান্ত বলে, দৈব কর্মফলেরই অপর নাম। বেদান্ত ঐ সব মানে না। বেদান্ত বলে, Law of Karma (কর্মফল) দ্বারাই সব কিছু হয়। পূর্বকথিত personality (ব্যক্তিত্ব) কর্মফলেরই personification (মূর্ত রূপ); ইহা বেদান্তের মত।

পুরুষকার মানে self-exertion; personal effort-এর (নিজের চেষ্টার) খুব দরকার। তবে খারাপ কাজে নয়। Ideal (আদর্শ) ঠিক করে সাধনপথে অগ্রসর হতে হলে এর খুব দরকার, এই পুরুষকারের। 'দৈব দৈব' করে সব লোক কুঁড়ে অলস হয়ে গেছে। খুব পুরুষকার চাই। চেষ্টা ছাড়া কিছু হয় না।

এ বছর কনখলে গিছলুম। একদিন (স্বামী) কল্যাণানন্দের সঙ্গে আমার পূর্ব তপস্যার স্থান ঋষিকেশ দেখতে যাই। একটা টংগা করা গেল। ঘোড়াটা ছিল খারাপ, সেটা বদলে একটা ভাল ঘোড়া নেওয়া গেল। চৌদ্দ মাইলের রাস্তা। পথে একটি নদী পার হতে হয়। পাথুরে রাস্তা তেমন ভাল নয়। নদী পার হচ্ছি, তখন একটা স্প্রিং ভেঙ্গে গেল। পেছনেই আর একটা টংগা আসছিল খালি।

ওটাতেই ওঠা গেল। তারপর ঋষিকেশে যাই। ফিরে আসতে রাত হয়। রাস্তা আবার খুব ভয়ঙ্কর, বাঘ আছে। গাড়িতে আবার আলো নেই। অনেক কষ্টে রাত্রে আসা গেল। একজন পণ্ডিত সেখানে ছিলেন। তিনি সব শুনে বললেন, 'মহাশয়, আপনারা দিক্‌শূলে বের হয়েছেন। আপনি মহাপুরুষ সঙ্গে ছিলেন বলেই ফিরে এলেন। তা নইলে, ইন্দ্রের বাপেরও ক্ষমতা নেই ফিরে আসে।' আমি এ সব মানি না। কল্যাণানন্দের মন খুব খুশী ছিল বলেই আমাদের ঋষিকেশ দর্শন হয়ে গেল—অত বাধাবিঘ্নের ভেতরও।

একজন খেজুর গাছের তলায় শুয়ে আছে, হাঁ করে। খেজুর পড়বে তবে খাবে। আর একজন, যার পুরুষকার ছিল সে গাছে উঠে এক কাঁদি পেড়ে বসে খাচ্ছে, আর অপর ব্যক্তির মুখেও দিচ্ছে। পুরুষকার চাই। তোমরা এখন বেদশাস্ত্র ছেড়ে কুঁড়ে অলস হয়ে গেছ দৈব বিশ্বাস করে করে। পঞ্জিকাই এখন তোমাদের সর্বস্ব বেদ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—দেখুন, কতগুলি personal (ব্যক্তিগত) ঘটনা পাওয়া গেল। ঠাকুর কিন্তু পঞ্জিকা মানতেন। একদিন কলকাতা থেকে দক্ষিণেশ্বর যাচ্ছেন। নৌকোতে একটা ক্যাম্পখাট তুলে দিল। সারাবার জন্য ওটা কলকাতা পাঠানো হয়েছিল। দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছে ঠাকুর জানতে পারলেন সেই দিন মঘা নক্ষত্র। তখন বললেন, 'ওমা, আমি দেখলাম ওটা যেন আমায় গ্রাস করতে এসেছে, হাঁ করে।' তখনই ফেরত দিলেন। ভাল দিন দেখে পরে আনা হলো। লোকশিক্ষার জন্য ঐটি করেছিলেন। (সহাস্যে) শুনতে পাওয়া যায় সাহেবরাও কেউ কেউ ওসব মানে, নৌকো, জাহাজ ডুবে যাবার ভয়ে। এক সাহেব হিন্দু কেরাণীর কথা না শুনে মঘা নক্ষত্রে মাল চালান দেয়। আর জাহাজ সমুদ্রে ডুবে যায়। তারপর আর ওরূপ করতো না।

৪

মোটা সুধীর নববিধান ব্রাহ্মসমাজ হইতে ফিরিয়াছেন। তাঁহার নিকট ওখানকার রিপোর্ট শুনিলেন। পুনরায় কথা হইতেছে।

শ্রীম (সুধীরের প্রতি)—বেশ গানটি হয়েছিল 'মা জননী, মাথায় দিয়ে হাত কর আশীর্বাদ, পূর্ণ হয় যেন মনস্কাম।' (ভক্তদের প্রতি) মাকে বলবে না তো কা'কে বলবে ? Sermon (বক্তৃতায়) subject (বিষয়) আর গান, ব্রাহ্মসমাজে গেলে এ দুটি শুনতে হয়। এখানেও (নববিধানেও) ঠাকুরের ভাব ঢুকেছে কিনা, তাই 'মা, মা' করে। প্রমথবাবু pulpit-এ (বেদীতে) বসেন। সেই সময় তাঁর কথা শুনতে হয়। ঠাকুরের কত ভালবাসা পেয়েছেন এঁরা। একদিন বেদীতে বসে উনি বলছেন—একজন ভক্ত এসে রিপোর্ট করলেন, তোমরা অনেক দিন তো 'নিরাকার নিরাকার' করলে এখন 'মা, মা' বলে নাচ। এই কথাটি ঠাকুর ওঁদের শিখিয়েছিলেন। কেশব সেন দক্ষিণেশ্বর যেতেন, ব্রহ্মজ্ঞানীরা মনে করতো একটা pleasure trip-এর (প্রমোদ ভ্রমণ) জন্য যেতেন। একদিন সব অপেক্ষা করছেন, কেশববাবু কখন আসছেন। অনেক অপেক্ষার পর উনি এলেন। ঠাকুর তখন হেসে বলছেন, 'তোমার জন্য আমরা সব খচমচ করছি। বাসরে জামাই আসার পূর্বে যেমন হয়'। ওঁদের ঠাট্টা করছেন।

শ্রীম (অমৃতের প্রতি)—হোক না আজও একটু মায়ের কথার স্মৃতিকীর্তন।

অমৃত আরম্ভ করিলেন,···তৎপর ভক্তগণ সকলে পর পর যোগদান করিলেন। (২৮) মা বলছেন, যাদের নাম জানা আছে তাদের জন্য জপ করি। যাদের নাম জানা নেই তাদের জন্য ঠাকুরকে এই বলে প্রার্থনা করি, 'ঠাকুর আমার অনেক ছেলে, কে কোথায় আছে জানি না। তুমি তাদের সকলের মঙ্গল কর।' (২৯) (ভাটপাড়ার) বড় ললিতবাবু বললেন—মা, আমি জপ ধ্যান করতে পারবো না। মা বললেন, 'আচ্ছা, তোমায় কিছু করতে হবে না।' (৩০) যুগীপাড়া থেকে পূজোর সময় জিনিস এলে অন্তরা নেয় নি,

কিন্তু আমি নিয়েছিলাম আর বারান্দায় রাখতে বলেছিলাম। (৩১) একটি ভক্ত পাগল হয়ে গিছল। সে মালা ফেরত দিয়েছিল। মন্ত্রও ফেরত দিতে চেয়েছিল। মা বললেন, 'সে কি ফেরত নেওয়া যায়, বাছা!' (৩২) যে মন্ত্র পেয়েছে, যে ঠাকুরের শরণাপন্ন, ব্রহ্মশাপেও তার কিছু করতে পারে না। (৩৩) শেষ সময় ঠাকুরকে দেখা দিতেই হবে, যে তাঁর শরণাগত।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—আহা, কি promise (শপথ)! ঠাকুরও বলছেন, 'মাইরি বলছি, যে আমার চিন্তা করবে সে আমার ঐশ্বর্য লাভ করবে, যেমন পিতার ঐশ্বর্য পুত্র লাভ করে।' এত করে বলেছেন তবুও কি বিশ্বাস হয় লোকের? ভক্তদের জন্য কত স্নেহ মায়ের! একটি ভক্ত জয়রামবাটী থেকে চলে আসছে দীক্ষা নিয়ে। মা কাঁদতে কাঁদতে ঘর থেকে বের হয়ে এলেন তাকে বিদায় দিতে, আর যতদূর দৃষ্টি যায় তার পথের পানে চেয়ে রইলেন। দু'এক দিনের পরিচয় কিন্তু গর্ভ-ধারিণী মায়ের অধিক। লৌকিক বুদ্ধিই বা কি প্রখর! একবার বলছেন, জপতপ কিছুই করতে হবে না। আবার বলছেন, জীবনে শান্তি চাইলে করতে হবে। কি সুন্দরভাবে two extremes meet (দুটি বিরুদ্ধভাবের সমন্বয়) করলেন!

ভক্তগণের স্মৃতিকীর্তন পুনরায় চলিতেছে। (৩৪) ঠাকুর বলছেন, 'ঘরে থেকেই হবে'। স্বামীজী বলছেন, 'সন্ন্যাস না হলে হবে না'—এই বিরোধ কেন? এই প্রশ্ন হলে মা বললেন, বিরোধ নেই, দু' জনে এক কথাই বলেছেন। ঘরে যারা থাকবে তাদের মনে সন্ন্যাস। অনাসক্ত হয়ে তাদের সংসার করতে হবে। (৩৫) ঘুমন্ত লোক খাটে শুয়ে আছে। খাটশুদ্ধ তাকে অন্য স্থানে নিয়ে যাওয়া হলো। ঘুম ভেঙ্গে গেলে সে কি হঠাৎ বুঝতে পারে অন্য স্থানে এসেছে? তেমনি সংসারে মায়ামোহে থেকে কতকটা এগুলেও ভাল করে বোঝা যায় না যে এগুচ্ছে, মোহনিদ্রা না ভাঙ্গলে। (৩৬) প্রশ্ন হয়েছে, কিসে ঈশ্বরলাভ হয়? মা বললেন, কিছুতেই না; কিছুতেই তাঁকে লাভ

করা যায় না। তবে যদি তাঁর কৃপা হয় তবেই হয়। (৩৭) একদিন মা বললেন, আমাকে ধ্যান করলেই হবে। কথা হঠাৎ উলটিয়ে আবার বললেন, ঠাকুরকে ধ্যান করলেই হবে।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—বলছেন, ঠাকুর আর আমি এক। এ কথা স্পষ্ট করে পূর্বেও বলেছেন, 'ঠাকুর আর আমি অভেদ।'

শ্রীম কিছুক্ষণ মৌন হইয়া রহিলেন। পুনরায় কথা হইতেছে।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—সন্ন্যাস মানে মনে ত্যাগ। গৃহে থেকে সন্ন্যাসী, সে খুব কম, প্রায় দুর্লভ। জনকাদির হয়েছিল, ঠাকুর বলেছিলেন। তবুও যারা গেরুয়াধারী, যারা বাইরে ত্যাগ করেছে, ceremony (সংস্কার) করেছে তাদের ভিতর expect (আশা) করা যায়। ঠাকুর বলেছিলেন, পঞ্চবটীতে সাধু বসে কাপড় সেলাই করছে আর গল্প করছে—ফলনা বাবুনে খুব খিলায়া—হালুয়া জিলাভি কচৌরী (সকলের হাস্য)। এদের বাইরে ত্যাগ হয়েছে। ভিতরে নয়। (ডাক্তারের প্রতি)—কি আছে গীতায়?

ডাক্তার কার্তিক—

> ন কর্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
> ন চ সন্ন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি॥
> কর্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
> ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে॥

শ্রীম (অন্তেবাসীর প্রতি)—একজন বি. এ. পরীক্ষা দেবে। বাপ বললেন, তোমায় অন্য কিছু করতে হবে না। সব ছেড়ে এই ঘরে বসে পড়। অনন্য মনে পড়ছে খালি। আর একজন বাড়ীর সব কাজ করছে আর ফাঁকে ফাঁকে পড়ছে। সে ফার্স্ট হয়ে গেল। এও হয় খুব—কম যদিও। যে খেলে কানাকড়িতেও খেলে। এও আছে। তাঁর ইচ্ছায় কি না হয়? (ডাক্তারের প্রতি) শুনতে পাচ্ছি রোজ সকালে একজন স্টিমারে বেড়ান আর সমস্ত গীতা আবৃত্তি করেন। তাঁকে দেখতে ইচ্ছা হয়। যদি কেউ তাঁকে বলে, একটি বুড়ো আপনাকে দেখতে চায়। চলুন না একবারটি। নাম বলার

দরকার নেই কে দেখতে চায়। গীতাতেই তো রয়েছে, 'তুল্য নিন্দা-স্তুতির্মৌনী'; আবার আছে 'মানাপমানয়োস্তুল্যস্তুল্যমিত্রারিপক্ষয়োঃ'। গীতা যখন পড়েন তখন আর ওকথা বলবেন কি করে (মানাপমানের কথা)।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—ঠাকুরকে দেখেছি, কেউ ডাকছে আর অমনি ফিরে দাঁড়ালেন। একবার একটি স্ত্রীলোক ডেকেছিল তার নাংকে এনে দিতে (হাস্য)। আর একবার রাসমণির নাতি ত্রৈলোক্য মেয়েমানুষ সব নিয়ে এয়েছে কুঠীতে, আমোদ-আহ্লাদ হবে। বলে পাঠালে, ছোট্ ভট্‌চায্যিকে নিয়ে এসো। ঠাকুরকে বলতেই গিয়ে হাজির। বলছেন, কি মশায়, কেন ডেকেছ? ত্রৈলোক্য বললে, আপনার গান শুনবো। ঠাকুর উত্তর করলেন, সে কি গো! কই ওরা (মেয়েমানুষরা) গান করবে আমরা শুনবো! তা না করে আমার গান! (হাস্য)। তারপর উনিও গাইলেন ওরাও গাইলো। চলে আসছেন, তখন ওরা মিষ্টিমুখ করাতে চাইলো। কিন্তু তিনি খেলেন না। পিছে পিছে একটি লোক খাবার ঠাকুরের ঘরে নিয়ে এলো।

স্মৃতিকীর্তন আবার চলিল। (৩৮) একটি ভক্ত আত্মহত্যা করেছিল। একজন বললে, এতে ওর খারাপ হবে। মা শুনে বললেন, না খারাপ হবে না—ঈশ্বরের জন্য করেছে যে! (৩৯) দুর্গা-চরণকে (নাগমশায়কে) খুব লঙ্কা দিয়ে চচ্চড়ি করে দিতে বললেন ঠাকুর। তৈরী হলে ঠাকুর জিভে ঠেকিয়ে একটু খেলেন, তারপর দুর্গাচরণ প্রসাদ পেল। (৪০) মাস্টারের বইতে (কথামৃতে) যেন ঠাকুরই কথা কইছেন। মাস্টার এক হাজার টাকা দিয়েছিল বাড়ী করবার সময়। এখনও মাসে মাসে ত্রিশ পঁয়ত্রিশ টাকা দেয়।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—একটি ভক্ত বিয়ের কথা ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। ঠাকুর বিয়ের নামগন্ধের বিষয়ও তুললেন না। বললেন, 'মনে একটু ঝড়—কামটাম এমন হয়ে থাকে। সব ঠিক হয়ে যায় শেষে।' অমন ঝড় একটু আধটু হয় শরীর থাকলে। কি আশ্চর্য! বিয়ের কথাই আর তুললেন না। বলতেন, সংসার জ্বলন্ত অনল।

তা হলে বিয়ে করে ওতে প্রবেশ করতে কি করে বলেন? একটি ভক্তের স্ত্রী লিখেছে, 'এসে ঘরকন্না করবে পতির সঙ্গে থেকে। পতি বিদেশে থাকে। ভক্তটি ঠাকুরের মত কি জানতে চাইলেন। ঠাকুর বললেন, 'কি করে তোমায় বলি অগ্নিকুণ্ডে ঢোকো?'

শ্রীম (নয়নহাস্যে, ডাক্তারের প্রতি)—আপনাকে চিঠি লিখেছেন কি পাঠ দিয়ে?

ডাক্তার—'শ্রীচরণকমলেষু'। (ডাক্তারের পত্নীও এসে থাকতে চান পতির সঙ্গে)।

শ্রীম (সহাস্যে)—খুব নরমভাবে।

জনৈক ভক্ত—কে লিখেছেন?

শ্রীম (রহস্যে)—ও একটা প্রাইভেট বিষয়। সুধীরবাবু মিহিজামে বলেছিল, 'এটা আমার প্রাইভেট বিষয়' (হাস্য)। আমরা সকলে anxious (উদ্বিগ্ন) তার জন্য। আর তখন ঐ কথা বলে (হাস্য)।

যোগেন (শ্রীমর প্রতি)—আজ্ঞে, আপনি আমায় রক্ষা করেছেন। আমার বিয়ের সব ঠিক ছিল। আপনার কথাতেই হয় নাই।

যোগেনের বয়স পঞ্চাশের উপর। দ্বিতীয় পক্ষের বিবাহের কথা হয়েছিল। যোগেন এখন নিত্য গঙ্গাস্নান ও সাধুসঙ্গ করেন, আর মঠ ও দক্ষিণেশ্বর দর্শন করেন।

শ্রীম (যোগেনের প্রতি রহস্যচ্ছলে)—না, আপনি এখন করতে পারেন, নির্লিপ্ত হয়েছেন।

বেলেঘাটা, কলিকাতা, ২৩শে সেপ্টেম্বর ১৯২৩ খ্রী:
৫ই আশ্বিন ১৩৩০ সাল, রবিবার, রাত্রি দশটা

অষ্টম অধ্যায়

জগতের শ্রেষ্ঠ সংবাদ—সর্বস্ব ছেড়ে ঈশ্বরকে ডাক

১

মর্টন স্কুলের ছাদ খুব প্রশস্ত। মাঝখানে বসিলে কলিকাতা সহরের কিছুই দেখা যায় না। পরের দিন একটি ভক্ত একাকী ছাদে বসিয়া আছেন শ্রীমর প্রতীক্ষায়। এখন সন্ধ্যা ৬-১৫ মিনিট। শ্রীম নিজ কক্ষে বসিয়া ঈশ্বরচিন্তা করিতেছেন। কক্ষদ্বার ভিতর হইতে বন্ধ। দেখিতে দেখিতে কিরণ তিনজন সঙ্গীসহ 'স্টুডেন্টস্ হোম' হইতে আসিয়া পড়িল। সকলেই নব যুবক, কলেজে পড়ে। কিরণ বিনয়ের কনিষ্ঠ সহোদর। একটু পরে যোগেন আসিলেন। এক ঘণ্টা অতীত হইয়াছে, এখন ৭-১৫ মিনিট, এইবার শ্রীম বাহিরে আসিলেন। আসিতেছেন আর দূর হইতে যুক্ত করে 'নমস্কার, নমস্কার' উচ্চারণ করিতেছেন। ভক্তগণ দাঁড়াইলেন। নিকটে আসিয়া শ্রীম বলিতেছেন, কতক্ষণ এসেছেন আপনারা? বসুন বসুন।

আজ ২৪শে সেপ্টেম্বর ১৯২৩ খ্রীঃ, ৭ই আশ্বিন, ১৩৩০ সাল, সোমবার।

আজ পূর্ণিমা। চাঁদের স্নিগ্ধ কিরণে আকাশ ঢাকা। কলিকাতা মহানগরী যেন একটি বিরাট শুভ্র চন্দ্রাতপের নিম্নে অবস্থিত। চন্দ্রাতপের ঠিক মধ্যস্থলে পূর্ণিমার চাঁদ একটি সুবৃহৎ উজ্জ্বল আলোর ন্যায় প্রদীপ্ত। আবার চাঁদের আলো স্বচ্ছ কাঁচের উপর পড়িয়া কোথাও ঝিক্‌মিক্ করিতেছে। বৈদ্যুতিক আলো আজ হীনপ্রভ।

শ্রীম উত্তরাস্য, চেয়ারে বসিয়াছেন, আর ভক্তগণ বেঞ্চিতে তিন দিকে বসা। শ্রীমর মুখে চন্দ্রকিরণ পড়িয়াছে, আঁখি ছল ছল —ভগবদ্ভাবে বিভোর। চাঁদ শ্রীমর বড় প্রিয়। বলেন, এই চাঁদ ঠাকুরকে দেখেছিলেন—আমাদের পরম সুহৃদ্। আজ শ্রীমকে দেখিয়া মনে হইতেছে, বেদব্যাস যেন আসিয়াছেন ভক্তগণকে

শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাগবত শুনাইত। শ্রীম যুবক ভক্তগণের সহিত অতি আনন্দে কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (যুবকদের প্রতি)—তোমরা শোন, উনি বলবেন মঠের কথা। (যোগেনের প্রতি) মঠে গিছলেন আজ ? (সকলের প্রতি) শুনলে আট আনা হয়। কারো কারো বারো আনা চৌদ্দ আনাও হয়। দুই আনা মাত্র বাকী থাকে। যাদের realisation (অনুভব) আছে তাদের চোদ্দ আনা হয়। (ছেলেদের প্রতি) এটি হলো world-এর (জগতের) মধ্যে most important event (সর্বশ্রেষ্ঠ ঘটনা)। ক্রিকেট খেলার list of events (বিষয়ের তালিকা) থাকে না ? তেমনি world's list of events-এর (বিশ্বের ঘটনা-সমূহের) মধ্যে এইটি most important (সর্বশ্রেষ্ঠ)। কিনা, সাধুরা সব ছেড়ে ঈশ্বরকে ডাকছেন। এঁরা সব মঠে থাকেন। ঈশ্বরের সঙ্গে commune (যোগ) করছেন। (রহস্যচ্ছলে) কি বলেন মশায় যোগেনবাবু ? (জগবন্ধুর প্রতি) আপনি কি বলেন মশায় ?

ভক্তগণ বিনীতভাবে মৃদুস্বরে বলিতেছেন, 'আজ্ঞে হা।'

এইবার শুকলাল প্রবেশ করিলেন।

শ্রীম (শুকলালের প্রতি)—বসুন বসুন। বসতে আজ্ঞা হোক। বুঝেছেন, এইটিই হলো 'the most important event in the world' (বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বিষয়)। বুঝতে পারেন নি বুঝি, কি বলুন তো ?

শুকলাল—ঈশ্বরের কথা, তাঁর পূজা, এই সব।

শ্রীম (উজ্জ্বল বৃহৎ নয়নদ্বয় আরো স্ফীত করিয়া)—না, পূজো তো সকলেই করছে। যেখানে সর্বত্যাগীরা বাস করেন আর তাঁর সঙ্গে commune (যোগ) করেন, তার সংবাদ। এ-টি আমরা discover (খুঁজিয়া বাহির) করেছি। অন্য কেউ এখনও খোঁজ পায়নি। (জনৈক ভক্তের প্রতি) 'স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা' তার পর কি ?

ভক্ত—সমাধিস্থস্য কেশব।

স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিম্॥

শ্রীম (সকলের প্রতি)—তাঁদেরই খবরের জন্য আমরা উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকি। মঠে থাকেন ওঁরা সব। নিত্য আমরা ঐ খবর পাই।

শ্রীম আহার করিতে তিন তলায় নামিয়া গেলেন। ভোজনের পর দ্বিতলের পশ্চিমের বড় ঘরে গিয়া বসিয়াছেন—ভক্তসঙ্গে মেঝেতে মাদুরে। ঈশ্বরীয় কথা হইতেছে।

২

শ্রীম (যোগেনের প্রতি)—আপনি এঁকে (শুকলালকে) মায়ের কথা শোনান তা হলে।

এইবার স্মৃতিকীর্তন আরম্ভ হইল। ইতিপূর্বে আরও দুই দিন হইয়াছে। যোগেন আরম্ভ করিলেন, অন্য ভক্তরাও যোগদান করিলেন। বিনয় ও সুধীর আসিলেন। স্মৃতিকীর্তন শুরু হইল।

(৪১) একজন সাধু কাশীতে ছিলেন মার সঙ্গে। ইনি গয়াতে এলেন পিণ্ড দিতে। আসার সময় মাকে বলে এলেন, মা, সকলেই যেন পিণ্ড পায়। রাত্রিতে সাধুটি স্বপ্ন দেখছেন, মা সকলের মাঝে বসে আছেন—জপ করছেন। প্রেতাত্মারা তাঁর কাছে মুক্তি চাইছে সব, আর তিনি মুক্তি দিচ্ছেন; কাউকে পরে দেবেন বলছেন, পীড়াপীড়িতে আবার তখনই দিচ্ছেন।

(৪২) যেখানে এখন মঠ পূর্বে সেখানে কলাবাগান ছিল। মা যখন দক্ষিণেশ্বরে যেতেন নৌকো করে, তখন একদিন ঠাকুরকে এখানে বেড়াতে দেখেছিলেন। তারপর স্বামীজী এ জায়গা কিনলেন। মাকে ওখানে নিয়ে গিয়ে চার দিকে ঘুরিয়ে সব দেখিয়ে বলেছিলেন, 'এই নাও তোমার জায়গা। এখন আপন জমিতে এসে থাক।'

(৪৩) একটি সাধু মাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'আচ্ছা মা, তুমি কি পিঁপড়েরও মা?'

মা বললেন, 'হাঁ বাবা, আমি পিঁপড়েরও মা।'

শ্রীম—আমরা কখন কখন চাকর দিয়ে জিনিসপত্র পাঠিয়ে

দিতাম। মা চাকরকে আসনে বসিয়ে ঠাকুরের উৎকৃষ্ট সব প্রসাদ দিয়ে পরিতৃপ্ত করতেন—কাছে বসে থেকে খাওয়াতেন। অন্য লোকদের মত নয়—চাকরদের জন্য এক রকম খাবার নিজেদের জন্য অন্য রকম। মার কাছে ও সব ছিল না—সব এক রকম।

একবার মঠ থেকে একটি গরু এনে উদ্বোধনে রাখার কথা হয়েছিল। মা ঐ কথা শুনেই বললেন, 'না না, ওরা ওখানে গঙ্গাদর্শন করছে, স্বাধীনভাবে বিচরণ করছে। আর সাধুসঙ্গ হচ্ছে। এখানে এনে কিনা, একটা ঘরে পুরে গলায় দড়ি দিয়ে রাখবে। তা হবে না। অমন দুধ আমি খেতে পারবো না।' আনতে আর দিলেন না।

এতেই বোঝা যাচ্ছে, মা পিঁপড়েরও মা।

(৪৪) যতীন পাগল হয়ে গেল—ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। রাসবিহারী মহারাজ বাগবাজারের ঘাট থেকে ধরে এনে মায়ের কাছে নিয়ে গেল। তারপর ভাল হয়ে গেল।

(৪৫) শ্রীহট্ট থেকে একজন ভক্ত মায়ের বাড়ীতে গিয়েছেন। তাঁর দীক্ষা নেবার ইচ্ছা। কিন্তু বলতে সাহস করেন নাই—বাইরে বসে আছেন। মা এসে বললেন, 'উঠে এসো বাবা, উঠে এসো।' ভক্ত ওঠেন না। মা কয়েকবার বলার পর ভক্ত বললেন, 'মা, আমি হীন জাত।' মা উত্তর করলেন, 'না, না বাবা, তুমি ঘরের ছেলে। স্নান করে এসো।' তারপর দীক্ষা হল।

(৪৬) বলরাম ঠাকুরের গায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতো না। ঠাকুর বুঝতে পেরে তাকে পায়ে হাত বুলিয়ে দিতে বলতেন। সে তখন রাখাল, বাবুরাম, নরেন এদের ডেকে দিত।

(৪৭) 'উদ্বোধনে' নলিন্‌দি একদিন পায়খানা পরিষ্কার করে গঙ্গাস্নান করতে গিছল। মা শুনে বললেন, কেন কলে স্নান করে গঙ্গা দিলেই হতো? আমি যখন ও দেশে ছিলাম, তখন কত শুকনো গু মাড়াতে হতো। হাত পা ধুয়ে 'গোবিন্দ গোবিন্দ' বলতাম। সব শুদ্ধ হয়ে যেতো।

শ্রীম—যাদের শুচিবাই আছে তাদের এটা স্মরণ রাখা উচিত।

হাত পা ধুয়ে মুখে জল দিয়ে তাঁর নাম করলে সব পবিত্র হয়ে যায়।

(৪৮) বৃন্দাবনে গোবিন্দজীর মন্দিরে হেগে দিছল একটি ছেলে। সকলের ঠাকুরদর্শনে অসুবিধা হচ্ছিল। গোলাপ তখন নিজের মলমলের কাপড় ছিঁড়ে ওটা পরিষ্কার করে দিল। অন্য সব লোক বলাবলি করতে লাগল, ওরই ছেলে হেগেছে। বললাম, না, সকলের বিঘ্ন হচ্ছে বলে সে পরিষ্কার করছে। আজকাল সে গঙ্গার ঘাটে গু থাকলে পরিষ্কার করে দেয়। তার স্বভাবটি বেশ হয়েছে।

(৪৯) মা সকলের ভাল দিকটা দেখতেন। একজনের কথায় বলেছিলেন, উপপত্নীর জন্য এর কি সেবা, দেখলে।

ডাক্তার, বড় জিতেন ও অমৃত আসিলেন।

(৫০) গৌরীমার কথায় মা বললেন, না গো, গৌরদাসীর কি কম ত্যাগ। অলঙ্কার কত ছিল ওর—সব দিয়েছে।

শ্রীম—আহা। সব ভাল দেখছেন—good sideটা (ভাল দিকটা) দেখছেন।

(৫১) আমেরিকা গিয়ে পূজা করবে বলে জনৈক ভক্তের অনুরোধে নিজের ফটো তুলতে মা রাজি হয়েছিলেন। ফটো দেখে পরে বললেন, আমার শরীর আরও সুন্দর ছিল, ফটো থেকে অনেক ভাল ছিল। যখন ফটো তোলা হয় তখন শরীর ভাল ছিল না। ছেলে যোগীনের অসুখে রাত জাগা ইত্যাদিতে শরীর খুব ক্লান্ত ছিল।

(৫২) নরেন যখন ও-দেশে একা ছিল তখন ঠাকুর প্রায়ই তাকে দেখা দিতেন।

(৫৩) রামের বইতে লিখিত কুমারী-পূজার বিবরণ ঠিক নয়।

(৫৪) গিরিশের অনেক পাপ নিতে হয়েছিল, এই জন্য ঠাকুরকে অত ভুগতে হয়েছিল।

(৫৬) খারাপ স্ত্রীলোক পা ছুঁয়ে প্রণাম করলে মায়ের খুব যন্ত্রণা হতো। কিন্তু মা বলতেন, এ যেন শরৎকে জানিও না, তা হলে লোক আসা বন্ধ করে দেবে।

এবার রামবাবুর বই থেকে গিরিশচরিত পড়া হইল।

আজের স্মৃতিকীর্তন বেশীর ভাগই বিনয় করিয়াছেন। তাই শ্রীম তাঁহার প্রশংসা করিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—বিনয়বাবু আর ডাক্তারবাবু মায়ের সেবা করেছিলেন দুধ দিয়ে। রোজ সকালে দুধ নিয়ে 'উদ্বোধন'-এ যেতেন। এই জন্যই তো বিনয়বাবুর অত কথা মনে আছে। সেবা করলে ভালবাসা জন্মে। আর ভালবাসার জনের কথা হলে মনে থাকে বেশী। গানে আছে—

আমার ভক্তি যে বা পায় সে যে সেবা পায় হয়ে ত্রিলোকজয়ী।
ভক্তির কারণে নন্দের ভবনে নন্দের বাধা মাথায় বই॥

রাত্রি ৯-৪০ মিনিটে সভা ভঙ্গ হইল।

৩

কলেজ স্কোয়ার, থিওজফিক্যাল হল। এখন সন্ধ্যা। পণ্ডিত কুলদারঞ্জন মল্লিক ভাগবতরত্ন বক্তৃতা দিতেছেন। বিষয়—'বৈষ্ণব কবিতা'। শ্রীম একটি ভক্তকে উহা শুনিতে পাঠাইয়াছিলেন। ইনি ফিরিয়াছেন আটটায়। আজ ২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৯২৩ খ্রীস্টাব্দ। ১০ই আশ্বিন, ১৩৩০ সাল, বৃহস্পতিবার।

ভক্তটি দেখিলেন, শ্রীম দোতলার পশ্চিমের হলে বসিয়াছেন মেঝেতে মাদুরের উপর। চারিদিকে ভক্তগণ—বড় জিতেন, যোগেন, শচী, ছোট জিতেন, অমৃত, সুধীর প্রভৃতি। বৌবাজারের তিন জন ভক্তও রহিয়াছেন। ঠাকুরমার চারিদিক ঘেরিয়া যেমন শিশুগণ মত্ত হইয়া গল্প শুনে, তেমনি ভক্তগণ শ্রীমর 'কথামৃত' পানে মত্ত—জগতের হুঁশ নাই যেন কাহারো।

শ্রীম (বড় জিতেনের প্রতি)—অনন্ত কাণ্ড তাঁর। তাঁর কি একটা দুটো কাজ। একদিন দক্ষিণেশ্বরে ছোট খাটটিতে বসে আছেন ঠাকুর, আর নীচে বসে একটি ভক্ত। ভক্ত বলছেন, 'শুনতে পাই ঈশ্বরের অনন্ত কাণ্ড। আপনারও দেখছি তাই।' ঠাকুর বললেন, 'ঠিক বলেছ,

অনন্ত ব্যাপার ঈশ্বরের। কেমন জান, একটা দিগন্তব্যাপী মাঠ। তার মধ্যে একটি প্রাচীর রয়েছে; আর তাতে একটি গোল বড় ছিদ্র আছে। বলতো ঐটি কি?' ভক্ত বললেন তৎক্ষণাৎ, 'সেটি আপনি।' অমনি পিঠ চাপড়ে বলতে লাগলেন, 'বা, বেশ বুদ্ধি তো তোমার—ঠিক বলেছ।' মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করতেন, 'বল না আমি কি—পূর্ণ, কি অংশ—ওজন বল?'

বড় জিতেন—একজন তান্ত্রিক সাধু বলেছিলেন, ঠাকুরের সব ভাল, কিন্তু মোটেই সংসার করলেন না। ভাবের উপর দিয়েই চালিয়ে দিলেন সারাটা জীবন।

শ্রীম—কেন, সংসার করেছেন বই কি? কামারপুকুরে স্ত্রী ভক্তদের বলেছিলেন, 'আমি যে তোমাদের মধ্যে মুড়কীমাখা হয়ে গেলুম'! সাধুটি কি ঠাকুরকে দেখেছেন?

বড় জিতেন—আজ্ঞে না।

শ্রীম—তবে কি, না দেখলে আর কি? সকলে কি আর সমান দাম দিতে পারে? একটা হীরের দাম দিলে ন'সের বেগুন, বেগুনওয়ালা। কাপড়ওয়ালা বললে ন'শ টাকা। জহুরী একেবারে এক লাখ টাকা। তবে সকলকেই credit (সাবাস) দিতে হয়—যে যতটুকু বুঝেছে।

সুরেনবাবু (দাশগুপ্ত) একজন আছেন—ইংলণ্ড, জার্মানী, এ সব স্থানে পড়াশোনা করেছেন। এঁর যখন ছ' বছর বয়স তখন থেকেই আমরা এঁকে দেখছি। দুটো এম. এ. পাশ দিয়েছেন। ছেলেবেলায় এমন সব কথা বলতেন ঠিক যোগীদের মত। ওয়েস্ট থেকে আমাদের লিখেছিলেন, 'কথামৃত যিনি বলেছেন তিনি অবতার। তা যদি না হয়, তবে যিনি লিখেছেন তিনিই অবতার। আপনি লেখক। আপনাকে জানি, আপনি অবতার নন। তা হলে যাঁর মুখ থেকে বেরিয়েছে তিনি নিশ্চয় অবতার।'

শ্রীম তিন তলায় উঠিতেছেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রভাসবাবু দেওঘর যাইতেছেন বায়ুপরিবর্তনে। শ্রীম তাঁহাকে বিদায় দিবেন। শ্রীমর

ইচ্ছায় ভক্তগণ আগমনী গাহিতেছেন। ইনি উপর হইতে শুনিতেছেন।

গান। গিরি গণেশ আমার শুভ করি

পূজে গণপতি পেলাম হৈমবতী গণেশের কল্যাণে আসিবে গৌরী॥

বিল্ববৃক্ষ-মূলে পাতিয়ে বোধন গণেশের কল্যাণে গৌরীর আগমন।

ঘরে আনব চণ্ডী, শুনবো কত চণ্ডী আসবে কত দণ্ডী যোগী জটাধারী॥

গান। কে গো আমার মা কি এলি।

একবার আয় মা মনের কথা বলি॥

অনেক দুঃখ দিয়ে শ্যামা যদি দয়া প্রকাশিলি,

তবে মা হয়ে মা মায়ের মত ছেলের কথা শোন মা কালী॥

দাঁড়া গো মা হৃদকমলে পূজি মানস কুসুম তুলি,

ভক্তিচন্দন মাখাইয়ে পদে দিব পুষ্পাঞ্জলি॥

করিব সুমহৎ হোম চিৎকুণ্ডে অনল জ্বালি

পূর্ণাহুতি দিব তাহে জয় কালী জয় কালী বলি॥

প্রাণান্ত এ দক্ষিণান্ত কর্মফল মা তুই সকলি।

মায়ের ছেলে প্রেমিক এখন, যার কাছে কাল কৃতাঞ্জলি॥

শ্রীম নামিয়া আসিলেন। বলিতেছেন, রামবাবুর বইটি পড়লে হয়। জগবন্ধু রামচন্দ্র দত্ত-লিখিত শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনবৃত্তান্ত পড়িতেছেন। শশী মহারাজের (স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ) গুরুভক্তি পাঠ চলিতেছে। লেখক শশীর গুরুভক্তি ও গুরুসেবার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—শশী মহারাজের কথা যে-সব বিবরণ দিয়ে বর্ণনা করেছেন, সেগুলি অন্য সাধুদের বিপক্ষে। মানে, ঝগড়া ছিল কিনা। (দীর্ঘ হাস্যের সহিত) রামবাবু যখন বই লেখেন তখন মঠ থেকে সাধুরা গিয়ে বলে এলেন, 'আমাদের নাম-টাম দিও না।' রামবাবু একদিনও বরানগর মঠে যান নাই।

ঠাকুর বলতেন, 'রাম একটু অভিমানী'। অধর সেনের বাড়ীতে ঠাকুর যাবেন, রামবাবুকে বলা হয় নি। তাতে রামবাবু বললেন, 'সব রাখালের দোষ। ওর ওপর ভার ছিল। সে কিছু বলেনি।' ঠাকুর

শুনে বললেন, 'হা হা, রাখাল দুধের শিশু, গলা টিপলে দুধ বেরোয়, ওর দোষ ধরতে নেই।' তারপরই বললেন, 'কি জান, যেখানে হরিনাম হয়, সেখানে নিমন্ত্রণ না হলেও যাওয়া যায়।'

একবার রামবাবু বিমাতার যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে পড়েছেন। ঠাকুরকে গিয়ে বলছেন, 'আচ্ছা, উনি বাপের বাড়ী চলে যান না।' (সহাস্যে) সুরেশবাবুর ভাই গিরীন্দ্র বললে, 'তোমার বউকেও পাঠিয়ে দাও না বাপের বাড়ী?' সব শুনে ঠাকুর বলছেন, 'তা কি করে হয়? হাঁড়ি থাকবে একখানে আর সরা অন্যখানে, তা হয় না। বাপ-মার সঙ্গে না মেলে তাদের পৃথক বাড়ী করে দাও। আর খাওয়ার সব ব্যবস্থা করে দাও।' কি সুন্দর করে মিলিয়ে দিচ্ছেন।

রামবাবু একদিন স্বামীজীর সঙ্গে চীৎকার করে তর্ক করছেন। ঠাকুর শুনে বলছেন, 'রসো রসো, এই সবে অসুখ থেকে উঠলে। অত জোরে কথা বলতে নেই।'

বড় জিতেন—তা হলে এ পড়ে লাভ কি?

শ্রীম (গম্ভীরভাবে)—তা পড়বে না। ঠাকুর কি এক রকমে প্রকাশিত? বিভিন্ন ভক্তের ভিতর দিয়ে বিভিন্ন ভাবে প্রকাশিত হয়েছেন। তাঁরই ভাব সব। তা দেখতে হবে না? হলেই বা একটু ঝগড়া—ভাইদের মধ্যে থাকে না। বাপের পাঁচ ছেলে কি আর সব সমান হয়? বালিতে চিনিতে মিশান আছে—চিনিটুকু নেবে। বেশীর ভাগই চিনি। ভাইদের মধ্যে কি না হয়।

রামবাবুর ত্যাগ কত। কিছুই রাখেন নি। সব সময় বাগানে (যোগোদ্যানে) বসে থাকতেন। কলেজ (মেডিকেল) থেকে ফিরবার সময় যা একটু জলটল খেতেন বাড়ীতে। আর বাকী সব সময় বাগানে বসে তাঁকে ডাকছেন। ঠাকুরের নাম একজনের মুখে শুনলে তাকে কত ভালবাসতেন। শেষ সময় যখন অসুখ হলো তখন বলেছিলেন, 'আমায় বাগানে নিয়ে যাও। আমি ওখানেই দেহত্যাগ করবো।' কেউ এ কথায় কান দেয় নি। শেষে নিজেই খোঁড়াতে খোঁড়াতে পালকী করে ওখানে গেলেন সাত দিন আগে।

সেখানেই শরীর যায়। তাঁর স্ত্রী সেবা করতেন। রামবাবু মহাত্মাই। সংসারে থেকে কি করে সব ত্যাগ করতে হয়, তা দেখিয়ে গেছেন।

শ্রীম কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, পুনরায় কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (পাঠকের প্রতি)—একদিন বলেছিলেন কেশব সেনকে, শিব-রামের মিলন হয়ে গেল, কিন্তু ওগুলোর চেঁচামেচি আর থামছে না—রামের বানরগুলোর আর শিবের ভূতগুলোর। মানে, কেশব-বিজয়ের মিল হয়ে গেল, কিন্তু তাঁদের শিষ্যদের মিল হয় নি।

মণি মল্লিক ব্রাহ্ম ভক্ত। খুব পুরোনো লোক। পণ্ডিত শশধর তখন খুব নবীন উত্তমে হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে লেকচার দিচ্ছেন। দু'জনের একদিন কথা হচ্ছে দেখে ঠাকুর বলেছিলেন, 'ওর যা মত বেশ।' এই বয়সে বদলাবে না জেনে শশধরকে বারণ করলেন তর্ক করতে।

তাঁর (ঠাকুরের) কত কাজ। সকলকেই দেখছেন। তাঁ'তে কোন দলাদলি নাই।

একটা হাঁড়িতে বেগুন, আলু, পটল সব সেদ্ধ হচ্ছে। জল টগবগ করছে। ও-গুলি নড়ছে সব। যেই কাঠখানা নীচ থেকে সরিয়ে নিলে অমনি সব চুপ। আমাদেরও তিনি ঐরূপ নাচাচ্ছেন—'যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া।'

রাত্রি পৌনে দশটা।

৪

মর্টন স্কুলের চারতলার ছাদ। এখন সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টা। শ্রীম একটি সাধুর সঙ্গে বসিয়া কথা কহিতেছেন। সাধু হিন্দুস্থানী, বৃদ্ধ। চিত্রকুট পাহাড়ে থাকেন। ইনি একশ্লোকী রামায়ণ ও একশ্লোকী ভাগবত শুনাইতেছেন। তারপর একটি বেশ সুন্দর গল্প বলিলেন—'মানুষ প্রথম দু'পায়ে চলে। তখন বেশ মুক্তভাবে চলাফেরা করতে পারে। বিয়ে যেই হলো অমনি গলায় দড়ি পড়লো। পশুর মত তখন চার পা হয়ে গেল। ইচ্ছামত চলাফেরা করতে পারে না।

সর্বদা পেছন টান। ছ' পা হল যেই ছেলে হলো। তখন জলের পোকার মত ঘুরে ঘুরে মরে। আর ছেলের বিয়ে হলে আট পা হলো। মাকড়শার মত তখন আবদ্ধ হয়ে যায় নিজেরই জালে। আপন ছেলেপুলে ধরে তখন তাকে খায়। অত আহার মেলে কোথায়, তাই তাকেই খায়। সংসারীর এই অবস্থা।'

সাধু মিষ্টিমুখ করিলেন। এইবার ভবানীপুর যাইবেন, সেখানেই আসন করিয়াছেন। মাখন সঙ্গে যাইবেন। শ্রীম উঠিয়া নমস্কার করিলেন, সাধু বিদায় লইলেন।

আজ ২৮শে সেপ্টেম্বর ১৯২৩ খ্রীস্টাব্দ, ১১ই আশ্বিন ১৩৩০ সাল, শুক্রবার।

ভক্তের মজলিস বসিয়াছে দোতলার পশ্চিমের ঘরে। বড় অমূল্য, ছোট রমেশ, শালিখার ভক্ত, ইঁহারা পূর্ব হইতেই অপেক্ষা করিতেছেন। বড় জিতেন ও বিরিঞ্চি কবিরাজ আসিলেন—ক্রমে ছোট জিতেন, ছোট নলিনী, ডাক্তার ও বিনয় আসিয়াছেন। জগবন্ধু এখানেই থাকেন। শ্রীম ভক্তপরিবৃত হইয়া ঈশ্বরীয় কথা কহিতেছেন। এখন রাত্রি আটটা।

মঠের কোন বিশেষ ভক্ত একটি প্রতিষ্ঠানের কর্মসচিবের পদ পরিত্যাগ করিয়াছেন। এই সম্পর্কে কথা চলিতেছে। ভক্তদের আলোচনা শ্রীম নিবিষ্ট মনে শুনিতেছেন।

পুনরায় কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—যীশুখ্রীষ্ট বলতেন, 'For after all these things do the Gentiles seek. But seek ye first the Kingdom of God.' এ তো বিষয়ীরা চায়। তোমাদের কাম্য হোক ঈশ্বর। ঠাকুর বলতেন, 'ও-গুনো অত ভেবো না'— 'ও-গুনো' মানে জাগতিক জিনিস, তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলতেন। যেমন টেকনিক্যাল-ফেকনিক্যালগুলি। এতো সংসারে আছেই, থাকবেও চিরকাল। কিসে তাঁকে লাভ হয় তার চেষ্টা করা উচিত। ঈশ্বর কি দেখছেন না যে, টেকনিক্যালের দরকার ? এর জন্য তিনি পৃথক লোক

রেখেছেন। ভক্তরা খালি তাঁকে নিয়ে থাকবে, সর্বকর্ম। তাঁকে লাভের জন্য যে কর্ম তা নিয়ে থাকবে ভক্তরা।

ঈশ্বর সকলের জন্য ভাবছেন। গৃহীদের জন্য ভাবনাও তাঁর আছে। গৃহীদের উপরই নজর বেশী। কারণ তারা যে বদ্ধ হয়ে রয়েছে। একদিন কতকগুলি ছোকরা ভক্ত বসে আছে, বয়স ১৮।১৯ বছর। এদের ভিতর একজন বিয়ে করেছে। তাকে ঠাকুর বলছেন, 'তোর জন্যই যত ভাবনা। তুই বিয়ে করে ফেলেছিস।' বিয়ে করেছে বলে কি তাদের case (কেস) take up (গ্রহণ) করবেন না। আগে করেছেন। সাধুরা যারা বিয়ে করে নি তাদের কেস অত জটিল নয়।

সংসারীদের আবার উপায় বলে দিয়েছেন। বলেছিলেন, 'যেই দু'টি একটি সন্তান হয়ে গেল অমনি ভাইবোনের মত থাকবে, আর না।' আর বলেছেন, মাঝে মাঝে নির্জনে চলে যাবে। পনের দিনের ছুটি পেলে অমনি ছুট, একদিনও কম নয়। (ডাক্তারের প্রতি) তা বলে ভগ্নীপোতের বাড়ী নয়—এক আগুন থেকে অন্য আগুনে। এই মনে করে বের হয়ে চলে যেতে হয়—আমি মরে গেলেও সংসার চলবে। (বড় জিতেনের প্রতি) এই আমাদের ডাক্তারবাবু কেমন কাশী চলে যান মাঝে মাঝে দু'এক মাস। যারা সাইনবোর্ড দিয়ে ব্যবসা ফেঁদেছে, চলে গেলে তাদের প্রসার কমে যাবে। এই ভাবনায় যেতে পারে না। একজন ডাক্তার যদি প্রায়ই চলে যায়, রোগী এসে যদি না পায়, তবে বলবে মাথা খারাপ হয়ে গেছে। এতেই কেউ কেউ বাঁধা পড়ে যায়। আবার কেউ কেউ এমন আছে, সব ঠেলে-ঠুলে চলে যায়।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—একজন গেরুয়া নিয়েছিল। সে ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করলো, 'আমার কত বাকী?' ঠাকুর বললেন, 'এখনও বাকী আছে।' কামনা বাসনা কি যায়—মজ্জাগত হয়ে শুকিয়ে থাকে। এক জন ভাঁড়ে ঘি রাখতো, ঘি ফুরিয়ে গেল। আর একজনের একটু ঘিয়ের দরকার। সে ঘি চাইলে। ঐ ব্যক্তি জবাব দিল, 'ঘি নেই'। যে ঘি চেয়েছিল সে বললে, 'তোমার ঘিয়ের পাত্রটা

রৌদ্রে দাও'। রৌদ্রে রাখতেই কলকল করে এক পোয়া ঘি বের হয়ে এল। বাসনাও অমনি, মজ্জাগত হয়ে থাকে। তবে জ্ঞানাগ্নি দিয়ে গালিয়ে বের করে ফেলা যায়। সেই জ্ঞানাগ্নি জ্বলে তপস্যায়। তপস্যা করলে তবে ঠিক হয়। সাধু হলেই কি বাসনা চলে গেল ? তা নয়। পথে দাঁড়িয়েছে মাত্র। ওখান থেকে সুবিধা চলতে। এই সব বাসনা আবার ফিডার (আহার) পেলে জেগে ওঠে। যেমন মাঠের এক গর্ত, জলে সর্বদা পূর্ণ হয়ে আছে। কেন ? না নদী থেকে perpetual supply (অফুরন্ত যোগান) যে পাচ্ছে জলের। তাই জলপূর্ণ। যতক্ষণ out of sight (চোখের আড়ালে) ততক্ষণ out of mind (মনের আড়ালে), সামনে এলেই আবার ফস করে জেগে ওঠে।

শ্রীম (অমূল্যর প্রতি)—অনেকের প্রকৃতি কর্মের। তারা altruistic work (পরোপকার) করতে ভালবাসে—flood relief (বন্যায় সেবা), হসপিটাল, ডিসপেনসারী, এ সব তারা করে। তা বলে কি সর্বদাই করবে ? করতে করতে যেই আশা মিটে গেল, অমনি দৌড়। দেখছ না, মঠের সাধুরা কাজ করছে করছে, আবার মাঝে মাঝে ফস করে বের হয়ে গেল। এক দল কাজ করছে, এক দল তপস্যা করছে।

শ্রীম (জনৈক অবিবাহিত যুবকের প্রতি)—যাদের বিয়ে হয় নি তারা কেন যাবে এ আগুনে পুড়তে ? ঠাকুর বলেছিলেন, 'যাদের বিয়ে হয়নি তারা যেন সখ করে না যায় এ আগুনে পুড়তে।' (ছোট রমেশের প্রতি) কি বল রমেশবাবু ? যন্ত্রণা ভোগ করতে কেন যাবে ? কর্ম প্রকৃতিতে থাকলে কিছু কাজ-টাজ করে বাসনার হ্রাস কর। আবার যারা একবার বিয়ে করেছে, কিন্তু স্ত্রী-বিয়োগ হয়ে গেছে, তারা আবার কেন যাবে নূতন ফাঁদে পড়তে ? কিন্তু যাদের প্রকৃতিতে আছে, দ্বিতীয় বিয়ে করে হয়তো এগারটি ছেলের বাপ হয়ে পড়লো।

শ্রীম (যোগেনের প্রতি)—দুঃখকষ্ট শরীর ধারণ করলে আছেই। যাদের তিনি ভালবাসেন তাদের তিনি দুঃখ দেন। এতে মনে চৈতন্য

থাকে। পাণ্ডবদের দেখুন না—শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গে সঙ্গে, অথচ দুঃখের অন্ত নেই। একটু খাওয়ার কষ্ট, এ আর কি দুঃখ। একজন হয়তো কেঁদেই ফেললে—আজ আমার শাক ভাত হলো শুধু, এই বলে। আহা, কি দুঃখ রে। আত্মাকে না জানা যে সব চাইতে বড় দুঃখ। খাওয়া-পরার সুখকে কি আর সুখ বলে—আত্মার সুখই সুখ। কেননা সে-টি যে চিরকাল থাকবে। বিদ্যাসাগরমশায় তখনকার দিনের পাঁচশ' টাকার চাকরী ছেড়ে দিলেন—প্রিন্সিপাল ছিলেন। বললেন, 'অপমান সইতে যাব, গোলাম হতে যাব, কেন? আমি নুন ভাত খাব।' কি রোখ! ঠিক ঠিক ভক্ত, যেন চাতক। অত সব জল আছে, কিন্তু সে কিছুই খাবে না—ফটিক জল চাই—বৃষ্টির বিশুদ্ধ জল।

শ্রীম (সকলের প্রতি)—ঠাকুর বলেছিলেন,'ঠিক হয়ে বসে থাক যে যেখানে আছ, নড়ো না।' যেমন কর্ণধার বলে ঝড়ের সময়—খবরদার, নড়ো না, ডুবে যাবে। সংসারেও তেমনি যে যেখানে আছ স্থির হয়ে থাক। মানে, আর বন্ধন না পড়ে। দু'একটি ছেলে হয়ে গেছে তো, আর না। এখন ভাইবোনের মত থাক। কাজকর্ম, ব্যবসা-বাণিজ্যও আর না বাড়ান হয়। খাওয়া চলে এমনতর হলেই হলো।

বড় অমূল্য—সবাই এ পালন করতে পারে না। আর স্ত্রীর দরকারটা হয় রান্নাবান্নায়, আফিসের কাজকর্ম করতে গেলে এটার দরকার।

শ্রীম (সহাস্যে)—হাঁ। না, যার রোখ আছে তার কিছুই গ্রাহ্য নাই। সকলের জন্য কি এ ব্যবস্থা।

শ্রীম নৈশভোজন করিতে উপরে গিয়াছেন। তাঁহার কথামত ভক্তগণ ভাগবত পাঠ শ্রবণ করিতেছেন—একাদশ স্কন্ধের ঊনত্রিংশ অধ্যায়। ফিরিয়া আসিয়া মোহনকে বলিলেন, কি পড়া হলো, মোদ্দাটা বলুন।

মোহন—ভগবান উদ্ধবকে ব্রহ্মবাদ উপদেশ করিতেছিলেন। বলিলেন, আমিই পরমব্রহ্ম। আমি আকাশবৎ পূর্ণ আত্মস্বরূপ।

আমাকে সর্বভূতে এবং আপনাতে দর্শন করিবে। এইরূপ দর্শন হইতে যে বিদ্যা উৎপন্ন হইবে তাহার প্রভাবে তোমার নিকট সকলই ব্রহ্মময় হইয়া যাইবে।

আর বলিয়াছেন, এই মানবদেহ অসত্য ও ক্ষণভঙ্গুর। তথাপি এই দেহ দ্বারাই আমাকে লাভ করা যায়। জানিবে, একমাত্র আমিই সত্য, আমিই অবিনশ্বর।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—সার কথা। ইহাই ভাগবতের প্রাণ। এই সব কথার ধারণা হয় নির্জনে গেলে। নানান খানার ভেতর থেকে হয় না। এ সব ভোগের আড্ডা। এখানে খালি আহার বিহার এই সব চলছে, যেমন পশুরা করে। দিন রাত দেহচিন্তা—খালি দেহসুখ।

মিহিজামে দেখেছি, ছাগলগুলো সারা দিন খাচ্ছে—সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত। মানুষও তাই করছে। নির্জনে গেলে তফাৎ ধরা যায়। (বিনয় ও জগবন্ধুকে দেখাইয়া) এঁরা সব ছিলেন মিহিজামে। দিনরাত খাচ্ছে আর খাচ্ছে, কেমন, না? (বড় জিতেনের প্রতি) আপনারা বুঝি যান নি? আহা, আবার গেলে হয়! কোথায় নেবেন তা তিনিই জানেন। পুরী থেকে ডাক এসেছে। পুরীতে রাঁধতে হয় না, তাতেই মস্ত একটা হাঙ্গাম মিটে যায়। রান্না নিয়েই তো আছে সব। সংসারের কাজ করে বারটার সময় যাবে রান্নায়। এর পূর্বেও এরই আয়োজন। কিন্তু পুরীতে বেশ রান্না-বান্না নাই। Lord of Universe-এর (জগন্নাথের) পাকশালায় সকলের রান্না হচ্ছে।

আমরা সখীচাঁদের (মন্দিরের ম্যানেজার) কাছে লিখেছিলাম, ইনি (দুর্গাপদ') যাচ্ছেন। ইনি আপনার সঙ্গে আলাপ করবেন। ইনি আমাদের 'ফ্রেণ্ড'। সখীচাঁদ উত্তর দিয়েছেন, 'আমাকেও ফ্রেণ্ড করে নিন্ না! আর লিখেছেন, যদি একা আসেন তা হলে আমার কাছেই থাকতে পারেন।'

শ্রীম (সহাস্যে)—ও মা, নেকড়ে বাঘের কথা স্মরণ হল। নেকড়ে বাঘ বলেছিল কুকুরকে, 'বেশ, বেশ'। তুমি খেয়েদেয়ে বেশ 'হৃষ্টপুষ্ট'

হও, আমার এ পোষাবে না। আমি তোমার অমন খাওয়াও চাই না, আর গলায় শেকলও পরতে চাই না।

অন্যের বাড়ীতে থাকলে স্বাধীনতা নষ্ট হয়। তাদের নিয়মের 'আণ্ডারে' যেতে হয়। এ-সময় বাড়ীতে থাকতে হবে, এ-সময় খেতে হবে—এই সব বন্ধন এসে পড়ে। আর অন্যের সেবা যত কম নেওয়া যায় তত ভাল। কারণ যারা সেবা করে তাদের জন্য একটা obligation (বাধ্যতা) এসে যায়। দশ তরকারী দিয়ে খাওয়ালে, যত্ন নিলে, এটা আরো বেড়ে যায়।

সব চাইতে নিজে রান্না করে খাওয়া ভাল। এতে এই ভাব আসে না, আর সত্ত্বারও হানি হয় না। যার হাতে খাওয়া যায় তার সত্ত্বা পায়। সেই জন্যে স্ত্রীলোকের হাতে খায় না অনেকে। কি রকম লোক কে জানে। তাই অনেকে নিজে রান্না করে খায়। এটা খুব ভাল, ঠাকুর বলতেন।

শ্রীম (যুবকের প্রতি)—ঠাকুর আমাকে বলেছিলেন, 'নিজ হাতে রেঁধে খাবে—দুধ ভাত আর গাওয়া ঘি।' তখন রিপণ কলেজে পড়াই। একটা মেসে থাকতুম—নীচের একটা ঘর ভাড়া নিয়ে। দেয়ালে একটা পেরেকের উপর হাঁড়িটা টাঙ্গান থাকতো।

যাদের পাঁচজনের সঙ্গে থাকতে হয় তাদের জন্য এ ব্যবস্থা নয়। চাকর হাঁড়ি মাজছে। কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলে, 'আমাদের বাবুর হাঁড়ি। আজকাল উনি নিজ হাতে রান্না করে খাচ্ছেন কিনা।' (হাস্য)। পাঁচ জনকে বিরক্ত করতে নেই। যারা একা থেকে স্বপাক খেতে পারে তাদের জন্য এ ব্যবস্থা ভাল।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—পুরীতে এইসব হাঙ্গাম নাই। মহাপ্রসাদ কিনে খাও। আর পুরীতে সবই বৃহৎ—মন্দির, ভোগরাগ, সমুদ্র—মঠই কত!

তীর্থবাস সোজা নয়। অমুক বড় লোক। তার সঙ্গে আলাপ করি, এই ভাব যদি আসে তবে ওখানে যাওয়া কেন? এইখানেই ভাল। তার পর ওখানে মেয়েদের সঙ্গে মিশবার বেশ সুবিধা।

বড়লোকের বাড়ীর সুন্দরী মেয়েরা ওখানে যায়। মনও ওদিক যাবে। আবার দশ জনে জানবে, বেশ একটি ভক্ত এ বাড়ীতে থাকেন। তাদের আসা যাওয়া হবে। মেয়েরাও শেষে আসবে। এই সব অনেক ভাববার আছে। তীর্থ অমনি কথা। অত সব ভেবে চিন্তে তবে তীর্থ করতে যাও। তা না হলে, remedy is worse than the disease—যদি 'রোগী ছিল বসে, বস্তিতে শোয়াল এসে' হয়ে যায়!

ডাক্তার বক্সী—তা হলে চুপ করে বসে থাকাই ভাল। তিনি যখন নেবেন তখন হবে।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—মা-ঠাকুরুন একজনকে বলেছিলেন, 'বিয়ে করিস্ না বাবা, বিয়ে করিস্ না। রাত্রিতে তা হলে ঘুমুতে পারবি না শান্তিতে। এ জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে ঢুকিস্ না, বাছা।' একজন ব্রহ্মচর্য নিয়েছে দেখে বলেছিলেন, 'নে বাবা, এখন রাতে ঘুমুতে পারবি।'

শ্রীম কি ভাবিতেছেন। পুনরায় কথা বলিতেছেন।

শ্রীম—অনাসক্ত হয়ে থাকতে হয় সংসারে। জনক রাজাকে বিদেহ বলা হতো। মানে, তাঁর দেহবুদ্ধি ছিল না। ভরত রামের রাজ্য চৌদ্দ বছর দেখলেন, কিন্তু নিজে কোনও ভোগ নিলেন না। নগরে থাকলে মনে ভোগের বাসনা উঠবে, দেখে শুনে তাই নগর ছেড়ে দিলেন। নন্দীগ্রামে কুটীর বেঁধে রইলেন। কঠোর সাধন। সারা দিন মুখে, 'রাম রাম'। আর সামান্য ফলমূল আহার। মন্ত্রীরা পরামর্শের জন্য যেতেন। তাও এক ঘণ্টা মাত্র।

সব করবে, ভোগ নেবে না—এই আদর্শ। পরিবারের দশজনের মনোরঞ্জনের জন্য নিজেকে বেশী খাটতে হয়। ওদের জন্য তো কর্তারাই responsible (দায়ী)। যেমন শিখিয়েছে তারা, তেমনি করছে। আদর্শহীন জীবন। ভগবানলাভ জীবনের আদর্শ, এ যাদের ঠিক হয়ে গেছে, তাদের সব অন্যরূপ। তারা minimum (সব চাইতে কম) ভোগ নেবে। আর maximum (সব চাইতে বেশী) সময়, শক্তি ও অর্থ আদর্শলাভে ব্যয় করে।

সভাভঙ্গ—রাত্রি ১০টা।

৫

আজও বৈঠক দোতলার পশ্চিমের বড় ঘরে। উপস্থিত আছেন বড় জিতেন, ছোট নলিনী, সুরপতি, যোগেন, রমণী ও সজনী। এখন রাত্রি আটটা। অন্তেবাসী বেদান্ত সোসাইটি হইতে ফিরিয়া দেখিলেন শ্রীম মাদুরে বসিয়া বিদ্যাপীঠের অধ্যক্ষ স্বামী সদ্ভাবানন্দজীর সঙ্গে কথা কহিতেছেন। বিদ্যাপীঠে ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর উৎসব হইয়াছে।

শ্রীম (সাধুর প্রতি)—এখন কেউ মানছে না। কিন্তু success (সাফল্য) হলে বলবে, উনি খুব ভাল। আহা, কত খেটেছে, কত করেছে। কি আর করা যায়, জগতের ধারাই এই। যারা জগতের কল্যাণের জন্য কিছু করে, তাদের এ সব কথা গ্রাহ্য করলে চলে না।

(স্বগত) সাধুরা কি নিজের ইচ্ছায় করছেন এ সব ? গুরুর মুখে শুনেছেন, এ সব কাজে চিত্ত শুদ্ধ হয়, তাই করছেন। তা বলে কি আর বরাবর করবে ?

ঠাকুরের একজন সন্ন্যাসী সন্তানের কথা হইতেছে।

শ্রীম—যেন বালক। অত ভেবে চিন্তে উনি কথা বলতে পারেন না। বেশ স্বভাবটি।

জনৈক ভক্ত—অমুক প্রতিষ্ঠান রামকৃষ্ণ মিশনের অন্তর্ভুক্ত হয়ে কাজ করবে, আজ এই মর্মে সূচনাপত্র পাঠ শোনা গেল।

অপর ভক্ত শরৎ মহারাজের ওখানে সেদিন সব গিছলেন এই জন্য। ঐখানে ঠিক হয়েছে।

শ্রীম (সানন্দে)—বেশ বেশ, বেশ হয়েছে। অত ভাগাভাগি কি ভাল ? একটার ব্রাঞ্চ হওয়াই ভাল।

জনৈক ভক্ত—মঠের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল না বলে অনেকে ওখানে যেতো না।

শ্রীম—মঠের এঁরা যে কৃতী। মঠ এ দেশের কত কাজ করেছে। যাঁরা অনেক সৎকাজ করেন তাঁরা কৃতী। (সহাস্যে) ঠাকুর বলেছিলেন, 'অমুক বাঈজীর নাচ হয়ে গেল, এখন আবার এরা

কেন?' (সকলের হাস্য)। কেশব সেনের কথা লোক যত মনোযোগ দিয়ে শুনতো, ছোকরাদের কথা তত শুনতো কি?

শ্রীকৃষ্ণ যখন কথা বলতেন, তখন pin-drop silence (নিথর নিঃশব্দ) হতো। কেন? না, ইনি যে কৃতী। অনেক সৎকার্য করেছেন। সুভদ্রা হরণের পর যদুবংশের মিটিং হলো। সাত্যকি, বলরাম—এঁরা সব উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতা দিলেন। সভাস্তে মহা গোলমাল। শ্রীকৃষ্ণ যেই দাঁড়ালেন অমনি সব ঠাণ্ডা। তিনি বললেন, 'আচ্ছা, আপনারা তো সৎপাত্র খুঁজছিলেন?' এই কথা বলতেই বলরাম প্রভৃতি ভাবলেন, 'হয়েছে, ইনি ঐ দল নিয়েছেন। আর কিছু হবে না।' তার পর শ্রীকৃষ্ণ আবার বললেন, 'রূপে গুণে, বিদ্যাবুদ্ধিতে, বংশ-মর্যাদায়, নামযশে, বীরত্বে অমন আর কে আছে? আর হরণ করে বিবাহ, এও শাস্ত্রে আছে।' তাঁর কথা শুনে সব ঠাণ্ডা।

এই জন্য মঠের কথা লোক শুনতে চায় বেশী।

এইবার একজন স্বরাজ্য দল বামপন্থী দল অস্পৃশ্যতা-বর্জন, গোহত্যা-নিবারণ—এই সব নানা কথা উত্থাপন করিলেন। যোগেন তাহাতে আহ্লাদে যোগদান করিলেন।

শ্রীম—যোগেনবাবু দেখছি বেশ upto-date (আধুনিক)—সব পলিটিকাল খবরেও আছেন। (সহাস্যে ভক্তদের প্রতি) কেউ কোন কাজ করবে কি না জিজ্ঞাসা করলে ঠাকুর বলতেন, হাঁ, করতে পার এতে যদি ঈশ্বরলাভ হয়।' এই এক কথা। অন্য কোন কথা নাই, অন্য চিন্তা নাই। কিসে ঈশ্বরলাভ হয়, এই এক ভাবনা। যাতে উ-টি হয় তাই করা।

কম কষ্ট গেছে! ঠাকুর থাকতে ডাক্তার ও ঔষধের খরচ চলতো না। কেউ তখন চিনতে পারে নি। রামকে চিনেছিলেন মাত্র বার জন ঋষি। যেই চলে গেছেন ঠাকুর, অমনি কত ঐশ্বর্য হতে লাগলো! তিন লাখ টাকাও মঠের জন্য দেয় এখন। উনি থাকতে কেউ দিত না।

শ্রীম—বিদেশে ঠাকুর সাধুদের পাঠাচ্ছেন কেন? স্বামীজী তার

জবাব দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, আমি যদি এ দেশে বক্তৃতা দিতুম, কেউ শুনতো না। কিন্তু যেই ও দেশের কাগজওয়ালারা আমার বক্তৃতার কথা আলোচনা করতে লাগলো, অমনি এ দেশের সব আমায় মানতে আরম্ভ করলো।'

এত দিন ভারত ইউরোপের আদর্শে চাপা পড়ে গিছলো। ইউরোপীয়ানরা যা করতো, যা খেতো পরতো, সব ভাল, এমনিভাবে hypnotised (অভিভূত) হয়ে গিছলো লোক। যখন দেখলে ওরাই স্বামীজীর বুট বেঁধে দেয়, তখন এ দেশের লোক মনে করতে লাগলো—তা হলে আমাদের মধ্যেও এমন সব লোক আছে দেখছি। আমরা যাদের পূজা করি তারাই তাঁর পূজা করছে।

এই জন্য ঠাকুর সাধুদের ওয়েস্টে (পাশ্চাত্যে) পাঠাচ্ছেন। লোক ইংরেজী আদর্শে অন্ধ। ও দেশে কিছুকাল থেকে এলে এদের কথা শীঘ্র কানে নেবে। এই জন্য পাঠাচ্ছেন।

শ্রীম (সকলের প্রতি)—যারা ঠাকুরের চিন্তা করে, তাঁকে আদর্শ করেছে যারা, তারা কি সামান্য লোক? তারা সর্বোত্তম। কত বড় আদর্শ! ভগবান মানুষ হয়ে এসেছেন, অখণ্ড সচ্চিদানন্দ, বাক্যমনের অতীত যিনি! কত বর্ষ পরে একবার আসেন। তাঁকে আদর্শ করা কি সহজ কথা! ঈশ্বরের কাছে পাণ্ডিত্যাদি কি? চৈতন্যদেবকে প্রকাশানন্দ প্রথমে বেদান্ত পড়তে উপদেশ দেন। চৈতন্যদেব সকলের পিছনে বসেছেন, বললেন, 'আমি হীন অধিকারী জেনে গুরুদেব ভক্তি নিয়ে থাকতে বলেছেন।' কয়দিন পর তাঁরই পায়ে প্রকাশানন্দ গড়াগড়ি দেন, উন্মাদবৎ নৃত্য করে হরিনামে। অবতারকে চেনা যায় না তিনি না চেনালে!

রাত্রি দশটা।

কলিকাতা, ২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯২৩ খ্রীঃ, ১২ই আশ্বিন ১৩৩০ সাল, শনিবার।

নবম অধ্যায়

আদর্শ গৃহী ভক্ত ও আদর্শ সন্ন্যাসী

১

বেলুড় মঠ হইতে একজন বৃদ্ধ সন্ন্যাসী আসিয়াছেন। শ্রীম চারতলার ছাদে তাঁহার সহিত আনন্দে কথা কহিতেছেন।

এখন সন্ধ্যা পৌনে সাতটা। আজ ১লা অক্টোবর ১৯২৩ খ্রীঃ, ১৪ই আশ্বিন ১৩৩০ সাল, সোমবার। নলিনী, যোগেন, সুরেন ও জগবন্ধু রহিয়াছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—ইনি মঠে থাকেন। মঠ কেমন? না, মরুভূমিতে যেন oasis (মরূদ্যান)। মরুভূমিতে ধূ ধূ করছে বালুকারাশি, কোথাও কিছু নেই। পথিক ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত হয়ে মৃতপ্রায়। অমনি ঐটি দেখে সেখানে গেল। আহা, কি সুন্দর জল আর চার দিকে সবুজ বৃক্ষসমূহ! আবার তাতে রসাল ফল! খেয়ে তৃপ্ত হলো, প্রাণ বাঁচলো। মঠও সংসার-মরুতে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে 'ওয়েসিসের' (মরূদ্যানের) ন্যায়। সংসারের ত্রিতাপ জ্বালায় জ্বলে পুড়ে লোক মঠে যায় শান্তির জন্য। সংসারী লোকের শান্তির জন্য ভগবান এই জন্য মঠ সাধু এ সবের সৃষ্টি করেছেন। মঠ যেন মরুভূমিতে ওয়েসিস্।

শ্রীম (সকলের প্রতি)—আমার বয়স তখন সতের-আঠার। এক 'ফ্রেণ্ডের' (বন্ধুর) সঙ্গে কাশী যাই। তার ঠাকুরদাদা কাশীবাস করেন —আশির উপর বয়স। একটি বিধবা কন্যা রান্নাবান্না করে, সেবা করে। আমরা যেতেই কত আদরযত্ন—বেশ খাওয়ালে দাওয়ালে। তারপর বৃদ্ধ বলছেন, 'দেখ্ হরি তুই বলে দিস—খবরদার যেন আমার নিকট বাড়ী থেকে চিঠিপত্র না আসে। সব ছেড়ে এখানে এলুম তাঁর নাম করতে। এখন তাঁর নাম করবো কি বাড়ীর কথা ভাববো?

আজ চিঠি, অমুকের অসুখ। কাল চিঠি, এ বিষয়ে আপনার মত কি? এই সব। বলে দিস্ যেন চিঠি না আসে আর।' আমি শুনে কাঁপতে লাগলুম, ভাবছি, লোকটা কি নিষ্ঠুর। কিন্তু পরে with added experience growing a little wiser (অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অধিকতর বুদ্ধিমান হয়ে) দেখলাম, কি খাঁটি কথা বলেছিলেন বৃদ্ধ। এঁরা মহাপুরুষ লোক।

শ্রীম (সন্ন্যাসীর প্রতি)—ঠাকুরের বয়স তখন পঁচিশ ছাব্বিশ। দক্ষিণেশ্বরে আছেন, অনেক সাধু আসা যাওয়া করেন। তোতাপুরী আসার পূর্বে। তাঁরই মুখে শোনা কথা। পঞ্চবটীতে তখন একটি সাধু থাকতেন—গোপালের সেবা করেন। ঠাকুর তাঁর কাছে যেতেন, তাঁর উপদেশ শুনতেন। আর সেবা করতেন—এই জলটল তুলে দিতেন। তিন দিন সেবা করেই আর যান না। সাধু বললেন, 'কেয়া, তুম্ আতা নেহি কেঁউ?' ঠাকুর উত্তর করলেন, 'এই যে এসেছিলাম তিন দিনের জন্য; তিন দিন তো হয়ে গেছে। আর কেন করবো?' 'তিন দিন' মানে গুরু সেবা তিন দিন করলেন। 'আর যান নি মানে', ওরা বড় একঘেয়ে। যে ভাবটি নিয়ে আছে সেটির বাইরে যাবে না। ওদের খণ্ড সাধনা—fragmentary worship, অখণ্ড সাধন নেই তাঁদের। তারই জন্য ঠাকুর তিন দিন মাত্র গিছলেন। 'আল্লা' মন্ত্রও তিন দিন জপ করেছিলেন। তিনি সব পথের খবর নিয়েছেন।

রাখাল মহারাজের ভায়রাভাই ছিলেন একজন—নারকেলডাঙ্গায় বাড়ী। তাঁর ছেলেরা সব এম. এ.-টেমে পাশ। ইনি সন্ন্যাস নিয়ে কাশীতে ছিলেন সেবাশ্রমে। বাড়ী থেকে টাকা যেতো। তিনি কুকারে রান্না করে খেতেন। টাকা যা যেতো তা অন্য কাজে ব্যয় হয় নি। শুধু খাওয়াতে যা লাগে ততটা নিতেন। তারপর ওখানেই দেহ গেল। কত সব মহৎ লোক আছেন এমন!

আমাদের পাড়ায় বিধুবাবু (বসু) ছিলেন। তাঁর ছেলেরাও খুব বড় মাইনে পেতো। কেউ বিলেত গিয়েছে—এম. এ. পাশ।

এই সব ছেড়ে তিনি কাশী চলে গেলেন। নাতনীর বিয়েতে বাড়ী আসবার জন্য লেখা হলো। তিনি উত্তর দিলেন, 'এসে কি হবে? আমি আশীর্বাদ করছি, তোমরা সকলে আনন্দে থাক।' আর এলেন না। কি করতেনই বা এসে? তার চাইতে না আসাই ভাল। আর ওরা সব সুখে থাকুক—এই আসল আশীর্বাদ। তা তো করেছেনই। এলে আরো অসুবিধা হয়তো হতো। এমন সব মহাপুরুষের কথা শোনা যায়।

সন্ন্যাসী—কাশীতে মরলে নাকি শিবত্বপ্রাপ্তি হয়?

শ্রীম—ঠাকুর বলতেন, তিনি দেখেছিলেন, শিব মুমূর্ষুদের কানে তারকব্রহ্ম নাম শোনাচ্ছেন। ঠিক ঠিক সন্ন্যাসী, শুধু পোশাকে নয়, তিনি যেখানেই দেহত্যাগ করুন, ভগবান দর্শন দেবেন।

সন্ন্যাস কি সোজা কথা! আগে নিয়ম ছিল, নিরুদ্দেশ হয়ে থাকতে হবে বার বছর। ঠাকুরের কাছে একজন যেতো, পরে সন্ন্যাসও হলো। হরিদ্বারের দিকে দু'বছর ঘুরে ফিরে কলকাতায় এলো। বেলুড় মঠে ছিল। মাঝে মাঝে এক একদিন বাড়ী আসতো। আমাদের তখনই ভয় হয়েছিল! ওমা! শেষে গেরুয়া ত্যাগ করে সাদা কাপড় পরলো। আগের ছিল দু'টি ছেলে, তারপর আট জন হলো (সকলের উচ্চ হাস্য)। (সকলের প্রতি) ও হাসবার কথা নয়! উনি নিজে খুব ভাল মানুষ। এতে কি হাসতে আছে? ঠাকুর লোকশিক্ষার জন্য অমন করালেন। সন্ন্যাস কি সোজা কথা! মনের সব বাসনা গেলে সন্ন্যাস হয়।

আলমবাজার মঠ থেকে দু'জন সন্ন্যাস নিলে। অনেক ঘুরে ঘুরে একজন বন দেখে ভয় পেল। প্রাণের মায়া—ভ্যাক্ করে কেঁদে ফেললে আর সঙ্গীকে বলতে লাগলো, 'আমার যে বাপ মা আছে।' জনমানবশূন্য বনের ভিতর দিয়ে পথ। তার উপর ক্লান্ত, হাঁটতেও পারছে না। শেষে কাশী গেল। সেখান থেকে বাড়ী ফিরে এলো। অনেক ছেলেমেয়ে হলো। আফিসে কর্মও হয়েছিল।

ঠাকুর বলেছিলেন, 'বাসনা—যেমন ভাঁড়ে ঘি, লুকিয়ে থাকে।'

একজনের একটা ঘিয়ের ভাণ্ড ছিল। ঘি ফুরিয়ে গেছে। আর একজনের একটু ঘিয়ের দরকার। সে ঘি চাইলে অপর ব্যক্তি বললে, নেই। সে বললে, রোদে দাও ভাঁড়টা। অমনি কলকল করে এক পোয়া ঘি বের হয়ে এলো। বাসনাও এমনি—শুকিয়ে থাকে, লুকিয়ে থাকে। 'রোদ' পেলে, মানে বিষয়ের সঙ্গে সংযোগ হলে, তখন বেরিয়ে আসে। তবে তপস্যা করলে জ্ঞানাগ্নি উৎপন্ন হয়, তাতে সব ভস্ম হয়ে যায়।

২

এতক্ষণ শ্রীম সন্ন্যাসের কঠোর দিক প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রোতৃমণ্ডলীর কাহারো কাহারো কাম্য সন্ন্যাস। পাছে আদর্শে তাহারা হতাদর হয় সেই জন্য বর্তমান সময়ের উপযোগী সন্ন্যাসের সহজ সরল চিত্র অঙ্কিত করিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—আগেকার সন্ন্যাসের বড় কড়াকড়ি নিয়ম ছিল, তাতে বরং ভয় ছিল। আহার বাসস্থানের চিন্তা ছিল। এখনকার সন্ন্যাস আর কি—যেমন বোর্ডিং হাউসে থাকে না লোক, তেমনি থাকা। স্কুল কলেজের বোর্ডিং-এ থাকার মত। আবার দু'পয়সা খরচ করলে বাড়ীর খবরও পাওয়া যায়। আর, বিয়ে করে না, এই যা। তা এমন অসংখ্য লোক আছে যারা বিয়ে করে না। এ কি আর বড় কথা! তাদের সংখ্যা নেহাত কম নয়—as plenty as blackberries (কালজামের মত প্রচুর)। অথবা যেমন 'from the blue bed to the brown'—এ ঘর থেকে সে ঘরে যাওয়া। 'ভিকার অব ওয়েকফিল্ডে' আছে। কত মঠ রয়েছে তার একটাতে থাক, খাওয়াপরার ভাবনা নেই।

মোহন—পূর্ববঙ্গের একজন শিক্ষিত সাধু মঠে সন্ন্যাসের পর কলকাতায় এক বন্ধুর বাড়ীতে গিছলেন নিমন্ত্রিত হয়ে। থালায় কত রকম সব খাবার দেওয়া হলো—প্রায় কিছুই খেলেন না। মাত্র দু'একটি ফল তুলে নিলেন।

শ্রীম—আহা, কি serious (ব্যাকুল) সন্ন্যাসী! এইজন্য সাধুসঙ্গের দরকার। এই দেখে যা শিক্ষা হল, লাখ লেকচারেও তা হবে না। এইটি ভাবতে ভাবতে অপরেও এরূপ হবে।

মোহন—মঠে আর একজন সাধু আছেন। ইনিও পূর্ববঙ্গের লোক। তাঁর আত্মীয়দের প্রভূত সম্পত্তি আছে, কিন্তু কিছুতেই আটকে রাখতে পারলো না।

শ্রীম—পূর্ববঙ্গ আজকাল খুব। মঠের প্রায় সাধুই ও-দেশের। কত serious (ব্যাকুল) সাধু। পশ্চিমবঙ্গের এঁদের একটু ভয় আছে।

ভারতবর্ষ পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ, এ কথা আজকাল অনেকেই স্বীকার করছে। ভারতের লোক আবার বাংলার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে। কাজেই বাংলা দেশ পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান। তা না হলে তিনজন অবতার এখানে আসেন—বুদ্ধ, চৈতন্য আর শ্রীরামকৃষ্ণ।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—বাড়ীর কাছে থাকলেই যত গণ্ডগোল। শরীর অসুখ হলো, হয়তো দাঁত একটু কন্‌কন্ করছে. অমনি মনে হয় কয়দিন গিয়ে থেকে আসা যাক্—একটু ভাল হলেই চলে আসবো। একবার গেলেই সর্বনাশ। এই ইনি (সন্ন্যাসী) যেমন বলেন, একবার যাবার ইচ্ছা হয়েছিল।

সন্ন্যাসী (সহাস্যে)—আজ্ঞে হাঁ। আমাশয়ে ভুগে ভুগে একবার ইচ্ছা হয়েছিল।

শ্রীম (সন্ন্যাসীর প্রতি)—কঠোপনিষদের কথা শুনেছেন তো?

সন্ন্যাসী (মাথা নেড়ে)—শুনেছি।

শ্রীম—শুনতে পাই সেখানে নচিকেতার কথা আছে। তিন দিনের উপোসী নচিকেতা। পণ করেছে, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ না হলে এ দেহ রাখবে না—এমনই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। ছেলেমানুষ, বার বছর বয়েস। যম বললেন, 'তুমি অতিথি ব্রহ্মচারী, উপবাস থাকবে, খাও।' নচিকেতা জবাব দিল, 'এ শরীর তো থাকবে না, খেয়ে কি হবে? ব্রহ্মজ্ঞান চাই।' যম হার মেনে বললেন, 'তুমি যথার্থ পাত্র।' প্রথমে প্রেয় বস্তুর লোভ দেখালেন, কামিনী কাঞ্চনের লোভ—গাড়ী, ঘোড়া,

রাজ্য, সুন্দরী স্ত্রী, পুত্রাদির। কিন্তু তাকে কিছুতেই ফেলতে পারলেন না। শেষে যম বললেন, 'বাবা, তুমি যা করেছ তাই ঠিক।' প্রেয় নিলে না কিছুতেই, 'শ্রেয়' অর্থাৎ ভগবানকে চাইলে। ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হলো।

মহামায়ার এমনি মায়া! একবার নিচে যেতে শুরু করলে, একেবারে তলিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত, জানতে দেয় না কোথায় এলো। ঠাকুর বলতেন, যেমন কলমবাড়া পথ, অর্থাৎ sloping, কেল্লায় নামবার সময় বোঝা যায় না। অনেক নেমে গেলে তখন তিনতলা বাড়ী দেখা যায়। তখন বুঝতে পারে কত নেমেছে।

দুর্গাপদ মিত্র (হিলিংবাম) ৺পুরী দর্শন করিতে গিয়াছেন। ইনি ভুবনেশ্বর মঠ হইতে পত্র দিয়াছেন। উহা পাঠ হইল। এইবার পুরী, ভুবনেশ্বর, গয়া প্রভৃতি তীর্থের কথা হইতেছে। তারপর ঠাকুরের নামের প্রসঙ্গ আসিল।

জগবন্ধু (শ্রীমর প্রতি)—ঠাকুরের নাম 'রামকৃষ্ণ' কি করে হলো?

শ্রীম—বাড়ীতেই দেওয়া নাম বলে আমাদের মনে হয়। বাড়ীর সকলের নামেই প্রায় 'রাম' আছে—রামকুমার, রামেশ্বর, রামকৃষ্ণ। তাঁদের ছেলেরা, রামলাল, শিবরাম। হলধারী ঠাকুরের খুড়তুতো ভাই। বড় ছিলেন তাই দাদা বলে ডাকতেন। রাণী রাসমণি কালীবাড়ীর রেজেস্ট্রি দলিলে 'রামকৃষ্ণ' নাম উল্লেখ করেছেন। তোতাপুরী তখনও আসেন নাই। বাংলায় একজনের কয়েকটা নামও থাকে।

ঠাকুরের দু'টি বোন ছিল। একটির নাম কাত্যায়নী আর একটির নাম সর্বমঙ্গলা। সর্বমঙ্গলাকে বড় ভালবাসতেন ঠাকুর। ইনিই ভাই-বোনদের ভেতর ছোট। এঁর এলোমেলো স্বভাব ছিল ওঁদের মায়ের মত। (সহাস্যে) ঠাকুর বলেছিলেন, কাত্যায়নীর জামাইয়ের স্বভাব ভাল ছিল না। ঘুরে ফিরে বেড়াত। একবার জামাই কামার পুকুরে এসেছে। ঠাকুরের মা অতি সরল। দেখেই বললেন, 'কি বাছা, পাখা বুঝি ভেঙ্গে গেছে, উড়তে পারছ না?' টাকাকড়ি নাই,

আমোদ-প্রমোদ হচ্ছে না। কাত্যায়নী শুনে ভাইয়ের বউকে বললেন, 'দেখ তো মায়ের আক্কেল! এইমাত্র এলো, আর এই সব কথা শোনাচ্ছে। হয়তো এক্ষুণি চলে যাবে।' হাসতে হাসতে ঠাকুর কখনও কখনও এ সব গল্প করতেন।

কাশীপুরের বাগানে ঠাকুরের অত অসুখ, তবুও রামলালদাদাকে বলছেন, ওদের খবর নিস্ রে রামলাল (বোনের ছেলেপুলেদের)। নয় তো ওরা বলবে, আমাদের মামার বাড়ীতে কেউ নেই। পূজোর সময় এক একখানা কাপড় দিস্।

অত অসুখ তবুও জিজ্ঞাসা করছেন, ঐ কুল গাছটায় কুল হচ্ছে তো? তিনি ঐ বাড়ী কেন রেখেছেন? একি আর মায়ার বাড়ী! ওখানকার একটি ধূলিকণা মাথায় পড়লে উদ্ধার হয়ে যাবে, সেইজন্য এই বাড়ী রেখেছেন। আবার রঘুবীরের সেবা আছে।

ঠাকুরকে হৃদয় মুখুয্যের মা চিনতে পেরেছিলেন। তিনি বড় বোন ছিলেন—পিসতুত। ঠাকুর নিজের বুক দেখিয়ে বলতেন, এর ভেতর কি আছে দিদি জানতেন। হৃদয়ের মা পায়ে ফুল দিয়ে ঠাকুরকে পূজো করেছিলেন, বড় বোন তবুও। তখনই ঠাকুর নিজের বুকে হাত দিয়ে দেখিয়ে বলেছিলেন, দেখ এর ভেতর যিনি আছেন তিনি বলছেন, তুমি কাশীতে গিয়ে দেহত্যাগ করবে। তাই হয়েছিল। কাশী এমন স্থান! (সন্ন্যাসীর প্রতি) দেখলেন, কাশীতে দেহত্যাগের কথা ঠাকুর বললেন। এমনি মহিমা কাশীর।

এখন রাত্রি প্রায় নয়টা। ডাক্তার কার্তিক বক্সী আসিয়াছেন। তিনি আজ মঠ ও দক্ষিণেশ্বরে গিয়াছিলেন। সেই সব তীর্থের কথা হইতেছে।

শ্রীম (ডাক্তারের প্রতি)—কালীবাড়ীতে রৌশনচৌকী আর কীর্তনটি হলে বড় ভাল হয়। কিরণবাবু নেওয়ায় যেন আমাদেরই হলো। আহা, সকলের মুখেই ঐ কথা। ভক্তরা খুব আনন্দ করছে। আমাদেরই ইচ্ছা, ঐ রৌশনচৌকীটি দেখে একবার বাইরে বেড়াতে যাই। কিন্তু ঐটি দেখে। ঠাকুর কিরণবাবুর দ্বারা কত কাজ

করাচ্ছেন। তাঁর কত তপস্যা ছিল, তবেই তো কালীবাড়ী ম্যানেজ করবার ভার পেয়েছেন। আমরা প্রার্থনা করছি, তিনি বহুকাল ধরে সুস্থ শরীরে মায়ের সেবা করুন। আলোগুলি দিলে বেশ হয়। রসো না, দেখবে তিনি কি করেন। কিরণবাবু কবি তাতে আবার ভক্ত। সব চমৎকার সাজাবে। ভক্ত না হলে কি হয়। অতদিন যারা ছিল তাদের কি দায় পড়েছে? নিজেদের হলেই হলো।

যোগেন—আজ্ঞে, এখন আমার একটি থাকবার স্থান ওখানে করে নিতে পারলেই হলো।

শ্রীম—না না, এখন বিরক্ত করবেন না। একবার ঠিক হয়ে কিরণবাবু বসুন। তারপর সব হবে ক্রমে। কিরণবাবুর সাধুসঙ্গ কত! নিজের বাড়ী যেন সাধুদেরই স্থান। সুধীর মহারাজ, কপিল মহারাজ—এঁরাই প্রায় থাকেন ওখানে। আর খুব গম্ভীর লোক। আমাদের মনে হয় আমাদেরই হয়ে গেল কিরণবাবু নেওয়ায়।

ডাক্তার বক্সী—আপনার এই কথা মহাপুরুষ মহারাজকে বলায় তিনি বললেন, 'তা বই কি! আমাদেরই হলো। মায়ের সেবার কি কষ্টটাই হতো! মাকে এতদিন বলতাম, মা তুমি এখানে বেলুড়ে খেয়ে দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে শোও'।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—আপনারা এখন যেতে পারেন দক্ষিণেশ্বর, যেমন মঠে যাচ্ছেন daily (রোজ)। কিন্তু রৌশনচৌকী আগে চাই।

ডাক্তার—সপ্তাহে একদিন হবে।

শ্রীম—ভক্তরা গেলে জাগে। ভক্তে তিনি বেশী প্রকাশ। ঠাকুর বলতেন, 'কুঁড়ো ফেল মাছ আসবে'—গভীর জল থেকে রক্তবর্ণ চক্ষু বড় রুই মাছ অর্থাৎ ভগবানদর্শন হবে। ভক্তের আকর্ষণে ভগবান জাগ্রত হন।

এইমাত্র অমৃত ও বিনয় আসিলেন।

রামচন্দ্র দত্ত লিখিত শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের জীবনবৃত্তান্ত আজও পাঠ হইতেছে। 'টাকা মাটি, মাটি টাকা', 'কামিনীকাঞ্চনই

সংসার'—ঠাকুরের এই সব মহাকাব্যের ব্যাখ্যা চলিতেছে। এখন রাত্রি দশটা।

৩

বেলেঘাটার বিশিষ্ট ভক্ত শুকলাল ও মনোরঞ্জন কয়েকদিন হয় শ্রীমর কাছে আসেন না। ইঁহারা প্রায় নিত্য আসিয়া থাকেন। শ্রীম তাই তাঁহাদের সংবাদের জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন। অপরাহ্নে তাঁহাদের সংবাদ লইতে অন্তেবাসীকে পাঠাইয়া দিলেন। তিনি উঁহাদের লইয়া গাড়ী করিয়া আসিয়াছেন। এখন সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা।

আজ ২রা অক্টোবর, ১৯২৩ খ্রীঃ, ১৫ই আশ্বিন, ১৩৩০ সাল, মঙ্গলবার।

শ্রীম দোতলার ঘরে বসিয়া আছেন। নিকটে যোগেন ও অপর একজন আছেন। বেলেঘাটার ভক্তদের দেখিয়াই বলিতেছেন—

শ্রীম (সকলের প্রতি)—(কথামৃতের) প্রুফ দেখতে দেখতে একটি নূতন লাইন পেলাম আজ। এত দিন চাপা পড়ে ছিল। Question (প্রশ্ন) হচ্ছে—কি কর্মে তাঁকে পাওয়া যায়? ঠাকুর বলছেন, জপ ধ্যান ইত্যাদি অনেক কর্ম আছে। নিষ্কাম হয়ে করলে এতে তাঁকে পাওয়া যায়। কিন্তু আর একটি আছে, গুরু যে কর্ম করতে বলেছেন সেই কর্মে তাঁকে লাভ হয়।

এই কথাটি পড়েই যদুপতি বাবুর কথা স্মরণ হলো। ভবানীপুরে বাড়ী, অনেক সম্পত্তি। নানান্‌খানা ভেবে ভেবে শেষে পাগল হয়ে গেল। অনেক কর্মে জড়িয়েছিল। ভাইরা লোক রেখে দিছল দেখতে। নিজের বুদ্ধিতে করতে গেলেই এই রকম।

তাই গুরুবাক্য শুনতে হয়। এই যে ভবসমুদ্র, এ পার হওয়া কি নিজের সাধ্য! তার জন্যই গুরু। গুরু পথ বলে দিয়েছেন। নিজের বুদ্ধিতে কুলোয় না। বুঝলেন বীরেনবাবু!

শ্রীম সম্বোধন করিলেন বীরেনকে কিন্তু লক্ষ্য শুকলালের উপরও। বীরেন কলিকাতা হাইকোর্টের এটর্নি, বাল্যাবধি শ্রীমর

বিশেষ অনুগত—বয়স ত্রিশের উপর। আর শুকলাল বিত্তশালী লোক, অনেক কাররার, জমিদার। বয়স পঞ্চাশের উপর, স্থূলকায়।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—একজন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে গেছেন। জিজ্ঞেস করছেন, 'মশাই উপায় কি'? Ready answer (তৎক্ষণাৎ উত্তর করলেন) 'গুরুবাক্যে বিশ্বাস'। বলতেন, 'ওগুলো অত ভেবো না'। 'For after all these things do the Gentiles seek.' 'But seek ye first the Kingdom of God.'

ঈশান মুখুয্যেকে বলেছিলেন, ও সব ছাড় শালিশী-টালিশী। ঈশান মুখুয্যে একদিন বললেন, 'সবই তো এঁর (ঠাকুরের) ইচ্ছায় হয়।' ঠাকুর তৎক্ষণাৎ তেমনি জোরে বললেন, 'এঁর না, এঁর মায়ার'।

অমৃত (দৃঢ়ভাবে)—আজ্ঞে যাই বলুন, সবই গুরুর ইচ্ছায় হয়।

শ্রীম (অধিকতর দৃঢ়ভাবে)—তা হয়। কিন্তু আবার নিজের বুদ্ধিতে করতে গেলেই যত মুশকিল।

মন মুখ এক করে, সবই গুরুর ইচ্ছায় হয়—এ কথা বলা অনেক দূরের কথা। মনে আছে নিজের ইচ্ছা, আর মুখে বলা গুরুর ইচ্ছা—এতে হয় না। যতদিন না মন মুখ এক হচ্ছে—ততদিন গুরুবাক্যে বিশ্বাস করে তা পালন করতে চেষ্টা করা উচিত, আর প্রার্থনা—প্রভো, আমায় গুরুবাক্য পালন করবার শক্তি দাও।

প্রভু জগদ্বন্ধুর ভক্তগণ আমহার্স্ট স্ট্রীট দিয়া নগরসংকীর্তন করিয়া দক্ষিণ দিকে যাইতেছেন। একটি ভক্ত উহা দেখিয়া শ্রীমকে আসিয়া বলিলেন। শ্রীম রাস্তায় দোতলার বারান্দায় দাঁড়াইয়া দর্শন করিতেছেন। ভক্তগণ করতাল সংযোগে গাহিতেছেন—'হরিবোল হরিবোল জয় জগদ্বন্ধু বল।'

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—করবে না, তিনিই তো সব গুরুরূপে ছড়িয়ে আছেন। হবে না (নানা সম্প্রদায়)। তোমার কাছে ভাল লাগে না বলে কি তাদের কাছেও ভাল লাগবে না? সকলেই একজনকে ডাকছে। নিজের মতের সঙ্গে না মিললেই কি মিথ্যা হয়ে যাবে সব? সব বাড়ীতেই বলে, আমার মায়ের যা আদর

এমনটি আর কোথাও নাই। এ-বাড়ীতে সে-বাড়ীতে সকলেই এই কথা বলে। অর্থাৎ যার যারটি, তার তার নিকট খুব ভাল। তা বলে অন্যটি খারাপ, তা নয়। আর নাক সিঁটকালে হবে না। তারা প্রভু জগদ্বন্ধুর কাছে বসেছে, অত আদর পেয়েছে। বলবে না জয় জগদ্বন্ধু? তারা কি আর ভুল বলে? সবই সত্য। যার যেমন আধার ততটুকু সে পায়। স্কোয়ার পাত্রে জলের আকার স্কোয়ার। আবার রম্বাস্, রেক্টেঙ্গুলার—যেমন আধার তেমনি আকার। ততটুকুই ধরে। কারো দোষ নাই এতে।

যিনি শ্রীমকে ডাকিয়া আনিয়া এই দৃশ্য দেখাইয়াছেন তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়াই যেন এই কথাগুলি বলিলেন। তাঁহার ভিতর কি কোন বিদ্বেষ ভাব প্রচ্ছন্ন ছিল? ভক্তটি বুঝি ভাবিতেছেন শ্রীমর মহামূল্য উপদেশ—সকলেই একজনকে ডাকছে।

৪

পরদিন শ্রীম ঐ ঘরেই বসিয়া আছেন। কাছেই যোগেন, মণি প্রভৃতি ভক্তগণ বসিয়া আছেন। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা। বেদান্ত সোসাইটি হইতে জগবন্ধু ফিরিয়া আসিয়াছেন। অল্পক্ষণ মধ্যে স্বামী সদ্ভাবানন্দ, ছোট নলিনী, বিরিঞ্চি কবিরাজ, বড় জিতেন, মনোরঞ্জন, বিনয় ও ডাক্তার আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

সদ্ভাবানন্দজীর সঙ্গে 'বিদ্যাপীঠে'র কথা হইতেছে। দেওঘরের নূতন জমির দানপত্র রেজিষ্ট্রিতে একটু প্রতিবন্ধক পড়িয়াছে। ইনি বিরক্ত ও ক্লান্ত হইয়া গিয়াছেন। হতাশভাবে শ্রীমর সহিত এই সব কথা কহিতেছেন। শ্রীম তাঁহাকে নানা ভাবে বুঝাইয়া উদ্দীপ্ত করিতেছেন।

শ্রীম (স্বামী সদ্ভাবানন্দের প্রতি)—এ সব আর বেশী কি? এরই নাম কর্মকাণ্ড। বাধাবিঘ্নের জন্য পূর্ব থেকেই প্রস্তুত হয়ে থাকা উচিত। different (বিভিন্ন) প্রকৃতির সহিত deal (ব্যবহার) করতে হয় কিনা! পরোপকার, সেবা এসব কি মুখের কথা?

এই সব প্রতিবন্ধক ভালর জন্যই হয়। এতে নিজের মান অভিমান চূর্ণ হয়। তখন যথার্থ নিষ্কাম ভাব জাগ্রত হয়। করতে গেলে এই সব বাধাবিঘ্ন না করেও থাকতে পারা যায় না—এই অবস্থাতেই ঠিক সেবার ভাব আসে। অনাসক্ত হয়ে তখন করে। তাই গীতায় ভগবান বলেছেন, 'আরুরুক্ষোমুনের্যোগং কর্মকারণমুচ্যতে।' এইরূপে কাজ করতে করতে চিত্ত শুদ্ধ হলে তাঁতে মন যায় তখন—'শমঃ কারণম্ উচ্যতে'। তখনও কাজ করে তাতে অত বিচলিত হয় না মন। আগে থেকেই প্রস্তুত থাকে সব বাধাবিঘ্নের জন্য। তাঁর নাম নিয়ে, তাঁতে মন যুক্ত রেখে, প্রাণপণ করে যায়। লাভ হোক বা লোকসান হোক, সে দিকে অত খেয়াল থাকে না। খেয়াল থাকে তাঁর উপর।

তুমি ওদের কাছে মোটেই গেলে না, কথা কইলে না।··· ··· ওদের কাছে বস, কথা কও, পান তামাক খরচ কর (হাস্য)। ওতে দোষ নেই, সাধু সাধুকে বলবে এতে দোষ নেই। স্বার্থের জন্য করলে দোষ হয়। এখানে তো সে সব বালাই নেই। বিত্তেসাগর মশায় বলতেন, 'ভাই ভাই ঝগড়া করে কেউ কারো সঙ্গে কথা কইবে না, এ কি?' ওদের বুঝিয়ে বল। ওদের হয়তো idea (ধারণা) নেই কত কষ্টে এ জমিটি যোগাড় করেছ। এদের বললে দোষ নেই যেমন হিন্‌চে শাক শাকের মধ্যে নয়। শরীর ক্লান্ত হয়ে পড়েছে খেটে খেটে। কিছুদিন বিশ্রাম কর। তারপর না হয় আবার চেষ্টা কর। যারা জমি দিচ্ছে তাদের বল কয়দিন পর রেজিস্ট্রি হবে। এখন একটু অসুবিধা আছে।

কাজ করতে হয় নিজেকে অকর্তা জেনে কর্তার মত—রজোগুণের পোশাক গায়ে দিয়ে। অনেকেই সত্ত্বগুণ বুঝতে পারে না। রজোগুণের আবরণ তাই দরকার। এলাহাবাদে একজন খুব ভাল উকীল ছিলেন, খুব স্কলার। কিন্তু self-assertiveness (প্রভুত্বপরায়ণতা) নাই বলে হাইকোর্টের জজ হতে পারলেন না। Individuality (ব্যক্তিত্ব) একটু থাকা ভাল। কত কাণ্ড করে এ কাজটি (বিত্তাপীঠ)

করেছ। এখন এইটুকুতে মন খারাপ করো না। চেষ্টা কর—(জমি রেজিস্ট্রি) হয়ে যাবে। এ তো ঘরের কথা।

শ্রীম ও ভক্তগণ গাহিতেছেন—"গুরুপদ ভরসা কর" ইত্যাদি। রাত্রি দশটা।

৫

এখন সন্ধ্যা সাতটা। দোতলার সিঁড়ির ডানদিকের ঘরে শ্রীম পূর্বাস্য বসিয়া আছেন মাদুরে। পাশে অন্তেবাসী। শ্রীম একা আগমনী গাহিতেছেন, অন্তেবাসীও পরে যোগদান করিলেন।

গান। এবার আমার উমা এলে আর উমা পাঠাবো না।
বলে বলুক লোকে মন্দ কারো কথা শুনবো না॥
যদি আসেন মৃত্যুঞ্জয় উমা নেবার কথা কয়।
মায়ে ঝিয়ে করবো ঝগড়া জামাই বলে মানবো না॥

গান। জীবনবল্লভ তুমি দীন শরণ হে।
প্রাণের প্রাণ তুমি ও প্রাণরমণ হে॥
সদানন্দ শিব তুমি শঙ্কর শোভন।
সুন্দর যোগীজন চিত বিমোহন॥

এইবার মণি, যোগেন, বীরেন আর বৌবাজারের দুই তিনজন ভক্ত গৃহে প্রবেশ করিলেন। অল্পক্ষণ মধ্যে অমৃত, বড় জিতেন ও রমণী আসিলেন—তারপরই ডাক্তার ও বিনয় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীম ঈশ্বরীয় কথা আরম্ভ করিলেন।

শ্রীম (যুবকের প্রতি)—আমরা ঠাকুরের একটি গুহ্য কথা ভাবছিলাম। একদিন অনেকগুলি ভক্ত বসে আছে। হঠাৎ ঠাকুর বললেন, চৌদ্দ সের বীর্য বেরিয়ে যাওয়া বরং ভাল তবুও স্ত্রীসঙ্গ না হয়, ছেলে না হয়।

আবার বলেছিলেন, ও-দেশে (কামারপুকুরে) লাহাদের বাড়ীতে জমিদারী থেকে গুড়ের নাগরী আসে। সারাবছর চলে ঐ গুড়ে। নাগরীর নিচে ফুটো করে দেয়, তার নিচে মাটিতে একটা গামলা

বসিয়ে রাখে। সব রস ওতে পড়ে যায়। বাকীটা মিছরী হয়ে থাকে কলসীতে। তেমনি, বেরিয়ে যায় যাক্ বীর্য। তাঁর দিকে মন থাকলে ওতে কিছু হয় না। যা থাকে মিছরী। আর ও-সব অন্নের দোষে হয়। কিন্তু স্বেচ্ছায় তা নয়—স্বপ্নেটপ্নে হয় হোক। স্ত্রীসঙ্গ না হয়।

এই অমূল্য উপদেশটি দুই ক্লাস ভক্তের জন্য দিয়েছিলেন। অন্তরঙ্গ না হলে এ সব কথা বলতেন না। প্রথম, যারা মোটেই বিয়ে করে নি। আর দ্বিতীয়, যাদের দুই একটি সন্তান হয়ে গেছে। তার পর ভাইবোনের মত সংযমী হয়ে থাকে। মনে কর, অনেকেরই তো স্ত্রীপুত্রের সঙ্গে থাকতে হয়, তাদের বলতেন এইভাবে ব্রহ্মচর্য পালন করতে। বলতেন, ভয় নেই। মায়ের নাম কর। মায়ের পাদপদ্মে মন থাকলেই হলো। আর কিছু করতে হবে না। তিনিই রক্ষা করবেন।

ছেলেপুলে হলে তার প্রতিপালন, শিক্ষা আছে। মেয়ের বিয়ে দিয়েও রেহাই নাই—শ্বশুরবাড়ীর সব খবর রাখতে হয়। স্নেহের এমনি আকর্ষণ। তা হলে মন ভগবানে যাবে কি করে? যে মন তাঁকে দিতে হবে সেই মন যাবে সন্তানে। তাহলে আর কি করে ভগবান দর্শন হবে? এই দুর্লভ মনুষ্যজন্মে কেবল হয়। এ সব কথা যাকে তাকে বলতেন না। নিজ অন্তরঙ্গদের শুধু বলতেন—যাদের জগদম্বা তাঁর কাছে এনেছিলেন। তাদের ঈশ্বরদর্শন করিয়ে জগতের কল্যাণে লাগাবেন কিনা, তাই তাদের জন্য অত ভাবনা। তারা সব যে জগতের কল্যাণের জন্য এসেছে।

শ্রীম (বড় জিতেনের প্রতি)—অনেকে ডাক্তারের নিকট উপদেশ আনতে যায়। ওরা হয় তো বলবে, স্ত্রীসঙ্গ কর, অমন pollution (স্বপ্নদোষ) যখন হচ্ছে। কিংবা বিয়ে করতে বলবে। (ডাক্তার বক্সীর প্রতি) কি বলেন, ডাক্তারবাবু?

ডাক্তার—আজ্ঞে হাঁ। আমাদের মেডিকেল সায়েন্সটা হয়েছেই শরীরটা নিয়ে। এর উপরের দৃষ্টি নাই এর। শরীরটা যাতে ভাল

থাকে সেই ভাবনা। আত্মা, ঈশ্বর, মুক্তি, পরমানন্দলাভ—এ সব কথা, ভাবনা নাই এতে।

শ্রীম—তাহলে আর কি করে তাদের কথা সকলে শুনবে! যারা শুধু দেহসুখ নিয়ে ব্যস্ত তারা শুনুক। ভক্তরা কতকটা শুনতে পারে। যেই ঈশ্বরের পথের বাধা হয়, অমনি ছাড়বে। শুধু ডাক্তার, ঔষধ নয়, সব ছাড়ে ভক্তরা ঈশ্বরপ্রাপ্তির প্রতিবন্ধক হলে। কারণ ঈশ্বরলাভ যে highest objective—সব চাইতে বড় উদ্দেশ্য জীবনের!

শরীর থাকলে অমন হয়। শরীরটা তো নিজের নয়—বাপ পিতামহের কতকগুলি সংস্কার রয়েছে, তাদের রক্ত আছে, heredity (বংশধারা) আছে। আর সব sights and scenesও (বাহ্য দৃশ্যাদি) আছে। অনেক সময় স্ত্রীলোক দেখলে তার সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু প্রতিবন্ধকের জন্য বলা যায় না। সেই ইচ্ছাই—সেই দৃশ্য আবার রাত্রিতে dream (স্বপ্ন) হয়ে আসবে। কিন্তু ঈশ্বরে মন থাকলে, তাঁর শরণ নিলে তিনি এ সব মারাত্মক বিপদ থেকে রক্ষা করেন। ভক্তদের কিছুতেই টলাতে পারে না উদ্দেশ্য থেকে। আহা, এমন অমূল্য উপদেশ আর কোথায় পাব? কি সোজা করে দিয়েছেন পথ। কে পারে এ সব কথা বলতে অবতার ছাড়া? যিনি জীবের জন্ম থেকে মুক্তি পর্যন্ত সবটা পথ জানেন, শুধু তিনিই এই বন্ধন থেকে মুক্তির পথ দেখাতে পারেন। ঈশ্বর ছাড়া কেউ জানে না এ সমগ্র পথের সন্ধান। তিনি যুগে যুগে জীবকে একথা বলতে আসেন।

অবতার—এ কি আর আমরা দশজনে বানিয়েছি! তা নয়, আমাদের কথার মূল্য কি? তিনি নিজে বলেছেন, আমি অবতার। ঠাকুর অন্তরঙ্গদের কাছে নিজের পরিচয় দিতেন কিনা! বলতেন, যিনি অখণ্ড সচ্চিদানন্দ—বাক্যমনের অতীত, তিনিই এই শরীরে এসেছেন। 'স্বয়ঞ্চৈব ব্রবীষি মে'—অর্জুন বলেছিলেন, তুমি নিজ মুখেও বলছো অবতার, তাই বিশ্বাস হচ্ছে।

যখন তিনি নিজে আসেন তখন অত শাস্ত্র পড়ার দরকার নেই।

তাঁর কথাই শাস্ত্র। আর তিনি এসে শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করেন, যুগোপযোগী নূতন light (আলো) দেন। সিদ্ধান্ত তো সব চিরকাল একই, কিন্তু পথের সন্ধান বলে দেন—নূতন সহজ পথ সৃষ্টি করেন সময়ের উপযোগী করে। কতকগুলি লোক তাঁর সহজ সরল কথায় বিশ্বাস করে চলে। তাঁদের মুক্তি হয়ে যায়। অপরেও এদের দেখে অনেকটা এগিয়ে যায়।

অবতারের কৃপা হলেই ঈশ্বরের কৃপা হলো। তিনিই গুরুরূপে আসেন। এই গুরু-কৃপাতেই মন তাঁর দিকে থাকে, অন্য পথ নাই। জোর করে হয় না। ব্যাকুল হলে তিনি এটি করে দেন—মনকে তাঁর দিকে চালিয়ে দেন। দেখ না, ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব দেহ ধারণ করলে, তাঁদেরও এ সবে পড়তে হয়। ঠাকুর বলতেন, পঞ্চভূতের ফাঁদে ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে।

তাই ইচ্ছে করে ও বিষয়ে ছোঁ না মারা—এতে হাত না দেওয়া। এই একটু চেষ্টা করা। আন্তরিক চেষ্টা করছে দেখলে তাঁর কৃপা হয়। এতে যদি কখনও পড়েও যায় তিনি উঠিয়ে নেন। ভক্তের, শরণাগতের দোষ তিনি ধরেন না—যেমন মা শিশুসন্তানদের দোষ দেখেন না। ভক্তের দোষ দোষ নয়।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—জীবের normal state (স্বাভাবিক অবস্থা) হচ্ছে সমাধি। পঞ্চভূতে পড়ে এটা abnormal (অসাধারণ) হয়ে পড়েছে। বারোয়ারীতে দেখেন নি—মা দুর্গার সঙ্গে দেবতারা এসেছেন, সব সমাধিমগ্ন। চালচিত্রে বেশ দেখায় কিন্তু। এর অর্থ চেষ্টা করে এই সমাধি লাভ কর। এইটে তোমারও স্বরূপ। এই চেষ্টা, এই তপস্যা চাই। তপস্যা দ্বারা মন তাঁতে সমাহিত করা, এটাই মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ কাজ। তপস্যা না করাই আশ্চর্যের বিষয়। তপস্যা মানে, নিজের ঘরে ফিরে যাবার চেষ্টা।

এইবার মঠের কথা হইতেছে। ঠাকুর কলিকাতায় যে সব স্থানে গিয়াছিলেন, সে সবও মহাতীর্থ—শ্রীম বলিতেছেন।

জগবন্ধু—শুনতে পাই, বিদ্যাসাগর মশায়ের বাদুড়বাগানের বাড়ী

একজন ভাল লোকের হাতে এসেছে। আচ্ছা, ঐ বাড়ী এখন যেমন আছে ঠাকুর আসার সময়ও কি এইরূপ ছিল ?

শ্রীম—সামান্য বদল হয়েছে। ঠাকুর যে দোর দিয়ে ঢুকেছিলেন, সেটি ছোট ছিল। এখন সেটা দেয়ালে গেঁথে ফেলেছে। বেরিয়েছিলেন, পশ্চিমদিকের বড় ফটক দিয়ে। ও বাড়ী একটা national asset (জাতির অমূল্য সম্পদ), কর্মীদের কত বড় উদ্দীপনের স্থান। কত পরোপকার হয়েছে সেখান থেকে। আবার sacred (পবিত্র), ঠাকুর এসেছিলেন তাই। বেশ ভাল লোকের হাতে পড়লেই ভাল।

৬

শ্রীম বেদান্ত সোসাইটির গতকালের রিপোর্ট শুনিতেছেন। একটি ভক্ত পড়িয়া শুনাইতেছেন। ইনি সব নোট লেখেন।

স্বামী অভেদানন্দ বলেন, concentration (একাগ্রতাশক্তি) লাভ করতে হলে ব্রহ্মচর্যের দরকার। ব্রহ্মচর্য খুব help (সাহায্য) করে। এ ছাড়া ধারণা হয় না। অল্প বয়সে বিয়ে করলে সব বীর্য বেরিয়ে যায় পুত্রকন্যারূপে। তাতে concentration (একাগ্রতা) নষ্ট হয়ে যায়। আমরা দেখেছি, ব্রহ্মচর্য থাকলে মনে তেজ থাকে, শরীরে বল থাকে। ধারণার অভ্যাস করতে হলে এ দুটিরই প্রয়োজন। আমরা সাধু হলাম সেইজন্য। আমরা দেখলাম, সংসারে থেকে তা ভাল হয় না ; বড়ই কঠিন, তাই সংসার ত্যাগ করলাম। অনেক কষ্ট গেছে জীবনে। কিন্তু মনের শান্তি আমরাই পেয়েছি। 'পায়ে হেঁটে হেঁটে কাশী গেছি—কত তীর্থ করেছি, পা রক্তাক্ত—কোনও দিন অভ্যাস ছিল না। আবার মাধুকরীতে জীবিকা নির্বাহ করা। ঋষিকেশে কত অসুখ গেছে প্রাণান্তকর। ঔষধ ও পথ্য কিছুই নেই। পড়ে আছি—'ঔষধং জাহ্নবী তোয়ং বৈদ্যঃ নারায়ণ হরিঃ' বলে। বড় দুর্গম স্থান ছিল তখন। কয়েকটি মাত্র সাধু বাস করছেন ; সকলেরই তীব্র বৈরাগ্য—শরীর যায় যাক ঈশ্বরকে চাই।

মাধুকরীতে যা মিলতো তাতেই জীবিকা নির্বাহ করতাম। জগন্নাথ, রামেশ্বর, দ্বারকা—আবার হিমালয়ে কেদার বদরী—এ সব স্থানই পায়ে হেঁটে করেছি। কখনও কেউ টিকিট করে দিলে গাড়ীতে চড়তাম যেখানে রেল আছে। একবার চৌরাশি ক্রোশ ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা করলাম বাবাজীদের সঙ্গে খালি পায়ে। দেখেছি, সর্বাবস্থায়ই মনে শান্তি ছিল।

ব্রহ্মচর্যের বড় দরকার। কলকাতায় আজকাল অনেক মত হয়েছে। কেউ কেউ বলে যোগ ভোগ দুই-ই কর। ব্রহ্মচর্যাদি পালনের দরকার নেই। আমরা বলি, এতে যদি হয় বেশ তো কর না কেন? কিন্তু এতে হয় না যে বাবা। মন স্থির করা বড়ই কঠিন। বিশেষ আজকালের দিনে। লোকের মন সর্বদা চঞ্চল, তাই নানা সংশয় এসে পড়ে। একটা ভাব ধরে রাখতে পারে না। আজ এটা কাল সেটা, ধারণাশক্তি নাই। ধারণা না থাকলে শান্তি হবে কি করে? ধারণা ছাড়া ভগবান লাভ হয় না।

মনুষ্য-জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বরলাভ করা। ঈশ্বরে মন গেলে তো তাঁকে লাভ করবে? আবার তাঁতে মন রাখতে হলেই সংযমের দরকার। ব্রহ্মচর্য প্রয়োজন। বেশী বীর্যক্ষয় হলে মন স্বভাবতঃই চঞ্চল হয়ে যায়। তাই concentration (একাগ্রতা) হয় না।

ও-দেশের, ওয়েস্টের লোকেরা আজকাল concentrationএ (একাগ্রতায়) খুব এগিয়ে গেছে। নূতন নূতন discovery আর invention (আবিষ্কার) যারা করে তাদের অদ্ভুত concentration (একাগ্রতা)। তারা যেন এক এক জন ঋষি।

এমারসনের (Emerson) লাইব্রেরীতে গিছলাম। দেখলাম সব বই আছে—গীতা, উপনিষদ্, বিষ্ণুপুরাণ ইত্যাদি। সবই translation (ইংরেজীতে অনুবাদ)। এমারসনের একটি favourite (প্রিয়) শ্লোক আছে গীতার ব্রহ্ম সম্বন্ধে—

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥

কারলায়েলের (Carlye) সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে এই শ্লোকটির তর্জমা বলেছিলেন। কারলায়েল বুঝতে পারলেন না। অনেক important poem (ভাল ভাল কবিতা) আছে এঁর।

আমাদের দেশে বর্তমানে বড়ই অধঃপতনের অবস্থা। দেশকে ওঠাইবার জন্য এই সোসাইটির প্রতিষ্ঠা। তোমরা সকলে ভালবাসবে, আর পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসবে। এ সব প্রতিজ্ঞা করতে হবে পরে—এখানকার মেম্বারদের। এক পরিবারের লোক সব, মনে করতে হবে—জাত ফাত নেই। সবাই এক বাপের ছেলে। লোক ঠকান, মিথ্যা কথা, বাটপাড়ি, এ সব ছাড়তে হবে। প্রত্যেকের ভিন্ন মত থাকতে পারে। তা বলে কি মিল থাকবে না ?

পরমহংসদেব বলতেন, মত পথ। এই দেখ, আমরা তাঁর direct disciples (সাক্ষাৎ শিষ্য) সব আছি—শিবানন্দ, সারদানন্দ, মাস্টার মশায়, আমি। বিবেকানন্দ, রামকৃষ্ণানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, তুরীয়ানন্দ, গিরিশবাবু, এঁরা সব গত হয়েছেন। আমাদের সকলের মত ভিন্ন ভিন্ন। কিন্তু এমন প্রেম, এমন ভালবাসা পরস্পরের মধ্যে—ছুনিয়াতে কোথাও এ-টি খুঁজে পাবে না। এ-টি শুধু আমরাই দেখলাম। স্বামীজী আমেরিকা জয় করলেন। আমাকে ডেকে নিয়ে গেলেন। আমার ও-দেশে যাবার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু তাঁকে ভালবাসতাম, তাঁর কথা ফেলতে পারলাম না। অনিচ্ছাসত্ত্বেও যেতে হল। ওখানে আমায় বসিয়ে চলে এলেন দেশে। পঁচিশ বছর ওখানে তাঁর কথায় কাজ করলাম। তাই তাঁর নাম আজও ওখানে আছে। বুকের রক্ত দিয়ে রেখেছি, নয়তো কিছুই থাকতো না। মত ভিন্ন হোক, কিন্তু পরস্পরে ভালবাসা চাই। এই আমাদের সে-টি ছিল।

আর একটা কথা। গুরু ও শিষ্যের মধ্যে খুব sincere (সরল) ভাব থাকলে কাজ হবে। স্বামীজী অনেক সব বন্ধু নিয়ে যেতেন ঠাকুরের কাছে। ঠাকুর ওদের সঙ্গে কথাই কইতেন না। ওরা অপমানিত মনে করতো। স্বামীজী তাই রেগে যেতেন ঠাকুরের উপর। ঠাকুর বলতেন, ওদের এ জন্মে হবে না, তা আমি কি করবো ?

আমাদের মনে যে সব ভাব উঠতো ঠাকুর সব বলে দিতেন। ছেলেমানুষ আমরা সব। তাই জিজ্ঞেস করতাম, মশায় কি করে জানতে পারেন আমাদের মনের কথা? পাড়াগাঁয়ের ভাষায় জবাব দিতেন, তোদের চোখগুলি সারসীর মত, তাই দিয়ে ভেতরের সব দেখি। পূর্বজন্মের কথা পর্যন্ত বলে দিয়েছেন আমাকে—আমি কি ছিলাম পূর্বজন্মে। আর একজনকে তার বাপ-মা কে সেই কথা বলে দিয়েছিলেন। তাঁর মত কে আর হবে বল? একবার দেখেই বলে দিতেন কে কি। ভেতরে শক্তি থাকলে চিনতে পারতেন। সেই জন্য আমাদের নিয়েছিলেন। এতো লোক যেতো সকলেরই হয়েছে? তিনি বলতেন, মলয় পর্বতের হাওয়া বইলে সব গাছ চন্দন হয় কিন্তু কলাগাছ হয় না। কেশব সেনকে বলেছিলেন, তুমি মানুষ চেন না, সকলকেই শিষ্য কর; আর তাই দলাদলি।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—কি সুন্দর কথা! ঠাকুরের কথারই ব্যাখ্যা। আমরা বুড়ো হয়েছি চলতে পারি না। তাই ইনি আমাদের লিখে এনে শোনান। সব নল দিয়ে একই ছাদের জল পড়ছে, সবই ঠাকুরের কথা। (ভক্তদের প্রতি) আপনারা যান না কেন শুনতে, অত কাছে? তাকেই বলে, চোখ থাকতে কানা আর কান থাকতে কালা।

ডাক্তার কার্তিক বক্সী আজও দক্ষিণেশ্বর গিয়াছিলেন। সেখান হইতে সোজা এখানে আসিয়াছেন। দক্ষিণেশ্বরের কথা হইতেছে।

শ্রীম (ডাক্তারের প্রতি)—কিরণবাবু আজ তা হলে তিন চার ঘণ্টা ছিলেন? সব দেখছেন ধীরে ধীরে। আপনারা রৌশনচৌকির কথা বলবেন। আমাদের খুব ইচ্ছা এ-টি আগে হয়, আর কীর্তনটি। আপনাদেরও এই ইচ্ছা, আর আমাদের এই প্রার্থনা, এ কথা বলবেন কিরণবাবুকে।

রৌশনচৌকির কথা হইতে লাগিল। শ্রীম বলিলেন, কথামৃতের কালীবাড়ীর বিবরণটি পাঠ করলে হয়। মণি পড়িতেছেন। সকলের শেষে পড়িলেন—কালীবাড়ী আনন্দ নিকেতন হইয়াছে। রাধাকান্ত, ভবতারিণী, মহাদেবের নিত্য পূজা, ভোগ-রাগাদি আর অতিথিসেবা।

একদিকে ভাগীরথীর বহুদূর পর্যন্ত পবিত্র দর্শন। আবার সৌরভাকুল সুন্দর নানাবর্ণে রঞ্জিত কুসুমবিশিষ্ট মনোহর পুষ্পোদ্যান। তাহাতে আবার একজন চেতনা মানুষ অহর্নিশি ঈশ্বরপ্রেমে মাতোয়ারা হইয়া আছেন। আনন্দময়ীর নিত্য উৎসব।

নহবত হইতে রাগরাগিণী সর্বদা বাজিতেছে। একবার প্রভাতে বাজিতে থাকে মঙ্গলারতির সময়। তারপর বেলা নয়টার সময়, যখন পূজা আরম্ভ হয়। তারপর বেলা দ্বিপ্রহরের সময়, তখন ভোগ আরতির পর ঠাকুর-ঠাকুরানীরা বিশ্রাম করিতে যান। আবার বেলা চারিটার সময় নহবত বাজিতে থাকে—তখন তাঁহারা বিশ্রামের পর গাত্রোত্থান করিতেছেন ও মুখ ধুইতেছেন। তারপর আবার সন্ধ্যারতির সময়। অবশেষে রাত নয়টার সময়, যখন শীতলের পর ঠাকুরদের শয়ন হয়, তখন আবার নহবত বাজিতে থাকে।

কলিকাতা, ৪ঠা অক্টোবর ১৯২৩ খ্রীঃ
১৭ই আশ্বিন ১৩৩০ সাল; বৃহস্পতিবার, রাত্রি পৌনে দশটা

দশম অধ্যায়

বিদেহী শ্রীম

১

মর্টন স্কুল। তিনতলার উত্তর দিকের কোণের ঘরে শ্রীম বিশ্রাম করিতেছেন। এখন অপরাহ্ণ সওয়া চারটা। আজ ৫ই অক্টোবর ১৯২৩ খ্রীঃ, ১৮ই আশ্বিন ১৩৩৮ সাল, শুক্রবার। বেলুড় মঠ হইতে দুইটি সন্ন্যাসী আসিয়াছেন—স্বামী ওঁকারানন্দ ও স্বামী মুকুন্দানন্দ। অন্তেবাসী তাঁহাদিগকে শ্রীমর কাছে লইয়া গেলেন। তিনি সাদরে নিজের মাদুরে বসাইলেন। শ্রীম আনন্দে স্বামী ওঁকারানন্দের পিঠে হাত বুলাইতেছেন, আর সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন আছ, শরীর বেশ আছে, বা-বা। তিনি মর্টন স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র।

একজন সাধু গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিয়া কিছু বেশী বয়সে সন্ন্যাস লইয়াছেন। ইদানীং শরীর খুব অসুস্থ হওয়ায় গৃহে ফিরিয়া যাইবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। তাঁহারই সম্বন্ধে কথা হইতেছে। ক্রমে রাধাকান্ত দেবের কথা আসিল।

শ্রীম (সন্ন্যাসীদের প্রতি)—রাধাকান্ত দেব সব ছেড়ে বৃন্দাবনে গেলেন, বসে বসে তাঁকে ডাকবেন। একদিন ছেলে গিয়ে হাজির। বললে, অত টাকা ঋণ হয়ে গেছে। অমনি একখানা চেক্ লিখে দিলেন। কিন্তু রেগে বললেন, এখানে কেন? আমি এসেছি তাঁর নাম করবো বলে। আবার এখানেও ধাওয়া করা? রাস্তায় ছেলে ঐ চেক্‌টি হারিয়ে ফেললো। আবার যেতে সাহস হলো না, বাপের যে রাঙ্গা চোখ দেখে এসেছে।

লর্ড লরেন্স আগ্রায় দরবার করবেন। রাধাকান্তবাবুকে লিখে পাঠালেন, 'তুমি না এলে হবে না।' তিনি প্রথমে অনেক আপত্তি জানিয়েছিলেন যেতে। শেষে পণ্ডিতদের মত নিয়ে যাওয়া স্থির হল। ক্ষেত্র-সন্ন্যাস নিলে স্থান ছেড়ে যেতে পারে না। পণ্ডিতরা মত দিলেন, আগ্রা মানে অগ্রবন। বৃন্দাবন-মণ্ডল দ্বাদশ বন নিয়ে গঠিত, অগ্রবন একটি। তাঁরা বললেন, যেতে পার। সভায় প্রবেশ করতেই সকলে দাঁড়িয়ে পড়লো—লাটশুদ্ধ।

লালাবাবু ছিলেন আর একটি। তিনি খুব অল্প বয়সে দেহ রাখেন। তেইশ-চব্বিশ বছর তখন বয়স, বাপকে একদিন বলেছিলেন চাকরদের একখানা করে ভাল কাপড় দিতে। বাপ বলে পাঠালেন, রোজগার করে ওকে দিতে বলো। এই কথা শুনে তৎক্ষণাৎ বাড়ী ছাড়লেন আর ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীতে চাকরী নিলেন। বাপ মরলে ঘরে আসেন। ইতিমধ্যে যাতে লাখ টাকা বছরে আয় হয় এমন জমিদারী নিজে উপার্জন করে করেছিলেন। অল্প দিনের মধ্যে সব করলেন। বৃন্দাবনে থাকতেন। সেখান থেকেই স্টেট ম্যানেজ করতেন। স্ত্রী ওখানে থাকতে আপত্তি করলেন বড্ড ছারপোকা বলে। তাঁকে তাই কলকাতায় পাঠিয়ে দেন। ইনিই

রাণী কাত্যায়নী। দক্ষিণেশ্বর ঠাকুরের ঘরে যে শ্বেত পাথরের বুদ্ধমূর্তি, তা রাণী কাত্যায়নী দিয়েছিলেন ঠাকুরকে।

আমাদের সঙ্গের একজন (ঠাকুরের ভক্ত) সন্ন্যাস নিতে বাড়ীতে যাওয়া-আসা করতো। শেষে ওখানেই রয়ে গেল।

দূরে থাকতে হয়। প্রথমে স্নেহ জানতে দেয় না নিজের রূপ। পরে ঐ-তে বদ্ধ হয়।

এইবার মঠ ও স্বামীজীর কথা হইতেছে।

শ্রীম (সন্ন্যাসীদের প্রতি)—স্বামীজী মঠ কেন করলেন ? আহা, কি যে কষ্ট পেয়েছেন তিনি। সারা ভারতবর্ষ ঘুরে সাধুদের কষ্ট দেখে তবে মঠ করলেন, যাতে ছেলেরা একমুঠো খেয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে তাঁর চিন্তা করতে পারে। জানতেন, ছেলেরা এই কষ্ট সইতে পারবে না। তাই মঠ। আমেরিকাতেই কি কম কষ্ট গেছে। আহার নেই, বাসস্থান নেই, বস্ত্র নেই—শীত সম্মুখে। কেউ জানাও নেই—আবার পকেট শূন্য। সীতাপতিকে (স্বামী রাঘবানন্দ) বলে দিয়েছি স্বামীজীর সময়কার তাঁর ফ্রেণ্ডস্ যাঁরা ছিলেন, তাঁদের কে কে আছেন দেখো, আর আলাপ করো। ওঁরা আমাদের অতি প্রিয়। বরাবর watch (লক্ষ্য) করেছি কিনা তাঁদের। বোষ্টন, নিউইয়র্ক, লস্ এন্‌জেলিস্, স্যানফ্রান্‌সিস্‌কো, শিকাগো প্রভৃতি স্থানে তাঁরা ছিলেন। কত সেবা করেছেন স্বামীজীর। তাই তাঁরা আমাদের পরম আত্মীয়।

যদি কেউ বলে, স্বামীজী কি করেছেন ? তার উত্তর এক কথায়, ভারতের হিপ্‌নোটিজম্ (মোহনিদ্রা) ভেঙ্গে দিয়ে গেছেন। এটাই তাঁর প্রধান অবদান। তারপর তিনিই সর্বপ্রথম প্রচার করলেন ইংরেজীর ভিতর দিয়ে বেদবেদান্তের গূঢ় তত্ত্ব, ভারতের সভ্যতা। এই ফার্স্ট টাইম। তাঁর ভাষা কি ওজস্বিনী। প্রত্যেকটা লাইন যেন কথা কয়, এমন জীবন্ত! কি অধঃপাতেই যে দেশ পড়ে গিছলো! মেয়েগুলো পর্যন্ত বিগড়ে গিছলো ইংরেজের আদর্শে। কম দুর্গতি! স্বামীজী তার করলেন কি ? ইংরেজকে দেখলে আমরা ভয়ে

কাঁপতাম, স্বামীজী সে ভয় দূর করলেন। সেই ইংরেজ এসে আবার তাঁর পায়ের জুতো বেঁধে দিল। গঙ্গায় নাইতে গেছেন, ওরা এসে তাঁর গা গামছা দিয়ে রগড়িয়ে দিচ্ছে। আবার ইংরেজ মহিলা তামাক সেজে দিতেন।

আমেরিকার থাউজেণ্ড আয়ল্যাণ্ডস্ পার্কে কেউ কেউ তাঁকে দর্শন করতে গিয়েছিল। তারা বলেছিল, we have come to you with the same regards with which we would have gone to Christ if he would be living today. ক্রাইস্ট আজ জীবিত থাকলে তাঁর কাছে যে শ্রদ্ধা নিয়ে যেতাম সেই শ্রদ্ধা নিয়েই আপনার কাছে এসেছি। অর্থাৎ, তুমিই আমাদের ক্রাইস্ট—You are the Christ to us। তিনি আর তখন কোন আপত্তি করতে পারলেন না। কি গভীর শ্রদ্ধা!

স্বামীজী নিজে বলেছেন, ঠাকুর আমার ঘাড় ধরে সব কাজ করিয়ে নিয়েছেন। ঠাকুর যে অবতার তার প্রমাণ বাইরের কিছু দেখতে হলে স্বামীজীর wonderful life (অলৌকিক জীবন)। আর সব চাইতে বড় প্রমাণ হলো ঠাকুরের নিজ মুখের কথা। তিনি নিজে বলেছেন, 'আমি অবতার।'

এক সময়ে ভারতের লোক মনে করতো, ইংরেজদের সবই ভাল। What Shakespeare says—সেক্‌সপিয়র কি বলছেন? মিল, জেমস্—এঁদের সব দোহাই পাড়তো। স্বামীজী সেটা ভেঙ্গে দিয়েছেন। জেমসই বুঝি বলেছিলেন শেষে, life-এর problems solved (জীবনের সমস্যা সমাধান) করেছে একমাত্র বেদান্ত, আর কেউ নয়। আহা, কি শক্তিশালী ভাষা স্বামীজীর! প্রাণসঞ্চার করে দেয় মৃত শরীরে। কারলায়েলের (Carlyle) ভাষাও তার কাছে দাঁড়ায় না। ভারতের দৃষ্টিশক্তিকে নিজের অতুল আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্যের দিকে আকৃষ্ট করে গেছেন স্বামীজী—এই স্বামীজীর অবদান।

এইবার মিষ্টিমুখ করিয়া সাধুরা বিদায় লইলেন।

কথামৃত ছাপা হইতেছে। অন্তেবাসীকে কতকগুলি প্রুফ দিলেন।

তিনি নিজেও দেখেন। এখন সাড়ে ছয়টা। সন্ধ্যার পর দোতলার সিঁড়ির ডানদিকের ঘরে ভক্তরা সমবেত হইয়াছেন। বিনয়, জগবন্ধু, শালিখার ভক্ত, ডাক্তার, অমৃত প্রভৃতি আসিয়াছেন। শ্রীম আসিয়া মাদুরে বসিয়া আছেন। বৃদ্ধ শরীর, সারাদিন কাজ করিয়াছেন, তাই ক্লান্ত। তিনি ভক্তদের সহিত একথা-সেকথা কহিতেছেন।

শ্রীম (ডাক্তারের প্রতি)—আপনাদের বাড়ীর ওদের (স্ত্রীকে) কবে আনবেন ?

ডাক্তার—ও মা, অমনি রক্ষা নেই। তা আবার ওদিক।

শ্রীম—একবার মা খারাপ দিনে দক্ষিণেশ্বরে এসেছিলেন। তাই দু'দিন পর ঠাকুর আবার দেশে পাঠিয়ে দেন যাত্রা বদ্‌লিয়ে আসতে। মা ভারি অভিমানিনী—দু'বছর আর এদিকে আসেন নি। তারপর হঠাৎ ঠাকুর লিখলেন, 'হৃদয় চলে গেছে। আমার বড় কষ্ট হচ্ছে। দেখবার কেউ নেই। তুমি শীঘ্র চলে এস।' খবর পেয়েই এলেন। আহা, কি স্নেহ-বন্ধনে যে বেঁধেছিলেন ভক্তদের। বলবার কথা নয়।

জগবন্ধু (ডাক্তারের পক্ষ সমর্থন করিয়া)—ঠাকুর (স্ত্রীকে জগন্মাতা রূপে দর্শন) করতেন বলে কি আর কেউ পারে তা ?

শ্রীম (রহস্যচ্ছলে)—না। যারা বিয়ে করে নাই তাদের নয় (এ ব্যবস্থা)। যারা করেছে তাদের জন্য এ কথা।

রাত্রি সাড়ে নয়টা।

পরদিন সন্ধ্যায়, জগবন্ধুর হাতে একটি প্রুফ দিয়া বলিলেন, আজ একটা কথা পেলাম এতে। আপনার চোখে পড়ে নি বুঝি ? ঠাকুর বলছেন—জ্ঞান, বিচার, কি ধ্যান দ্বারা তাঁকে বোঝা এক। আবার নিজে যখন দেখা দেন সেই বোঝা আর এক। যোগেনকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন, এমন মনে করা ভাল নয়, আমি না হলে চলবে না। এ কাজটা আমি করে দিয়েছি। এ সব রজোগুণের লক্ষণ।

শ্রীম দোতলার সিঁড়ির পাশের ঘরে বসিয়া আছেন মাদুরে। কাছেই বীরেন, মণি ও ছোট নলিনী রহিয়াছেন। এখন রাত্রি নয়টা। ডাক্তার, বিনয় ও জগবন্ধু একসঙ্গে আসিয়া প্রবেশ করিলেন। জগবন্ধু মঠের ফেরত কাশীপুর হইতে এদের সঙ্গে আসিয়াছেন। শ্রীম ডাক্তার কার্তিক বক্সীর সঙ্গে কথা কহিতেছেন।

আজ ৭ই অক্টোবর ১৯২৩ খ্রীঃ, ২১শে আশ্বিন ১৩৩০ সাল, রবিবার।

শ্রীম (ডাক্তারের প্রতি)—শুনছেন ডাক্তারবাবু, যারা বিয়ে করে নি তাদের আর বিয়ে না হয়, তাই ঠাকুর বলতেন। আর যারা করেছে, তাদের ছেলেপুলে না হয় তাই ঠাকুর বলেছিলেন। আবার যাদের সন্তান হয়েছে, দুটির বেশী না হয়। কিংবা যাদের স্ত্রী গত হয়েছে, তারা আর বিয়ে না করে—এই সব ছিল তাঁর ধর্মপথের practical (ব্যবহারিক) উপদেশ।

টাকাপয়সার কষ্টের কথায় বলতেন, ওগুলো অত ভেবো না—টাকা জমাবো, বড় বাড়ী করবো, ইত্যাদি। বরং ভাব, কিসে তাঁকে লাভ হয়।

শ্রীম (সকলের প্রতি)—এসব বলতেন, যাতে নিবৃত্তি হয়। নিবৃত্তির কথাই আগাগোড়া। কুলগুরু বা অপর সাধুরা আশীর্বাদ করে, ধনেপুত্রে লক্ষ্মীলাভ হোক। তাদের উপদেশ সকলে খুব পছন্দ করে। ঠাকুরের উপদেশ, নিবৃত্তির উপদেশ, যাতে কেবলমাত্র ভগবানে মন যায় তার কথা। এইজন্য ঠাকুরের এসব উপদেশ লোকে 'লাইক' (like) করে না। চণ্ডীতে আছে, ভক্ত প্রার্থনা করছে, 'রূপং দেহি, ধনং দেহি, যশো দেহি'··· ···আর 'ভার্যাং মনোরমাং দেহি।' সকাম ভক্ত এই সব চায়।

এই যে গৃহস্থরা অত সব পূজা করে কি জন্য? না, যাতে এসব লাভ হয় তার জন্য। সকাম পূজা, সংসারের সুখ চাইছে কেবল। এসব আসে, আবার যায়। কিন্তু ঈশ্বরের জ্ঞান, ভক্তি—নিষ্কাম ভক্তির সুখ অনন্তকাল স্থায়ী হয়। তাই সাধুরা পূজা করেন তাঁর পাদপদ্মে

যাতে শুদ্ধা ভক্তি লাভ হয়, যাতে শুদ্ধ জ্ঞান লাভ হয়। এ সম্পদ থাকলে এখানেও আনন্দ, পরলোকেও আনন্দ।

মথুরবাবুকে দরিদ্র-নারায়ণের সেবা করতে বললেন। মথুরবাবু উত্তর করলেন, অত টাকা নেই। তৎক্ষণাৎ ঠাকুর বলে ফেললেন, 'একটা জমিদারী বিক্রী করে এদের সেবা কর।' একপেট খাওয়া, একমাথা তেল আর একখানা করে কাপড় দিতে বললেন। তারপর আবার মাকে বলছেন, 'মা মুখটা এত আলগা করে দিলে, যা তা বেরিয়ে যায়। আহা, এরা সব গৃহস্থ লোক অত ভালবাসে টাকা-কড়ি। কোথায় বলবো—টাকাকড়ি, জমিদারী বাড়ুক। তা না বলে বলেছি, জমিদারী বিক্রী কর। তারপর মা মুখ বন্ধ করে দিলেন।'

বীরেন—আজ্ঞে, মানুষ কি পারে একথা ("ওগুনো অত ভেবো না") strictly (ঠিক ঠিক) পালন করতে?

এই কথার উত্তর শ্রীম সাক্ষাৎভাবে না দিয়া গানে দিতেছেন। শ্রীম গাহিতেছেন—

গান। আয় মন বেড়াতে যাবি।
কালী-কল্পতরুমূলে রে মন চারি ফল কুড়ায়ে পাবি॥
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি জায়া, তায় নিবৃত্তিরে সঙ্গে লবি।
ওরে বিবেক নামে তার বেটারে তত্ত্ব কথা তায় শুধাবি॥

শ্রীম (সকলের প্রতি)—ভগবানের কৃপা হলে চার ফলই পাওয়া যায়—ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ। 'নিবৃত্তিরে সঙ্গে নিবি' বলেছেন—তার মানে, যত কম বিষয়-ভোগ নেওয়া যায়—minimum যার যেমন অবস্থা সেই অনুযায়ী যতটা কমে চলে সেরূপ নেওয়া। মানে, আগে কিসে তাঁর দর্শন হয় তার চেষ্টা করা, তারপর অন্য কথা।

ঠাকুর বলেছিলেন, আমি যদি ষোল টান করি তবে শেষ অবধি সাত-আট টানে গিয়ে দাঁড়াবে। আর প্রবৃত্তির কথা যদি একটু বলি তবে সকলে ধেই ধেই করে নাচবে। বাইবেলে আছে, But one thing is needful: and Mary hath chosen that good part, which shall not be taken away from her.

মেরী যা ধরেছে এইটি চিরকাল থাকবে। এইটিই মানুষের একমাত্র বাঞ্ছনীয়।

মার্থা আর মেরী দু' বোন ক্রাইস্টের শিষ্যা ছিলেন। মেরী ক্রাইস্টকে দেখে অনিমেষ নয়নে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকতেন আর প্রেমাশ্রু বিসর্জন করতেন। তাঁর ভগবানে প্রেম হয়েছিল। এই প্রেমই অবিনশ্বর, চিরকাল থাকবে। আর সব দু' দিনের।

শ্রীম (জগবন্ধুর প্রতি)—হাঁ, শনিবারে কি সব কথা হলো বেদান্ত সোসাইটিতে, বলুন।

জগবন্ধু—একজন প্রশ্ন করেছিলেন, মৃত্যুর পর প্রেতলোক আছে কি না, এইসব।

শ্রীম—ঠাকুর বলতেন, এগুলো interesting (প্রীতিকর) বটে, কিন্তু এর দরকার কি? কিসে তাঁকে লাভ হয় তার চেষ্টা কর। সেই কথা বলা, সেই কথা শোনা। ঠাকুরের ঐ এক কথা। (সহাস্যে) বেশ রসিক পুরুষ ছিলেন, রসান দিয়ে কথা কইতেন। বলেছিলেন, যদু মল্লিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে, তাঁকেই জিজ্ঞেস করো ও সব কথা। 'যদু মল্লিক' মানে ভগবান। 'ও সব কথা' মানে ভগবানের ঐশ্বর্যের কথা। সর্বদা straight to the target—একেবারে আদর্শে পৌঁছে দিতেন মানুষের মন। কেশববাবুকে বলেছিলেন এই কথা।

রাত্রি সাড়ে নয়টা।

দুই দিন পর ৯ই অক্টোবর। শ্রীম ভক্তসঙ্গে 'ধ্রুবচরিত্র' পিক্‌চার দেখিতেছেন রিপন থিয়েটারে। ইহা মেছুয়াবাজারে অবস্থিত, ঈশান মুখুয্যে বাড়ীর সামনে। এই বাড়ীতে ঠাকুরের শুভাগমন হইয়াছিল। শ্রীমর সঙ্গে আসিয়াছেন জগবন্ধু, ডাক্তার, বিনয়, মণি, শচী ও সুধীর। বায়স্কোপ দেখিয়া ফিরিতে রাত্রি বারটা হইয়া গিয়াছে। ডাক্তার অত রাত্রিতে আর বাড়ী ফিরিলেন না, জগবন্ধু ও বিনয়ের সঙ্গে মর্টন স্কুলে রহিয়া গেলেন দোতলার বসিবার ঘরে। শ্রীম কতক বিছানা পাঠাইয়া দিলেন। বায়স্কোপ আরম্ভ হয় নয়টায়। ফিরিবার সময় শ্রীম বলিতেছেন, এই চিত্রটি প্রথমে বিলেতে হয়েছিল।

সাহেবরা বেশ সেজেছে। আহা, যমুনাটি কি সুন্দর দেখালে! চিত্র দেখিবার পূর্বে শ্রীম ভক্তসঙ্গে স্কুলবাড়ীতে ধ্রুবচরিত্র পাঠ শুনিয়া গিয়াছিলেন।

তাহার পরদিন শ্রীম দোতলার ঘরে বসিয়া আছেন। আজ বুধবার। অপরাহ্ণ সওয়া ছয়টা। অন্তেবাসী ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, শ্রীম যোগেনকে মৃদু স্বরে কি বলিতেছেন। তারপর মুখ ধুইতে উঠিয়া গেলেন। শ্রীমর নির্দেশে জগবন্ধু, সুধীর, মণি ও যোগেন গান গাহিতেছেন। তাঁহারা প্রথম গাহিলেন, 'গয়া গঙ্গা প্রভাসাদি কাশী কাঞ্চি কেবা চায়,' তারপর 'মজলো আমার মন-ভ্রমরা শ্যামাপদ নীলকমলে।' শ্রীম ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (যোগেনের প্রতি)—এ রকম করা ঠিক নয়। আপনাকে যদি লিখে দেন কিছু—written order, তবেই বলবেন, নতুবা নয়। লিখে দিলেও avoid করা (এড়িয়ে চলা) উচিত। মানুষের সঙ্গে কত রকম tact (কৌশল) করে চলতে হয়। ওখানকার (কালীবাড়ীর) কর্মচারী হলে তখন বরং বলা যেতে পারে।

হাজার দোষ হলেও এঁদের (ঠাকুরের বংশধরদের) দোষ ধরতে নাই। এঁদের চিনতো কে এতদিন! কত বড় বংশে জন্ম! এখন পূজো পেলে তাঁদের দেবভাব জেগে উঠবে। তাঁদের শত অপরাধ হলেও তা ধরতে নেই। আলেকজাণ্ডার দি গ্রেট বলেছিলেন, 'সেলিউকাস, মায়ের চোখের এক ফোঁটা জল পড়লে, তোমার কাগজপত্র সব ভেসে যাবে—হাজার চিঠি লেখ আর যাই কর। তাঁকে আগে শান্ত কর।' মা বড় জ্বালাতন করত একে। অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছিল। তাতেই আলেকজাণ্ডার এই কথা বললেন।

ওঁদের কত বড় বংশ, কত বড় লোক (ঠাকুর) জন্মেছেন তাঁদের ঘরে! ঠাকুর সারা জীবন মায়ের কাছে কেবল জ্ঞান ভক্তি চেয়েছেন—'মা আমায় ভক্তি দাও।' টাকাকড়ি প্রার্থনা কখনও করেন নাই। ঘরের ওঁদের কত কষ্ট, খাওয়া পরার, আবার ম্যালেরিয়াতে সব মরমর।

তাতেই তো রামলালের বাবা পঁয়তাল্লিশ বছরে গেলেন। বড় ভাই কলেরায় আগে চলে গেছেন। ভগ্নীপতিরা আট টাকা মাইনেতে চাকরি করে। কি কষ্ট, কিন্তু তবুও একদিনের জন্যও ঠাকুর টাকাকড়ি চান নাই। বলতেন, উটি চাইবার যো নেই। ঠাকুর বলেছিলেন— যদি জানতুম এসব থাকবে, তবে কামারপুকুর সোনা দিয়ে মুড়ে দিতুম মাকে বলে। কিন্তু এসব কিছু থাকবে না, অনিত্য। উঃ, কি জীবন! কে পারে এ কথা বলতে ভগবান ছাড়া?

ভক্ত হলে দ্বন্দ্ব 'ডাল ভাতের' কথা বলতেন। নরেন্দ্রকে বলেছিলেন, মা বলেছেন ডাল ভাত হলে হয়। এর বেশী না। সেও তাঁর নাম করতে পারবে বলে নিশ্চিন্তি মনে।

বড় জিতেন গৃহে প্রবেশ করিলেন।

শ্রীম (বড় জিতেনের প্রতি)—ওরাই কি চিনতে পারতো? ওরা মনে করতো, আমাদের ভাই, খুড়ো, মামা—পরিবারের লোক যেমন মনে করে থাকে। ক্রাইস্ট, চৈতন্য—এঁদেরও চিনতে পারে নাই পরিবারের লোক। রামলালকে কেউ হয়তো বললে, 'কি হে, তোমাদের খুড়োর তো এখন খুব নাম-যশ, কত ভক্ত—শুনতে পাচ্ছি। তোমাদের এখন খুব সময়। তোমাদের আর ভাবনা কি?' উত্তর হলো, 'না ভাই, যার যা সুখ নিয়ে সে ব্যস্ত। আমরা যেমন ছিলাম তেমনি আছি।' দেশের লোক বলতো, 'কেন, এত সব বড় বড় লোক যাওয়া-আসা করে! তাদের বলে টাকা দেওয়াতে পারে না তোমাদের?' কখনও বলতো, 'কলকাতার লোকগুলি কি বোকা! এই গদাই, আমরা ছেলেবেলা থেকে একে দেখছি। একে নিয়ে অত নাচানাচি' (হাস্য)।

ঠাকুর নিজের মাকে নিয়ে কাশী গিছলেন। রাম চাটুয্যে সঙ্গে ছিলেন।

ঠাকুরের সর্বদা সমাধি হচ্ছে দেখে ঠাকুরের মা বললেন, 'হাঁ রে কেষ্ট, তুই অমন হয়ে থাকিস্—আমি মরলে কে দেখবে?' 'কেষ্ট' বলে ঠাকুরকে ডাকতেন। ঠাকুর বলতেন, কি জানি মা, আমি অত

কিছু জানি না। রামলালকে বল, ও দেখবে। অর্থাৎ সর্বদা জগদম্বার কথা ভাবছেন। অন্য কথা কি করে ভাববেন? রাম চাটুয্যে বলেছেন আমাদের এ সব কথা।

ডাক্তার ও বিনয় প্রবেশ করিলেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—এই যে দক্ষিণেশ্বরের ম্যানেজমেণ্ট ভক্তদের হাতে এসেছে, এখন ভক্তদের position (অবস্থা) বড় delicate (সঙ্কটজনক)। অন্য লোক যারা সাংসারিক স্বার্থ নিয়ে আছে তাদের কথা আলাদা। কিন্তু ঠাকুরের ভক্তদের position (অবস্থা) বড়ই delicate (সঙ্কটজনক)। কিরণবাবুর খুব সাবধান হয়ে চলা উচিত। এই কাজটি একটি মহা পরীক্ষা আর কঠোর তপস্যা। কোনও ব্যাপারে রামলালদাদা ছোট না হন। এমন কি, তিনি যদি কোন কাজ না করে থাকেন, তবে ভক্তদের নিজেদের করা উচিত তাঁর হয়ে।

শ্রীম (জগবন্ধুর প্রতি)—একটি গান হোক।

সকলে গাহিতেছেন।

গান। শিবসঙ্গে সদা রঙ্গে আনন্দে মগনা, মা।
সুধা পানে ঢলঢলে কিন্তু পড়ে না॥
বিপরীত রতাতুরা পদভরে কাঁপে ধরা।
উভয়ে পাগলের পারা লজ্জা ভয় আর মানে না॥

শ্রীম—এইটি একটি favourite (প্রিয়) গান ঠাকুরের। এই যে স্ত্রীপুরুষের মিলন, ঠাকুর একে শিবশক্তির মিলন দেখতেন।

গদাধর আসিল। শ্রীম ও ভক্তগণ সকলে আগমনী গাহিতেছেন।

গান। কেমন করে পরের ঘরে ছিলি উমা বল মা তাই।
কত লোকে কত বলে শুনে প্রাণে মরে যাই॥
কেমনে মা ধৈর্য ধরে জামাই নাকি ভিক্ষা করে,
এবার নিতে এলে পরে বলবো উমা ঘরে নাই।
চিতাভস্ম মাখি অঙ্গে জামাই ফিরে নানা রঙ্গে,
তুই নাকি মা তারি সঙ্গে সোনার অঙ্গে মাখিস ছাই॥

শ্রীম—এই গানটি গেয়েছিলেন বকুলতলার পোস্তাতে বসে স্বামীজী। শুনে ঠাকুর সমাধিস্থ।

গান। এবার আমার উমা এলে আর উমা পাঠাবো না।
বলে বলুক লোকে মন্দ কারো কথা শুনবো না॥ ইত্যাদি

গান। অভয়ার অভয় পদ কর মন সার
ভবভয় সব দূরে যাবে রে তোমার॥ ইত্যাদি।

গান। আমার মন যদি যায় ভুলে।
তবে বালির শয্যায় কালীনাম দিও কর্ণমূলে॥
এ দেহ আপনার নয় রে, সদা রিপু সঙ্গে চলে।
তবে আন রে ভোলা জপের মালা, (দেহ) ভাসাই গঙ্গাজলে॥
ভয় পেয়ে রাজা রামকৃষ্ণ ভোলার প্রতি বলে।
আমার ইষ্ট প্রতি দৃষ্টি খাট কি আছে কপালে॥

গান। আমার মাকে কি দেখেছিস তোরা বল সত্যি করে।
মায়ের নব নব রূপে ভুবন মন হরে॥
মা তো আমার নয়রে কল্পনার চিন্ময়ী হাস্যবদনা,
মায়ের স্নেহচক্ষে প্রেমবক্ষে অমিয় ঝরে॥
হাসি মুখে করে ভুবন আলো (মায়ের) কোলে শোভে ভক্তদল,
মায়ের প্রসারিত প্রেমবাহু আমাদের তরে॥
আয়রে আয় ও-জগৎবাসী তোরা দেখে যা একবার আসি,
আমাদের জননীর রূপরাশি পরাণ ভরে।
যে দেখেছে সেই মজেছে জনমের তরে॥

ভক্তগণ সব ভুলিয়া গাহিতেছিলেন। শ্রীমর চক্ষে আনন্দাশ্রু। তিনি কখনও শেষের গানের দুই এক পদ গাহিলেন, আবার স্থির হইয়া বসিয়া রহিলেন—চোখমুখ জ্বলজ্বল করিতেছে। অতি মধুর কণ্ঠে একটি কথা বলিয়াই ধীরে ধীরে উপরে উঠিতেছেন—'এই আমাদের মায়ের রূপ, যিনি ঠাকুরের সঙ্গে এসেছিলেন।'

রাত্রি ১০-১৫ মিনিট।

৩

আজ কলিকাতা ভেনিস নগরীতে পরিণত। সুবৃহৎ রাজপথসমূহ জলমগ্ন। দুইদিকে অট্টালিকাসমূহের মধ্য দিয়া নদী বহিয়া যাইতেছে। এইরূপ অসংখ্য নদী। কোন কোন স্থলে জল জমিয়া গভীর হইয়াছে। তাহাতে ছোট নৌকা অনায়াসে চলিতে পারে। ট্রাম অশ্বযান প্রভৃতি বাহনসমূহ প্রায় বন্ধ। অপরাহ্ণ পাঁচটা হইতে মুষলধারে বারিপাত হইতেছে। এখন প্রায় আটটা। বৃষ্টি এখনও চলিতেছে। মহানগরী যেন কোন রাজচক্রবর্তীর প্রমোদ কানন হইয়াছে। কারণ, শোভায়মান করিবার জন্য যেন কৃত্রিম নদী সব প্রবাহিত।

যাহারা আফিসে কর্ম করে তাহারা অতি কষ্টে ফিরিতেছে। কেহ কেহ পোশাক, বুট প্রভৃতি পুঁটুলি বাঁধিয়া মাথার উপর রাখিয়া জল ভাঙ্গিয়া চলিতেছে। কেহ সব পরিয়া একেবারে ভিজিয়া চলিতেছে। কোনও রাস্তায় ভাড়াটিয়া মোটর গাড়ী দুইদিকে জলের ফোয়ারার সৃষ্টি করিয়া চলিতেছে। মর্টন স্কুলের সম্মুখে এত জল যে কাপড় উপরে উঠাইয়া চলিলে লজ্জা রক্ষা করা কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। আমাহার্স্ট স্ট্রীটের উত্তর প্রান্তে লাহাদের প্রাসাদের কাছে সাঁতার জল।

এই দুর্দিনেও কয়েকজন ভক্ত মর্টন স্কুলে আসিয়াছেন সৎসঙ্গ মানসে। মণি ও যোগেন নিকটেই থাকেন। তাঁহারা আসিয়াছেন। বড় অমূল্য আফিসের ফেরত বৃষ্টির পূর্বে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। জগবন্ধু এখানেই থাকেন। কিন্তু বৃষ্টির পূর্বে কার্যোপলক্ষে বাহিরে গিয়াছিলেন। তিনি এইমাত্র ফিরিলেন। এখন সাড়ে আটটা। শ্রীম বারান্দায় দাঁড়াইয়া এই দৃশ্য দেখিতেছেন।

শ্রীম (জগবন্ধুকে দেখিয়া সহাস্যে)—আপনিও জলে ভিজেছেন ? আহা, যেন মাছ হয়ে এয়েছেন।

শ্রীম দোতলার বসিবার ঘরে গিয়া বসিলেন ভক্তসঙ্গে। বড়

অমূল্য শাস্ত্রের ব্যাখ্যায় নানান জনের নানান মত, কোনটা নেওয়া যায়—এইসব কথা বলিতেছেন।

শ্রীম (অমূল্যর প্রতি)—পণ্ডিতদের শাস্ত্রব্যাখ্যা, ও-সব তো আছেই, আর থাকবেও। তারা শুধু টিকা-টিপ্পনী আর শ্লোক আবৃত্তি করে। অবতার যখন আসেন তখন আর একটি নূতন 'লাইট' পাওয়া যায়।

তপস্যা না করলে বেদাদি শাস্ত্রের অর্থ উপলব্ধি হয় না। তাই তো অবতার আসেন। এসে শাস্ত্রের অর্থ করেন।

আগে সাধন ভজন করে সিদ্ধ হয়ে তবে লেকচার দেওয়া যায়। শশধরকে তাই বলেছিলেন ঠাকুর, আর একটু শক্তি সঞ্চয় কর। আগে তাঁর আদেশ পাও, তবে লেকচার দিও। সিদ্ধ না হলে কোন্‌টা ভাল কোন্‌টা মন্দ তা জানা যায় না কিনা, তাই। আগে নিজে বোধে বোধ করতে হয়, তারপর অন্যকে উপদেশ। বালিতে চিনিতে মিশানো আছে। বালি ছেড়ে চিনি নাও। কিন্তু কাঁচা অবস্থায় এ সব বোঝা যায় না। তাই যেমন blind leading the blind—'অন্ধেন নীয়মানাঃ যথান্ধাঃ' হয়ে পড়ে।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—তা আপনাদের ভয় নেই। আপনারা সর্বদা তাঁর চিন্তা করছেন। ঠাকুরকে ডাকছেন। কষ্টিপাথর পেয়েছেন। যেমন সোনা পেলেই কষ্টিপাথরে ঘষে পরীক্ষা করে তবে নেয়, তেমনি আপনাদের কষ্টিপাথরে যা পান তাই মিলিয়ে নেবেন। তাই তিনি বলেছেন, 'আমাকে ধ্যান করলেই হবে। আর কিছু করতে হবে না।' তাঁর কথা কি অন্যথা হতে পারে? সব সত্য।

একটি ভক্ত ভাবিতেছেন—কি আশ্চর্য! বহির্জগতের এই দুর্যোগেও ভক্তদের অন্তর্জগতে সাম্য সংস্থাপনের কি চেষ্টা এই মহাপুরুষের!

শ্রীম (জগবন্ধুর প্রতি)—অবতারের আর একটি কাজ, তিনি এসে কর্ম কমিয়ে দেন। কিসে অবসর পায় লোক তা বলে দেন। এই যে body-wearing and soul-killing labour (হাড়ভাঙ্গা প্রাণঘাতী পরিশ্রম), এ থেকে কিসে তাঁকে ডাকবার সময় পাওয়া যায় তা বলে দেন।

ডেভিড কপারফিল্ড বেশ বলেছিলেন—সুখ ও দুঃখের definition and philosophy (সংজ্ঞা আর তত্ত্ব)। একটা বইতে আছে। একশ পাউণ্ড income (আয়), আর নিরানব্বই পাউণ্ড উনিশ শিলিং ছ পেন্স্ expenditure (ব্যয়)। রইলো ছ পেন্স্ balance (বাকি)। Result—happiness (ফল—সুখ)। আর একশ পাউণ্ড income (আয়), একশ পাউণ্ড ছ পেন্স্ expenditure (ব্যয়)। No balance (বাকী কিছুই নাই)। Result—misery (ফল—দুঃখ)।

এই হচ্ছে human calculation (মানুষের হিসাব)। এই সুখ এই দুঃখ। কিন্তু ঠাকুর দেখতেন, কিসে তাঁকে ডাকবার সময় হয়। তিনি যে সুখস্বরূপ।

ডাল ভাতের যোগাড় হলেই হলো। একশ টাকা পাচ্ছে, কোনও রকমে চলে যাচ্ছে। তিনখানে তিনটা 'টুইশন' করলে তিন তিরিশে নব্বই টাকা হলো। একশ প্লাস নব্বই আয় হলো। Human calculation এ (মানুষের হিসাবে) এ বেশ। কিন্তু সময় কই তাঁকে ডাকবার। ভক্তরা যাতে এরূপ না ভাবে, যাতে তাঁকে ডাকবার সময় পায়, ঠাকুর অবতার-পুরুষ এইটা দেখতেন সর্বপ্রথম।

বড় অমূল্য—'ভাগবত-ভক্ত-ভগবান'—কেশব সেন এইটে স্বীকার করলেন। কিন্তু 'গুরু-কৃষ্ণ-বৈষ্ণব' বলতেই কেন বললেন—থাক্ থাক্ আজ এই পর্যন্ত।

শ্রীম—কৃষ্ণকে অবতার বলে মানবেন না। মানুষ কি করে ঈশ্বর হবে, এই সংশয়।

বড় অমূল্য—ঠাকুর বেশ argument (যুক্তি) দিয়ে সব বোঝাতেন।

শ্রীম—তাঁর argument (যুক্তি) কি আমাদের মত? সব revelation (দৈব অনুভূতি)—সব সত্য। বলতেন, এই মুখ দিয়ে ভগবান কথা কন।

বেদ মানে revelation (ভগবদ্বাক্য)। এটি অনন্ত কাল ধরে হচ্ছে, তাই বেদ অনন্ত। কেউ কেউ একটু একটু রেকর্ড

করেছে। তিনি সর্বদাই কথা কন। তাঁর কথা যোগীরা শুনতে পান গভীর রাতে।

এইবার ডাক্তার ও বিনয় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের সর্বশরীর নগ্ন ও জলসিক্ত। কাশীপুর বাসা প্রায় সাড়ে চার মাইল দূরে। 'ট্যাক্‌সী' করিয়া এক টাকা চৌদ্দ আনা দিয়া মাণিকতলা আর আমহার্স্ট স্ট্রীটের মোড়ের নিকট আসিয়াছেন। তারপর গভীর জল। গামছা পরিয়া জামা কাপড়ের পুঁটুলি মাথায় নিয়া এক রকম সাঁতরাইয়া আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহারাই ঠিক মাছের মত ভিজিয়া আসিয়াছেন। শ্রীম তাঁহাদিগকে দেখিয়া প্রথমে বিস্মিত, পরে আনন্দিত হইলেন। উঠিয়া গিয়া তাঁহাদের কাছে দাঁড়াইয়া শীঘ্র কাপড় পরাইলেন, পাছে অসুখ হয়। সকলে ঘরে বসিলে, পূর্বে যা সব ঈশ্বরীয় কথা হইয়াছে আজ, সব কথা পুনরায় বলিলেন। আর বলিলেন, খেয়ে এসেছেন তো? তা হলে সেদিনের (বায়স্কোপ দেখার দিনের) মত এখানে শুয়ে থাকলেও হয়, নেহাত বাড়ী যাওয়ার দরকার না থাকলে।

আহা, ঠাকুর এমন সব দেখে কাঁদতেন—অত কষ্ট করে এয়েছে দেখলে। দমদমা থেকে সেপাইরা তিন ঘণ্টার ছুটি পেয়ে কষ্ট করে তাঁকে দর্শন করতে আসতো। ঠাকুর মায়ের নিকট তাদের জন্য প্রার্থনা করতেন, মা, এদের কিন্তু মঙ্গল করতেই হবে। এরা অত কষ্ট করে তোমার কাছে আসে।

আজ শ্রীমর সর্দি হইয়াছে। তাহার জন্য তেল মাখিবেন, কি ঔষধ খাইবেন ভক্তদের জিজ্ঞাসা করিতেছেন। বলিতেছেন, আপনারা কেউ হোমিওপ্যাথিক ঔষধের ব্যবস্থা জানেন?

দেওঘর বিদ্যাপীঠ হইতে স্বামী সম্ভাবানন্দ লিখিয়াছেন, 'এখানে চলে আসুন। এখানে এলেই শরীর ভাল হয়ে যাবে।' শ্রীম ভাবিতেছেন, কি করিবেন।

সভা ভঙ্গ হইল নয়টায়। ডাক্তার, বিনয় ও গদাধর দোতলার ঘরে জগবন্ধুর সঙ্গে রাত্রিবাস করিলেন।

আজ শ্রীমর সর্দিজ্বর হইয়াছে। তিনতলায় উত্তরের কোণের ঘরে রহিয়াছেন। উপরে কিম্বা নিচে যান নাই—বিছানায় শুইয়া আছেন। দ্বিপ্রহরের পর ডাক্তার বক্সী বাড়ী হইতে স্টোভ, গোলমরিচ-চূর্ণ ও মিছরি আর বেদানা নিয়া আসিয়াছেন। গরম গরম মরিচ-মিছরি শ্রীম পান করিতেছেন। অসুখে শ্রীম ঔষধ অতি সামান্য ব্যবহার করেন, তাহাও বেশীর ভাগ হোমিওপ্যাথিক কিম্বা কখনও আয়ুর্বেদিক। কিন্তু পথ্যাদির ব্যবস্থা পালন করেন।

এখন বেলা দুইটা। শ্রীম একজন ভক্ত শিক্ষককে স্কুলের অফিস হইতে ডাকাইয়া আনাইলেন। তিনি বিছানায় লম্বা হইয়া প্রুফ দেখিতেছেন, কপি ধরিয়াছেন শিক্ষক। শ্রীমর চোখের দুই কোণ বহিয়া জল পড়িতেছে। শিক্ষককে জলখাবার খাইতে দিলেন, বড় বড় দুইটি বেগুনভাজা সঙ্গে চারিখানা লুচি।

প্রথম ভাগ পঞ্চদশ খণ্ড পড়া হইতেছে। ডাক্তার মহেন্দ্র সরকারের কথা। মৃত্যুসম রোগযন্ত্রণা নিয়া ঠাকুর ডাক্তার সরকারের সঙ্গে আনন্দে গভীর তত্ত্বালোচনা করিতেছেন। দেখিতে দেখিতে শ্রীম বিছানায় উঠিয়া বসিলেন। যেন অসুখ আর নাই—বদনমণ্ডল সুপ্রসন্ন। প্রুফ দেখা বন্ধ করিয়া কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (স্বগত)—হায়, আমার এই একটু সর্দি, তাতেই উঠতে পারি না। আর ঠাকুরের কত কষ্ট, তবুও কত কথা কইছেন।

শ্রীমর সপ্ততি বর্ষ অতীত হইয়াছে। মুহূর্তের মধ্যে চেহারা বদল হইয়া গেল। ' রোগ আর নাই। 'শিক্ষকটি অবাক্ হইয়া ভাবিতেছেন, এ কি বহুরূপীর ভাব! এই বৃদ্ধ শরীর, অসুখ। কথা কহিতে কত কষ্ট, ক্ষীণ স্বর। আহার হয় নাই। এই সব উপসর্গ চলিয়া গেল। যুবকের তেজ যেন ফিরিয়া আসিয়াছে। মুখমণ্ডল উজ্জ্বল। ইহাই কি 'বিদেহ'! শ্রীম পুনরায় আনন্দে কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (শিক্ষকের প্রতি)—সাদা বাড়ীতে হাতে যখন বিছাতে

কামড়িয়েছিল—কত যন্ত্রণা। কতজনে কত ঔষধ দিচ্ছে কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। ঠাকুরের রোগক্লিষ্ট চেহারা—তাতে ভাবসমাধি, আবার পরমানন্দে ঈশ্বর নাম-গুণ কীর্তন—এই সব কথা যেই মনে হলো অমনি সব কষ্ট দূর হয়ে গেল। আমার যেন কিছুই হয় নাই। বিছার কামড়ের কত যন্ত্রণা, তার লেশমাত্রও নাই। ঐ একটি হয়েছিল অতি আশ্চর্য পরীক্ষা।

নিকটে একটি ছোকরা বসিয়া আছে। শ্রীমর পরিবারে কাজ করে। বেশ ভক্ত লোক। শ্রীম তাহাকে ভালবাসেন। কিন্তু পরিবারের অপরের ইচ্ছা নয় সে থাকে। কি করিয়া দশজনের সঙ্গে থাকিতে হয়, তাহাকে তাহার উপদেশ দিতেছেন।

শিক্ষক ভাবিতেছেন, একেই বুঝি সমদর্শী বলে। এই সামান্য একটি কর্মচারী। তাহার প্রতি কি স্নেহ, কি প্রেম—যেন আপনার লোক!

শ্রীম (ছোকরার প্রতি)—আহারের পর নিদ্রাটা ঠাকুরবাড়ীতেই সেরে নেবে। রাগ বশ করতে হয় কি করে জান? জপ করতে হয় রেগে গেলে। আর রাগী লোককে বশ করতে হলে অগোচরে তাদের সেবা করতে হয়। তাদের কাজ করে রাখতে হয়। বাজার থেকে ডাল চাল ঘি নুন তেল আটা এলে, ওরা ভাঁড়ারে এ সব খোলা রেখে দেয়। তুমি বাজার থেকে ঢাকনা কিনে এনে ঢেকে রেখে দেবে। ওদের এ সব কথা বলো না। আর অবসর হলে জপ করবে—ঠাকুরঘরের বারান্দায় বসে।

মা ঠাকরুন বসতেন ওখানে। কত রাত কাটিয়েছেন ঠাকুরবাড়ীতে। এটা একটি তীর্থ। ওখানে বসে একজন সিদ্ধ হয়ে যেতে পারে। পার্টিশান হওয়ার পূর্বে স্বামীজী ও বাড়ীতে সর্বদা যেতেন। তারপর রাখাল মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ), কালী (স্বামী অভেদানন্দ), গিরিশবাবু, বাবুরাম (স্বামী প্রেমানন্দ), নিরঞ্জন, খোকা (স্বামী সুবোধানন্দ), হরি মহারাজ (স্বামী তুরীয়ানন্দ) প্রভৃতি ঠাকুরের ভক্তগণ সকলেই যেতেন সর্বদা। এর পরের সিঁড়ির

শুকুল, সুধীর, কালীকৃষ্ণ প্রভৃতি যাওয়া-আসা করেছেন। ডাক্তার কাঞ্জিলালের দীক্ষা হয় ঐ ঠাকুরবাড়ীতে।

শিক্ষক—ওখানে যাঁরা পূজা করেছিলেন তাঁরাও সাধু হয়েছেন।

শ্রীম—হাঁ, কৃষ্ণানন্দ, সনৎ (স্বামী প্রবোধানন্দ), মহেন্দ্রবাবু (মর্টনের শিক্ষক) এঁরা সব।

ঐ বাড়ীতে কি কম কাণ্ড হয়েছে! কোথাও কিছু নেই, জানালা ঠক্ ঠক্ ঠক্ নড়ছে। বাইরের লোক মনে করছে ঘরে হচ্ছে, ঘরের লোক মনে করছে বাইরে হচ্ছে। কত দিন সমানে এই চলছে। বিজাতীয় লোক গেলে—অর্থাৎ যারা সাধন-ভজন করে না অমন লোক গেলে, ঘরের জিনিসপত্র ছুঁড়ে উঠোনে ফেলে দিত—ইঁট, চুন, সুরকি, চাবির ছড়া। 'কথামৃতে'র কাগজ থাকে এক ঘরে। সেখান থেকেও জিনিসপত্র ফেলে দিত। ডাক্তারবাবু (কার্তিক বক্সী) জানেন। ফকিরবাবু (মর্টনের শিক্ষক) বারান্দায় বসে আছেন। হঠাৎ একটা জামবাটী এসে পড়লো সামনে ধপ করে। ঠাকুরের ঘরের জিনিস সব উল্টো পাল্টা হয়ে থাকতো। গিন্নী (শ্রীমর ধর্মপত্নী, শ্রীশ্রীঠাকুরের ভক্ত) বলেন, 'মাঝে মাঝে ঠাকুর-ঘরের শিকল কে যেন দিয়ে রাখে। খোলা রেখে এলাম, গিয়ে দেখছি শিকল দেওয়া।' এত সব দেখে মহেন্দ্রবাবু সাধু হলেন। তবুও কি লোকের চৈতন্য হয়!

শুনেছি ঠাকুরের সঙ্গে নন্দী-ভৃঙ্গী থাকে। ওরা বিজাতীয় লোক সরিয়ে দেয় এই করে। তখন family (পরিবার) ছিল ঐ বাড়ীতে। যেই ওদের সরিয়ে আমি গেলাম তখন কোথাও কিছু নেই। আট দশ দিন এমন হয়েছিল। পাড়ার লোক সব অবাক্!

অপরাহ্ণ তিনটা এখন।

শ্রীম তিনতলার কোণের ঘরেই সারাদিন রহিয়াছেন—অসুস্থ। সন্ধ্যার পর ভক্তসভাও সে ঘরে বসিয়াছে। বড় জিতেন, বিনয়, মনোরঞ্জন, বড় অমূল্য, যোগেন, মণি প্রভৃতি আসিয়াছেন। জগবন্ধু বেলেঘাটা হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। শুকলালকে সংবাদ দিতে

শ্রীম পাঠাইয়াছিলেন। রাত্রি এখন নয়টা। শ্রীম আনন্দে ঈশ্বরীয় কথা কহিতেছেন। -

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—অবতার এসে বললে কি শোনে লোক! 'লেপার ল্যাজারাস্' একজন ছিলেন। ব্যাঙ্কোয়েট (ভোজ) একজন ধনীর বাড়ীতে। মহাব্যাধিগ্রস্ত ল্যাজারাস্ দ্বারে দাঁড়িয়ে ভিক্ষা চাইলে। কিন্তু দিলে না। ক্ষুধায় সে মরে গেল। তাকে স্বর্গে এব্রাহাম কোলে তুলে নিলেন। ধনীরও তারপর মরণ হলো। সে নরকে গেল। সেখানে তার জল পিপাসা পেয়েছে। সে 'জল জল' বলে চীৎকার করছে। আর্তনাদ শুনে ল্যাজারাস্ জল দিতে অগ্রসর হলো। এব্রাহাম বললেন, 'ওগো, তুমি যাচ্ছ কোথায়? স্বর্গ থেকে নরক দেখা যায় বটে কিন্তু যাবার উপায় নাই—impossible!' ধনী তখন অনুরোধ করলে, তুমি আর একটি উপকার কর। পৃথিবীতে গিয়ে আমার আত্মীয়দের বলে এসো, স্বর্গ নরক আছে। ইনি কাপড় বগলে করে রওনা হচ্ছেন। এব্রাহাম আবার বললেন, তুমি এই কথা বলতে গেলে, ওরা তোমায় imposter (প্রবঞ্চক) মনে করবে।

অবতার এসে বলে গেলেন, শুনলে না কেউ। আর তোমার কথায় হচ্ছে! অবতারের কথা শোনে কে?

বেলুড় মঠের আম ঠাকুরবাড়ীতে ভোগ দেওয়া হইয়াছে। ভক্তগণ সেই প্রসাদ লইয়া বিদায় হইলেন। রাত্রি দশটা।

পরের দিন শনিবার। শ্রীমর শরীর আজ অনেকটা ভাল। দোতলার সিঁড়ির ডানের ঘরে নামিয়া আসিয়াছেন। ভক্তরা অনেকে আসিয়াছেন। ভাটপাড়ার ললিত, বড় জিতেন, বীরেন, মনোরঞ্জন, সুরপতি, ভূপতি মহারাজের ভক্ত, সুরেন গাঙ্গুলী, অমৃত, দুর্গাপদ, জগবন্ধু প্রভৃতি উপস্থিত আছেন। যোগেন আজ ৺দক্ষিণেশ্বর গিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত শ্রীমর ঐখানকার কথা হইতেছে। এখন সন্ধ্যা সাতটা।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—কিরণবাবুর ম্যানেজমেণ্ট মানে মঠেরই ম্যানেজমেণ্ট। প্রায়ই শুনতে পাই, রামলালদাদা মঠে আসেন।

সব বিষয়েই মঠকে consult (জিজ্ঞাসা) করেন। বেশ হয়েছে। একজন individual (বিশেষ) লোকের কাছে না থেকে একটি organisation-এর (সঙ্ঘের) হাতে পড়েছে। এতে বেশ হবে।

শ্রীম (দুর্গাপদর প্রতি)—নহবতটা কবে হবে? তা হলে বেশ হয়। আহা, সেই ধ্বনি! আমার দু'টি dream (স্বপ্ন) ছিল। একটি, দক্ষিণেশ্বর মঠের হাতে আসুক। আর একটি, কাশীপুর বাগান। একটি realised (পূর্ণ) হয়েছে আর একটি বাকী। ওখানে এক বছর ঘরকন্না করেছিলেন ঠাকুর। কাঁকুড়গাছি ওরা মঠের হাতে না দিয়ে ভুল করছে।

কিরণবাবু নিয়েছেন, মানে মঠের নেওয়া হলো। ঠাকুর বলতেন, 'হাতির দু'রকম দাঁত আছে, বাইরের ও ভিতরের। বাইরের দাঁত শোভা বাড়ায়। কিন্তু কাজ করে ভিতরের দাঁত।' কিরণবাবু বাইরের শোভা। কিন্তু ভিতরের দাঁত মঠ।

ভূপতি মহারাজের শিষ্য ৺পুরীর মহাপ্রসাদ লইয়া আসিয়াছেন, একেবারে টাটকা প্রসাদ। ভক্তসঙ্গে শ্রীম মহানন্দে উহা গ্রহণ করিলেন। শ্রীম অতি আহ্লাদের সহিত বলিতেছেন, জগন্নাথ প্রসাদ পাঠিয়ে দিয়েছেন। Repeated call (পুনঃ পুনঃ আহ্বান), আবার প্রসাদ—এই কথা বলিতে বলিতে উত্তরাস্য হইয়া পশ্চিমের দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। পুনরায় দক্ষিণাস্য হইয়া বসিয়া পড়িলেন। তারপর একথা-সেকথা চলিতেছে। শ্রীম বলিলেন—অবতার বলেছেন, 'আমার চিন্তা কর। আর কিছু করতে হবে না'—ঠাকুরের এই বাক্যটি ভাবতে ভাবতে আপনারা বাড়ী যান।

কলিকাতা, মর্টন স্কুল। ১২ই অক্টোবর ১৯২৩ খ্রীঃ
২৫শে আশ্বিন ১৩৩০ সাল। শুক্রবার, রাত্রি দশটা।

একাদশ অধ্যায়

বেলুড় মঠে দুর্গোৎসবে ও দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে বনভোজনে শ্রীম

১

শ্রীম মর্টনের তিনতলার উত্তরের ঘরে শুইয়া আছেন। শরীর অসুস্থ। শুইয়াই 'কথামৃতের' প্রুফ দেখিতেছেন। কপি ধরিয়াছেন জগবন্ধু। প্রথম ভাগের শেষ ফরমা দেখা শেষ হইলে, শান্তি উহা লইয়া বালকৃষ্ণ প্রেসে গেলেন। এখন অপরাহ্ন ছয়টা।

দোতলার সিঁড়ির ডানদিকের ঘরে ভক্তগণ অপেক্ষা করিতেছেন। আজ ১৪ই অক্টোবর ১৯২৩ খ্রীঃ, ২৭শে আশ্বিন ১৩৩০ সাল। রবিবার বলিয়া অনেকে আসিয়াছেন। ভাটপাড়া হইতে ললিতবাবু আসিয়াছেন। আর আসামের একটি ডাক্তার অনেকক্ষণ বসিয়া আছেন। পাইকপাড়া হইতেও একজন ভক্ত আসিয়াছেন। অসুস্থ শরীর লইয়াই ছয়টার পর শ্রীম দোতলায় নামিলেন, আর আনন্দে ঈশ্বরীয় কথা কহিতে লাগিলেন।

আসামের ডাক্তার—ঈশ্বর, ব্রহ্ম কি?

শ্রীম—ও-কথা মুখে বলা যায়। ঠাকুরকে জিজ্ঞেস করলে বলতেন, এ বলবার জিনিস নয়। যার দর্শন হয়েছে সে-ই জানে। তপস্যা করতে হয় নির্জনে গোপনে ব্যাকুল হয়ে কেঁদে। ঠাকুর নিজে করে দেখিয়ে গেছেন। পঞ্চবটীতে পড়ে থাকতেন। কত সাপ চলে যেতো উপর দিয়ে, হুঁশ নেই। তিনি ষোল টান করেছিলেন, অন্তদের দু'চার টান করা উচিত।

উপনিষদে আছে young (যুবক) ঋষিরা সমিধ হস্তে বৃদ্ধ ঋষির নিকট উপস্থিত। দেখেই বলছেন, 'তোমরা বাবা এক বছর তপস্যা করে এসো, তখন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করো।' এমনতরো ব্যাপার! এক বছর তপস্যা করলে তবে প্রশ্ন ঠিক হয়। নয় তো, কি বলতে কি বলে ফেলে। Young (যুবক) ঋষিরা শাস্ত্র-টাস্ত্র পড়ে গেছে কিনা।

এক বছর তপস্যা, মানে চেষ্টা করলে, তবে জিজ্ঞাস্য বিষয় স্থির হবে। তারপর জিজ্ঞাসা।

ঠাকুর বলতেন, এই কলকাতার লোকগুলি বড্ড লেকচার দেয়। বিডন স্ট্রীটে একটি ছেলে লেকচার দিত। ঠাকুর শুনে বললেন—ওমা, এরই মধ্যে সব হয়ে গেল—ওর যৌবন, বার্ধক্য। লেকচার দিলে শুনবে কে? শশধর পণ্ডিত ছিলেন একজন, ঠাকুর তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তুমি নাকি লেকচার দেও? আদেশ পেয়েছ কি? তিনি উত্তর করলেন, না। তবে তোমার কথা শুনবে কে? ঠাকুর বললেন। এমনতরো কাণ্ড।

ঠাকুর বলেছিলেন, ভগবান দর্শনের পরও যাঁরা কাজকর্ম করেন, তাঁরা কেবল তাঁর আদেশ করেন। যেমন নারদ, শুকদেবাদি। শুকদেব নারদের নিকট শুনলেন, ভগবান বলেছেন, শুকদেব পরীক্ষিৎকে ভাগবত শোনাবে। তবেই তিনি ভাগবত শুনিয়েছিলেন। তাতে সকল জীবেরই কল্যাণ হলো। আদেশ যিনি পেয়েছেন, তাঁর এ সব কর্ম করলে দোষ নাই। আদেশ পেলে মূর্খের কণ্ঠে সরস্বতী নিবাস করেন। যীশুর কথা শুনে, বার বছরের ছেলে তখন, বড় বড় পণ্ডিতেরা অবাক্ হয়ে গিছলেন। আর জুদের বড় বড় ডক্টররা বলেছিলেন, Is not this the carpenter's son? Whence then hath this man all these things? Never man spake like this man. For he taught them as one having authority. ছুতোর জোসেফের এই নিরক্ষর ছেলের এত জ্ঞান কোত্থেকে এলো? সব অলৌকিক ব্যাপার।

শুকলাল, শচী, যোগেন ও ছোট ললিত একসঙ্গে গৃহে প্রবেশ করিলেন।

শ্রীম (শুকলালের প্রতি)—Question (প্রশ্ন) হয়েছিল, কি কাজ করবো? ঠাকুর শুনে বললেন, কাজের তো শেষ নেই। কাজ করা চিত্তশুদ্ধির জন্য। চিত্তশুদ্ধি সামান্য কাজেই হতে পারে। তা হলে কি দরকার বেশী করে? গুরু যে কাজ করতে বলেন, তা

করলেই বন্ধনমুক্ত হওয়া যায়। কাজের তো অন্ত নাই, একটার পর আর একটা আসছেই। Success (সাফল্য) হলে আরো উৎসাহ হয়। এই করে করে হঠাৎ একদিন চলে গেল। আর কিছুই হলো না। কর্ম তো অনন্ত। আর অনন্তকাল থাকবেও। গুরু যা বলেন, তাই আমাদের করা উচিত।

ডাক্তার ও বিনয় প্রবেশ করিলেন—একটু পরই বীরেন আর অমৃত আসিলেন।

শ্রীম (নবাগতদের প্রতি)—ছোকরারা দু' এক পাতা ইংরেজী পড়ে, 'duty, duty' (কর্তব্য, কর্তব্য) করে। আর কার duty (কর্তব্য) কে করে তার নেই খোঁজ।

ও-দেশে (ওয়েস্টে) একটা কথা আছে, dying in harness ঘোড়া খাটতে খাটতে লাগাম শুদ্ধ হঠাৎ মরে গেল। মানে, কাজ করতে করতে মরে গেল। ম্যাকস্‌মুলার 'হিবার্ট লেক্‌চারে' সমালোচনা করেছেন এই কথার—কি বাহাদুরী ঐ কথা বলা!

ঋষিরা যা বলে গেছেন—ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস—এই সব কি মিথ্যা হলো? বানপ্রস্থ কি সুন্দর! সব ছেড়ে শুধু তাঁকে কিসে লাভ হয় সেই কাজ করছে। ঋষিদের বাক্য সব সত্য।

ম্যাকস্‌মুলার এখানকারই লোক। ঠাকুর ওঁকে ও-দেশে পাঠিয়েছেন। ঋষিদের ধর্ম ও-দেশে প্রচার করবেন বলে। ঠাকুর কি শুধু ইণ্ডিয়ার জন্যই ভেবেছেন? ইউরোপ, আমেরিকার জন্যও ভেবেছেন। সবই তো তাঁর। তাই ম্যাকস্‌মুলারকে ওখানে রেখেছেন। শুনতে পাই, আজকাল জার্মানীর better minds (মনীষীগণ) ইণ্ডিয়ার দিকে দৃষ্টি করছেন।

আসামের ডাক্তার (আমতা আমতা করিতে করিতে)—তা হলে আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য ভগবানকে লাভ করা?

শ্রীম—ঠাকুর বলতেন, ঈশ্বরদর্শনই মনুষ্যজীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য। অনেকে hallucination (মনোবিকার) বলতো ঠাকুরের দর্শনাদিকে। ঠাকুর মাকে (জগদম্বাকে) জিজ্ঞাসা করায় মা বললেন, তা কেমন করে হয় বাছা! আমি যা বলি, সে সব যে মিলে যাচ্ছে! জগন্মাতা

ঈশ্বর, ঠাকুরকে দর্শন দিয়ে যে সব কথা বলেন ঠাকুরের মুখ দিয়ে, তা যে মিলে যাচ্ছে, বাস্তব হচ্ছে! তা হলে আর কি করে মনের ভ্রম বলা যায়।

আসামের ডাক্তার—আমরা কত ধন্য—এঁদের শ্রীমুখে এ সব কথা শুনছি।

শ্রীম—ধন্য কি শুধু এক রকমে! বিবেক-চূড়ামণিতে আছে, প্রথম ধন্য, মনুষ্যদেহ লাভ। দ্বিতীয়, মুমুক্ষুত্ব—ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুল। তৃতীয়, এই দেশে জন্ম, যেখানে পথে ঘাটে রাস্তায় বেরুলেই উদ্দীপন হয়। এই দেখুন না, কাল (বিল্বষষ্ঠী) থেকে এই কলকাতা শহর কৈলাস-সদৃশ হয়ে যাবে। গলিতে গলিতে জগদম্বার পূজা। কলকাতা এখন স্বর্গ-সদৃশ হয়ে যাবে। আর কত মহাপুরুষ এ দেশে! রাস্তায় ঘাটে সর্বত্র সাধুদর্শন হচ্ছে। তাঁদের দেখলে ভগবানকে মনে পড়ে। আর কোথায় পাবে জগতে এ-টি?

ওয়েস্টে কি আছে? ভোগ আর ভোগ। এখানে প্রধান কথা—ত্যাগ। ও-দেশের civilisation (সভ্যতা) ভোগপ্রধান, ভারতের সভ্যতা ত্যাগপ্রধান।

চতুর্থ ধন্য—অবতার এসেছেন এখানে টাটকা একেবারে। পরমহংসদেব অবতার ছিলেন কিনা! তাঁকে কি আর কেউ বানিয়েছে অবতার—যেমন পাঁচজনে মিলে অবতার দাঁড় করায় আজকাল? আহা, তা হলে তিনি যে কৃতার্থ হয়ে যেতেন আর কি! তা নয়। ঠাকুর নিজে বলেছেন, আমি অবতার। অর্জুন বলেছিলেন শ্রীকৃষ্ণকে, যেখানে তুমি বলছো তুমি অবতার, তাই অবতার—'স্বয়ঞ্চৈব ব্রবীষি মে'। এ কি মানুষে করা অবতার!

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—ব্রজেন্দ্রবাবুর বাড়ীতে পড়লাম একটা বইতে। অক্সফোর্ডের একজন গ্রাজুয়েট লিখেছেন, যুদ্ধের (প্রথম বিশ্বযুদ্ধ) সময় বৃটিশদের যুদ্ধের দৈনিক খরচ বেড়ে বেড়ে দেড় ক্রোর থেকে তিন ক্রোর হলো। ফ্রান্স, জার্মানী সকলের এরূপ খরচ হচ্ছিল। শেষে তিনি বলছেন, 'ইংরেজরা ইণ্ডিয়া থেকে কি এনেছে? না,

কতকগুলি কড়র-মড়র, মানে টাকা-পয়সা। আর এই তো সেই টাকা-পয়সার পরিণাম—কাটাকাটি মারামারি! রক্ত শোষণ করে এনেছে আর মারামারিতে এখন খরচ হচ্ছে। কি লাভ হলো, সব তো গেল! মাঝে থেকে অপরের হিংসাদ্বেষের পাত্র হলো। তাদের যে অমূল্য ধন, অতুল ঐশ্বর্য—eternal life—অমৃতত্বম্, তার সন্ধান পেল না।' বেশ কিন্তু লোকটি।

শ্রীম (ভাটপাড়ার ললিতের প্রতি)—হাঁ, ললিতবাবু, আপনার গাড়ীর সময় হলো কি? সময় থাকে তো আপনার ঐ দুর্গার প্রার্থনাটি বলুন না।

ললিত আবৃত্তি করিতেছেন—

ন মন্ত্রং নো যন্ত্রং তদপি চ ন জানে স্তুতিমহো।
পরং জানে মাতস্তদনুসরণং ক্লেশ হরণম্॥ ইত্যাদি।

সকলে উহা শুনিতেছেন আর ধ্যান করিতেছেন। আবৃত্তি শেষ হইলে পুনরায় ঈশ্বরীয় কথা চলিতেছে।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—স্বামী বিবেকানন্দ কয়েকদিন কালীর ধ্যান করে বললেন, 'মশায়, আমার কিছু হচ্ছে না।' ঠাকুর বললেন, 'হবে, ধৈর্য ধরে কর'। আর বললেন, 'তুমি যাকে ব্রহ্ম বল, আমি তাকেই কালী বলছি'।

ঠাকুর তখন অসুস্থ, কাশীপুরে রয়েছেন। একজন বললেন, 'চলুন দক্ষিণেশ্বর।' ঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেন?' তিনি উত্তর করলেন, 'মা আছেন ওখানে।' ঠাকুর বললেন, 'মা কি এখানে নেই?'

বড় ললিত প্রণাম করিয়া বিদায় লইলেন। শ্রীমও আহার করিতে উপরে গেলেন। এখন পৌনে' আটটা। যাইবার সময় বলিয়া গেলেন, দেবীভাগবত পাঠ হোক। ভক্তগণ দেবীভাগবত পাঠ শুনিতেছেন।

অন্তেবাসী কিছুক্ষণ পর উপরে গিয়া শ্রীমকে বলিতেছেন, 'ভক্তদের ইচ্ছা, আজ আর আপনি নিচে না যান—শরীর অসুস্থ। তাঁরা সকলে প্রণাম জানিয়েছেন।'

শ্রীম আর নিচে আসিলেন না। সভা ভঙ্গ হইল নয়টায়। ডাক্তারের গাড়ীতে বিনয় ও জগবন্ধু আজ কাশীপুর যাইতেছেন।

পরদিন বিল্বষষ্ঠী। বিনয় ও জগবন্ধু কাশীপুর হইতে প্রথম স্টীমারে মঠে যান। তিনটার সময় মর্টন স্কুলে তাঁহারা ফিরিয়া আসেন। মধ্যাহ্ন ভোজন করেন ডাক্তারের বাড়ীতে কাশীপুরে। শ্রীম তিনতলার বারান্দায় বসিয়া আছেন দক্ষিণ দিকে মুখ করিয়া বেঞ্চিতে। পাশেই প্রভাসবাবু, শ্রীমর জামাতা যোগেনবাবু এবং উভয়ের ছেলেরা সব দাঁড়াইয়া আছেন। শ্রীম তাঁহাদের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা কহিয়া ভক্তদের লইয়া পশ্চিমের ঘরের উত্তরের দরজার সামনে বারান্দায় চেয়ারে বসিয়া কথাবার্তা কহিতেছেন। বিনয় ও জগবন্ধু পশ্চিমের ঘরের ভিতর উপবিষ্ট। মঠের সব খবর তন্ন তন্ন করিয়া লইলেন। শ্রীম বলিলেন, আহা, সুকুল মহারাজ চলে গেল। সাধুর জন্য আর কে কাঁদে? কতদিন ধরে বলছিল—complain করছিল, শরীর ভাল না বলে।

নিচে আমহার্স্ট স্ট্রীট দিয়া কুলীরা একটি স্টীম রোলার টানিয়া লইয়া যাইতেছে। পরিশ্রম লাঘবের জন্য দুই দলে বিভক্ত হইয়া সারি গান গাহিতেছে। বেশ শোনা যাইতেছে। শ্রীম শুনিতেছেন আর কি ভাবিতেছেন—চক্ষু স্থির। গভীর নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া দুঃখপূর্ণ স্বরে বলিলেন, কি সুন্দর গাইছে ওরা! যেন বলছে, শরীর ধারণ করলে পরিশ্রম করতেই হবে। দুঃখকষ্ট থাকবেই—বিষণ্ণ হয়ো না।

গদাধর ঠাকুরবাড়ী হইতে ফলমিষ্টি প্রসাদ লইয়া আসিয়াছে। শ্রীম ভক্তসঙ্গে উহা গ্রহণ করিলেন। বিনয় ও জগবন্ধুকে পুনরায় মঠে পাঠাইয়া দিলেন। এইবার শচীও সঙ্গে গেল। মঠে আজ দেবীর বোধন। ঠাকুরঘরের বারান্দায় বোধনের আয়োজন হইয়াছে। ব্রহ্মচারী ক্ষুদিরাম পূজক আর স্বামী প্রণবানন্দ তন্ত্রধারক।

বেলুড় মঠে আনন্দের হাট। আজ দুর্গাপূজা আরম্ভ হইয়াছে, সপ্তমী তিথি। ঠাকুরঘর ও মঠবাড়ীর মধ্যস্থলে হোগলার মণ্ডপ প্রস্তুত হইয়াছে। নানা রংয়ের বস্ত্রে মণ্ডপের অভ্যন্তর সুসজ্জিত।

মা দুর্গার মৃন্ময়ী মূর্তি উজ্জ্বল পীতবর্ণ। দশহস্তে দশ প্রহরণ। মূর্তি আট ফুট উচ্চ। মায়ের ডাহিনে ও বামে লক্ষ্মী ও সরস্বতী, গণেশ ও কার্তিক। পদতলে মহিষাসুর। দেবী সিংহবাহিনী। চালচিত্রে শিবাদি দেবগণ সমাধিস্থ।

এই দুর্গোৎসব বাঙ্গালীর জাতীয় উৎসব। সন্ন্যাসীরা প্রায় উহা করেন না। স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকা হইতে প্রত্যাগমনের পর এই জাতীয় উৎসবে ব্রহ্মশক্তির অর্চনা সম্পাদন করিয়া জাতির নব-জাগরণের সূত্রপাত করেন। শ্রীরামচন্দ্র যেমন মহাদেবী শ্রীদুর্গার পূজা করিয়া তাঁহার আশীর্বাদে রাবণবধ করেন স্বামীজীও কি বাঙ্গালীর তথা ভারতের তমোরূপী অসুরকে বিনাশ করিবার জন্য দেবীর অর্চনা করিলেন। অদ্যাবধি প্রায় প্রতি বৎসর মঠে এই পূজা চলিতেছে।

বহু ভক্ত কলিকাতা হইতে আসিয়াছেন পূজা দর্শন-মানসে। সুগন্ধ ধূপধুনা ও পুষ্পাদির সৌরভে মঠভূমি ভরপুর। ভক্তগণ সম্মুখে বসিয়া পূজা দর্শন করিতেছেন। সাধুরা মণ্ডপের ভিতর বসিয়া কেহ জপ করিতেছেন, কেহ কেহ কালীকীর্তন করিতেছেন। ঠাকুরের সন্তানগণ অনেকে উপস্থিত। মহাপুরুষ মহারাজ (স্বামী শিবানন্দ) মঠেই থাকেন। শরৎ মহারাজ (স্বামী সরদানন্দ) ও কালী মহারাজ (স্বামী অভেদানন্দ) কলিকাতা হইতে আসিয়াছেন।

পূজারী মঠেরই একজন ব্রহ্মচারী—গরদবস্ত্র পরিয়া আসনে উপবিষ্ট, পাশেই তন্ত্রধারক মঠের একজন সন্ন্যাসী। পূজামণ্ডপ হইতে দেবীর ধ্যানমন্ত্র শোনা যাইতেছে :

ওঁ জটাজুটসমাযুক্তাং অর্দ্ধেন্দুকৃতশেখরাং।
লোচনত্রয় সংযুক্তাং পূর্ণেন্দুসদৃশাননাম্॥

অতসীপুষ্প বর্ণাভাং সুপ্রতিষ্ঠাং সুলোচনাং।
নবযৌবনসম্পন্নাং সর্বাভরণভূষিতাম্॥

* * *

অষ্টাভির্শক্তিভিস্তাভিঃ সততং পরিবেষ্টিতাম্।
চিন্তয়েৎ জগতাম্ ধাত্রীং ধর্মকামার্থমোক্ষদাম্॥

শ্রীম এইমাত্র মঠে আগমন করিয়াছেন বীরেন বোসের মোটরে। এখন বারোটা বাজিয়া গিয়াছে। মঠবাড়ীর উত্তর-পূর্ব কোণের ঘরে 'ভিজিটারস্ রুমে' ভজন হইতেছে। সেখানে কালী মহারাজ প্রভৃতি বসিয়া আছেন। উচ্চাঙ্গের ভজন চলিতেছে। শ্রীম দরজার সামনে দাঁড়াইয়া চুপি দিয়া দেখিয়া পশ্চিমের বারান্দায় উপস্থিত হইলেন। মহাপুরুষ মহারাজ ঠেস দেওয়া বেঞ্চিতে বসিয়াছিলেন। শ্রীমকে দেখিয়াই, 'এই যে মাস্টারমশায়, আসুন আসুন' বলিয়া আসন ত্যাগ করিয়া উঠিলেন এবং উভয়ে উভয়কে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। মহাপুরুষ মহারাজ নিজ হাতে একখানা ছোট তোশক বেঞ্চির উপর পাতিয়া দিলেন। দুইজনে বসিয়া আছেন। দেখিতে দেখিতে কালী মহারাজ, খোকা মহারাজ (স্বামী সুবোধানন্দ) ও কিশোরীবাবু ('আবদুল') আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

কালী মহারাজের সঙ্গে অনেক কথা হইতে লাগিল। শ্রীম তাঁহার গা টিপিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন 'কেমন আছ'? কালী মহারাজ হাত বাড়াইয়া দিয়া বলিলেন, 'এই দেখুন আমার হাতটা।' শ্রীম নাড়ী দেখিতেছেন। এইরূপ নানা রঙ্গরস হইতে লাগিল।

* * *

কালী মহারাজ—আপনার শরীর কেমন?

শ্রীম—For an old man যা হবার তাই।

কালী মহারাজ—মাস্টারমশায়, বুড়ো কি বলছেন। আচ্ছা বলুন, বুড়ো কি আপনি? আত্মার বুড়ো, জোয়ান আছে?

শ্রীম (সুর ধরিয়া রঙ্গচ্ছলে)—বি—চা—র করো না। বি—চা—র করো না।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—ঠাকুরঘর বুঝি বন্ধ হয়ে গেছে ?

(কালী মহারাজের প্রতি) তোমরা জয়রামবাটী ক'বার গিছলে ?

কালী মহারাজ—দু'বার। একবার আপনার স্ত্রী প্রভৃতি সঙ্গে যান। আঁটপুর যাওয়া হয়েছিল।

শ্রীম এইবার উঠিয়া মঠের ভাঁড়ার, রান্নাঘর, বাগান, পায়খানা—সব দেখিতেছেন। উৎসবের রান্নার ঘরও দেখিলেন।

দেবীর পূজা ও ভোগ হইয়া গিয়াছে। এইবার আরতি হইতেছে। তারপরই বিস্তৃত প্রাঙ্গণে ভক্তগণ প্রসাদ পাইতে বসিয়াছেন—প্রায় দেড় সহস্র পুরুষ। পাশের সোনার বাগানে নারী ভক্তগণ বসিয়াছেন। তাঁহারাও পাঁচ শতের অধিক।

স্বামী শিবানন্দ, সারদানন্দ, অভেদানন্দ, সুবোধানন্দ, কিশোরীবাবু, মাস্টার মহাশয় প্রভৃতি ঠাকুরের সাক্ষাৎ সন্তানগণ একসঙ্গে উপরের গঙ্গার ধারের বারান্দায় বসিয়া প্রসাদ পাইতেছেন।

ভোজনের পর শ্রীম ঠাকুরঘর দর্শন করিতেছেন। এখন খুলিয়াছে। তারপর ধ্যানঘরে গেলেন। এইবার মঠের নিচের পূর্বদিকের বারান্দায় আসিয়া বসিলেন—বড় বেঞ্চিতে। সম্মুখে পতিতপাবনী জাহ্নবী। 'লনে' ভক্তগণ কেহ বসিয়া, কেহ দাঁড়াইয়া, কেহ দক্ষিণেশ্বর দর্শন করিতেছেন। উত্তর-পূর্ব কোণে গঙ্গার অপর পারে ঝাউ গাছের অগ্রভাগ ও মন্দিরশীর্ষ বেশ দর্শন হইতেছে। এখন অপরাহ্ণ প্রায় চারটা।

মার্কিন মহিলা মিস্ ম্যাকলিওড আসিয়া উপস্থিত। শ্রীম উঠিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া পাশে বসাইলেন। এই বর্ষীয়সী মহিলা স্বদেশ ও স্বজন ছাড়িয়া ভগবানের জন্য এখানে বাস করেন। মঠেই থাকেন, স্বামীজীর আমেরিকা বিজয়ের ফল ইঁহারা।

হ্যাণ্ডশেকের পর আনন্দে তাঁহারা কথোপকথন করিতেছেন।

Miss MacLeod—Well Mr. M., why do you not write about Swamiji ? Only you have written about Sri Ramakrishna.

M.—The key is in His hand. One day in the Cossipore gardens Swamiji had the transcendental experience by Thakur's grace. Then Thakur remarked: 'I hold the key. The treasury will not be opened until you have finished my work.' So, the key rests with Sri Ramakrishna.

Miss MacLeod—Well Mr. M., what was the most outstanding feature of Sri Ramakrishna ?

M.—God-consciousness ! Not for a single moment did he lose it.

স্বামী অভেদানন্দ আসিয়া ঐ বেঞ্চে বসিলেন।

Miss MacLeod (to Swami Abhedananda)—Well, what was the most outstanding feature of Sri Ramakrishna ?

তিনি প্রশ্নটা বুঝিতে পারিলেন না, তাই আবার বলিলেন।

Miss MacLeod—Mr. M. says he was always God-conscious. What was he to you ?

Swami Abhedananda—A God-intoxicated man !

Miss MacLeod—And how did he teach—by question and answer, or how ?

Swami Abhedananda—No, he would go on speaking; and by that our questions were being answered of themselves. Once I asked him how did he know what was passing on in our mind. He told us, I can see everything through your eyes. Your eyes are like glass windows.'

এইবার স্বামী সারদানন্দ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পুনরায় সেই প্রশ্ন।

Miss MacLeod—Well Swami Saradananda, what was the most outstanding feature of Sri Ramakrishna ?

তিনিও প্রশ্ন ভাল বুঝিতে পারেন নাই। তাই পুনরায় বলিলেন।

Miss MacLeod—Mr. M. says, God-consciousness.

Swami Saradananda—Yes, that was the principal aspect, But there were other sides also according to the particular temperament of the Bhaktas.

M.—All ideals were centred round him.

Miss MacLeod (nodding)—Yes, true !*

---

* মিস্ ম্যাকলিওড—আচ্ছা মিষ্টার এম্ (শ্রীম), আপনি স্বামীজীর সম্বন্ধে লেখেন না কেন ? কেবল শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধেই লিখেছেন।

শ্রীম—চাবি ঠাকুরের হাতে। কাশীপুর বাগানে ঠাকুরের কৃপায় স্বামীজীর একদিন নির্বিকল্প সমাধি হয়েছিল। তখন ঠাকুর বলেছিলেন, 'চাবি রইল আমার হাতে। যতদিন না তুমি আমার কাজ শেষ করেছ ততদিন কোষাগার বন্ধ রইল।' তাই বলছি, সকল কাজের চাবি শ্রীরামকৃষ্ণের হাতে।

মিস্ ম্যাকলিওড—আচ্ছা মিস্টার এম, শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য কি?

শ্রীম—নিরবচ্ছিন্ন ব্রহ্মজ্ঞান! এক মুহূর্তের জন্যও ব্রহ্মচৈতন্য থেকে বিচ্যুত হন নাই।

মিস্ ম্যাকলিওড—আচ্ছা স্বামী অভেদানন্দ, আপনার কাছে শ্রীরামকৃষ্ণ-চরিত্রের কোন্ দিকটা সর্বশ্রেষ্ঠ বলে মনে হয় ? মিস্টার এম্ বলেছেন, নিরবচ্ছিন্ন ব্রহ্মসচেতনতা। আপনার কাছে তিনি কিরূপে প্রকাশিত ?

স্বামী অভেদানন্দ—একজন ব্রহ্মমদমত্ত মানব রূপে।

মিস্ ম্যাকলিয়ড—আর কি প্রণালীতে তিনি শিক্ষা দিতেন—প্রশ্নোত্তর দ্বারা অথবা অন্য উপায়ে ?

স্বামী অভেদানন্দ—না উনি আপন মনে বলে যেতেন। এতেই আমাদের সকল প্রশ্নের সমাধান হয়ে যেতো। একদিন আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম আমাদের মনের কথা কি করে তিনি জানতে পারেন। তাতে তিনি উত্তর করলেন, 'আমি চোখ দেখে সব জানতে পারি। চোখ দুটি যেন কাঁচের জানালা।'

মিস্ ম্যাকলিওড—আচ্ছা স্বামী সারদানন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনের উজ্জ্বলতম ভাবটি কি ? মিস্টার এম্ বলেন, নিরবচ্ছিন্ন ব্রহ্মসচেতনতা।

স্বামী সারদানন্দ—হ্যাঁ, ওটাই ছিল তাঁর সর্বপ্রধান ভাব নিশ্চয়। কিন্তু, ভক্তদের রুচি অনুসারে তাঁতে আরও অসংখ্য ভাব প্রকটিত হয়েছিল।

শ্রীম—সকল মহান্ আদর্শের সমন্বয়-বিগ্রহ শ্রীরামকৃষ্ণ।

মিস্ ম্যাকলিওড—(শির সঞ্চালনপূর্বক)—হাঁ, সত্য সত্য।

এইবার শ্রীম গঙ্গার ঘাটে বসিয়া আছেন। গঙ্গা স্পর্শ ও প্রণাম করিলেন। এইবার করে জপ করিতেছেন। তারপর গামছাখানা পকেট হইতে বাহির করিয়া জলে ভিজাইলেন। এখন উপরে উঠিতেছেন।

ঘাটের উপর গোস্তায় স্বামী অভেদানন্দ অপেক্ষা করিতেছেন— সঙ্গে মিঃ ডাউলিং। শ্রীম উপরে উঠিলে সাহেবকে তাঁহার সহিত পরিচয় করাইয়া দিলেন। দু'চার কথার পর পুনরায় স্বামী অভেদানন্দ শ্রীমর সঙ্গে কথোপকথন করিতেছেন।

স্বামী অভেদানন্দ—মাস্টারমশায়, আপনি বুড়ো, বলেন কি! বলুন, আপনার আত্মা বুড়ো হয়েছে কিনা? আপনি জন্মের খবর রাখেন কি, শুনেছেন কখনও? আমি কিন্তু এরূপ মনে করি না। 'বুড়ো বুড়ো' করলে বুড়ো হয়ে যায়।

শ্রীম (সহাস্যে)—তার জন্যই কি পালিয়ে এলে আমেরিকা থেকে—গলায় কি হওয়ার সম্ভাবনায়?

গুরুভাইদের মধ্যে রঙ্গরসের অভাব নাই—উপহাস পরিহাস কত কি। ঠাকুরের মত তাঁহাদেরও সকলের ভাব রসাল। এ সবের ভিতর একটি দেখিবার বিষয় আছে। পরস্পরের প্রতি কি শ্রদ্ধা ও প্রেম! একে অন্যকে যেন ঠাকুরের মতই শ্রদ্ধা করেন ও ভালবাসেন। হাসিতামাশা করিতে করিতে শ্রীম ও স্বামী অভেদানন্দ মঠের পশ্চিমের বারান্দায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মিঃ ডাউলিং বিদায় লইলেন।

মিস্ ম্যাকলিওড শ্রীমর সঙ্গে দক্ষিণ দিকে যাইতেছেন। শ্রীমকে তাঁহার আবাসস্থল 'গেস্ট হাউসে' লইয়া যাইবেন। মঠের দক্ষিণ সীমানার দোতলায় তাঁহার নিবাস। শ্রীম মায়ের মন্দির প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিতেছেন।

শ্রীম 'গেস্ট হাউসে'র দ্বিতলে। ভক্তিমতী ম্যাকলিওড আমেরিকা হইতে একখানি খাট আনাইয়াছেন। উহার উপর সুন্দর বিছানা। ইহার সম্বন্ধে কথা হইতেছে।

Miss MacLeod—On this couch Swamiji (Swami Vivekananda) used to sleep in our house.

M. (touching and saluting)—My hairs stand on their ends to touch it.

শ্রীমর সঙ্গে অনেক ভক্ত। তাঁহারাও স্পর্শ ও প্রণাম করিতেছেন। স্বামীজীর একখানা প্রতিকৃতি কাঁচে ঢালাই।

Miss MacLeod (to M.)—Look here. How beautiful is the image of Swamiji on this glass! And it was presented to me from the Bangalore Jail. একখানা চন্দন কাঠের 'টয়-কৌচ' (toy-couch) শ্রীমর হাতে দিলেন। তারপর ইংলণ্ডের স্টাফোর্ড (Stafford) নামক স্থানের মহাকবি সেক্সপিয়ারের বাড়ীর একখানা ফটো দেখিতেছেন। এই বাড়ী এখন মিঃ ও মিসেস্ লিগেট ক্রয় করিয়াছেন। ইঁহারা আমেরিকার বিশিষ্ট ভক্ত, শ্রীমতী ম্যাকলিওডের ভগিনীপতি ও ভগিনী। ঐ বাড়ীরই কথা হইতেছে।

Miss MacLeod—We have installed a stone statue of Swamiji there. That room is named 'Prophet's Chamber'. The Holy Mother gave me a pitcher. That is also preserved there.

স্বামীজী আমেরিকায় একটি পাইন বৃক্ষের নিম্নে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা দিয়াছিলেন। সেটি আর নাই। তাহার স্থলে অপর একটি পাইন বৃক্ষ জন্মিয়াছে। এই বৃক্ষের কয়েকটি পত্র পবিত্র স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ—যেন যক্ষের ধন। ভক্তিগদগদ স্বরে মিস্ ম্যাকলিওড শ্রীমকে বলিতেছেন, These are the few leaves of the Swamiji's pine; Are not they the sacred relics of Swamiji?

M.—Yes, very very sacred.*

---

* মিস্ ম্যাকলিওড—আমাদের বাড়ীতে স্বামীজী এই খাটে শয়ন করতেন।

শ্রীম (খাট স্পর্শ করিয়া প্রণামান্তে)—খাট স্পর্শ করা মাত্র আমার শরীর রোমাঞ্চিত হচ্ছে।

মিস্ ম্যাকলিওড (শ্রীমর প্রতি)—এই দেখুন কাঁচের উপর অঙ্কিত কি সুন্দর ছবি স্বামীজীর। বাঙ্গালোর জেল থেকে এটি আমায় উপহার দিয়েছিল।

শ্রীম খালি পায়ে সসম্ভ্রমে যুক্তকরে ঐ পত্রগুলি গ্রহণ করিয়া মস্তকে ধারণ করিলেন। সাধু ও ভক্তগণও স্পর্শ ও প্রণাম করিতেছেন।

এইবার বিদায়। মিস্ ম্যাকলিওড আসিয়া সিঁড়ির কাছে দাঁড়াইলেন। শ্রীম জোড়হাতে নমস্কার করিলেন। ভক্তগণও জোড় হাতে নমস্কার করিলেন। শ্রীমর ইঙ্গিতে তাঁহারা পুনরায় ভূমিষ্ঠ হইয়া মিস্ ম্যাকলিওডকে প্রণাম করিতেছেন। বাহিরে আসিয়া শ্রীম বলিলেন, ভারতের ভক্তিশাস্ত্রে শুদ্ধা প্রেমভক্তির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত গোপীগণ। তাঁরাই ইদানীং এই সকল ভক্তিমতী মহিলারূপে জন্মেছেন। তাই তাঁরা আমাদের প্রণম্যা। ঠাকুর গোপীদের নাম হলেই মাথা নিচু করে প্রণাম করতেন।

প্রেমানন্দ মেমোরিয়েলের নিচের তলার উত্তরে টাইলের বারান্দা। পাশের ঘরটি ডিস্পেন্সারী। ঐ বারান্দায় বেঞ্চিতে শ্রীম বসিয়া আছেন। পাশের অপর এক ঘর হইতে স্বামী ধর্মানন্দ বাহির হইলেন—হাতে লাঠি, উহাতে ভর করিয়া আসিয়াছেন। তিনি অসুস্থ। শ্রীমকে প্রণাম করিয়া বলিতেছেন, 'আপনি সন্তপ্ত লোককে কত শান্তি দিচ্ছেন।' শ্রীম উত্তর করিলেন, ঠাকুর এসেছিলেন এজন্যই। এ সব তাঁর কাজ, তাঁরই মহিমা। মানুষ যন্ত্র, তিনিই যন্ত্রী।

এখন ছয়টা, শ্রীম মোটরে বসিয়াছেন। যুক্তকরে সাধু ও ভক্তগণকে প্রণাম করিতেছেন। মোটর ছাড়িয়া দিল, সঙ্গে বীরেন।

মিস্ ম্যাকলিওড—আমরা স্বামীজীর একটি পাথরের প্রতিমূর্তি সেক্সপিয়ারের এই বাড়ীতে স্থাপন করেছি। আর ঐ ঘরের নাম রেখেছি 'প্রফেটস্ চেম্বার।' শ্রীশ্রীমা আমাকে একটি পিতলের কলসী দিয়েছিলেন। সেটিও ঐ গৃহে রাখা হয়েছে মায়ের পুণ্যস্মৃতির চিহ্নরূপে।

মিস্ ম্যাকলিওড—আর দেখুন, স্বামীজীর পাইন বৃক্ষের এই পাতা কয়টি—কি পবিত্র নিদর্শন তাঁর পুণ্যস্মৃতির! কেমন, নয় কি?

শ্রীম—নিশ্চয়! তাঁর পুণ্যস্মৃতির অতি পবিত্র নিদর্শন এরা।

৩

আজ দুর্গানবমী। ১৮ই অক্টোবর, ১৯২৩ খ্রীস্টাব্দ। ভক্তগণ আজ ৺দক্ষিণেশ্বরে বনভোজনের আয়োজন করিয়াছেন। তাঁহারা অনেকে দুর্গাপূজায় মঠে বাস করিতেছেন। অতি প্রত্যূষে প্রথম জাহাজে সুখেন্দু, ছোট জিতেন, মনোরঞ্জন, রাখাল, ছোট নলিনী, অমৃত ও গদাধর দক্ষিণেশ্বরে গিয়াছেন। শচী ও জগবন্ধু দশটার স্টীমারে মঠ হইতে যান। তাহার কিছুক্ষণ পর দুর্গাপদ, ডাক্তার, ছোট ললিত ও বড় নলিনী আসিলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে শুকলালও আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইনি প্রচুর সন্দেশ ও রসগোল্লা আনিয়াছেন। শ্রীম আসিলেন সাড়ে এগারটায় ডাক্তারের ঘোড়ার গাড়ীতে, সঙ্গে বড় জিতেন ও বিনয়।

শ্রীম নগ্নপদে ঠাকুরের ঘরে প্রবেশ করিলেন। প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া মা-কালীর মন্দিরের দিকে যাইতেছেন। পথে বিষ্ণুঘরে ৺রাধাকান্তকে প্রণাম করিয়া চরণামৃত লইলেন। সামনেই দ্বাদশ শিবমন্দির। মহাদেবের উদ্দেশ্যে যুক্ত করে অভিবাদন করিলেন। তারপর মা-কালীর মন্দির। বারান্দায় দেবীকে ডানহাতে রাখিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া দরজার পশ্চিম দিকে উত্তরাস্য বসিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধ্যান করিতেছেন। এই মন্দিরে রামলালদাদার জ্যেষ্ঠপুত্র নকুল পূজারী। তিনি কাছে আসিয়া বলিলেন, 'জেঠামশায়, প্রসাদ নিন্।' নকুল শ্রীমর ললাটে সিন্দুরের তিলক অঙ্কিত করিলেন, আর হাতে চরণামৃত দিলেন।

শ্রীম নাটমন্দিরে বেড়াইতেছেন। ভিতরের স্তম্ভগুলি পশ্চিম দিক হইতে প্রদক্ষিণ করিলেন। অমৃত জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনি কোথায় ঠাকুরকে দেখেছিলেন, যখন জিজ্ঞেস করলেন, আজ আর গান হবে কিনা?' মধ্যস্থল দেখাইয়া শ্রীম বলিলেন, এইখানে।

এইবার প্রাঙ্গণ পার হইয়া চাঁদনীর মধ্য দিয়া শ্রীম গঙ্গার বড় ঘাটে নামিতেছেন। গঙ্গাজল স্পর্শ ও মস্তকে ধারণ করিয়া হাতমুখ ধুইলেন। তারপর প্রণাম করিয়া করে জপ করিতেছেন।

ফিরিবার পথে ঠাকুরের ঘরের গোল বারান্দার সিঁড়িতে হাত ঠেকাইয়া মস্তকে ধারণ করিলেন। নহবতে দরজার সামনে বাহিরে দাঁড়াইয়া মস্তকের দ্বারা প্রণাম করিলেন। অতি দুঃখিত কণ্ঠে বলিলেন—হায়, এ মহাতীর্থের এই পরিণাম—কি অপরিষ্কার আর নোংরা করে রেখেছে। ভক্তগণ তৎক্ষণাৎ সব পরিষ্কার করিলেন। দোতলায় উঠিবার সিঁড়িতে মস্তক স্থাপন করিয়া প্রণাম করিয়া বলিলেন, মা ঠাকরুন সারাদিন এই সিঁড়িতে বসে জপ করতেন। বসে বসে বাত হলো। তা আর সারাজীবন গেল না। এইটুকুন ঘর, সব জিনিসে পূর্ণ। স্ত্রী ভক্তরাও কেউ কেউ থাকতেন। আবার মাছ জিয়ান—কল কল শব্দ হচ্ছে। ঠাকুরের জন্য ঝোল হবে। উঃ, কি অমানুষিক ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, কি সংযম, কি ত্যাগ আর সেবা!

শ্রীম বকুলতলার ঘাটে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। তারপর ঠাকুরের নিজহস্তে রোপিত পঞ্চবটীর পত্রসমূহ স্পর্শ করিলেন, আর ভূমিষ্ঠ হইয়া পঞ্চবটীমূলে উত্তর দিকে প্রণাম করিলেন। ঠাকুরের ধ্যানকুটীর বারান্দার উত্তর প্রান্তে স্পর্শ ও প্রণাম করিয়া উপরে উঠিলেন এবং বন্ধ গৃহের দরজা স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলেন। নিচে নামিয়া ঐ কুটীর প্রদক্ষিণ করিতেছেন। পূর্ব দিকের বন্ধ জানালার ফাঁক দিয়া দর্শন ও প্রণাম করিয়া দক্ষিণের উন্মুক্ত জানালা দিয়া গৃহাভ্যন্তর দর্শন করিলেন। ইদানীং একটি শিবমূর্তি রহিয়াছে। ঠাকুরের সময় ভিতরে কিছুই ছিল না—এই ঘরই ছিল না। মাটির কোঠা ছিল—এই বলিয়া সম্মুখে বিস্তৃত গোলাকার বেদী পরিক্রমা করিয়া ঠাকুরের সাধনপীঠ পুরাতন বটবৃক্ষতলে উপস্থিত হইলেন।

শ্রীম বলেন, পূর্বে এই স্থানে নীলকর সাহেবরা থাকিত। এই বটবৃক্ষ ও বেদী তখনকার। এই বেদীই ঠাকুরের আদি সাধনপীঠ। শ্রীম বেদী পরিক্রমা করিতেছেন। পশ্চিম-উত্তর কোণের দেড় হস্ত দক্ষিণে মস্তকের দ্বারা প্রণাম করিলেন। যাহার নিচে বেদীর উপর বসিয়া ঠাকুর কঠোর তপস্যা করিতেন, বটবৃক্ষের সেই শাখাটিকে

আলিঙ্গন করিলেন আর বার বার প্রণাম করিলেন। এই শাখাটি আশ্বিনের ঝড়ে ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল এবং গঙ্গার দিকে বেদীর উপর দিয়া বহুকাল পড়িয়া আছে। এখন শুষ্ক। উহারই অঙ্গ হইতে গঙ্গার দিকে নূতন আর একটি বৃক্ষ জন্মিয়াছে, বেদীর উত্তর-পশ্চিম কোণে। দিনের পর দিন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ ইহারই নিচে বসিয়া মায়ের জন্য কত ব্যাকুল ক্রন্দন করিয়াছেন, যেমন জননীর জন্য শিশু করে। তারপর কত দর্শন, স্পর্শন ও কথা—কত দিব্য লীলা! এই স্থান অতি পবিত্র। শ্রীম বিভোর হইয়া বলিতেছেন, বুঝি বা এখানে বসবার অন্য কেউ জন্মায় নি। তাই কি প্রকৃতি এই ভগ্ন শাখা দ্বারা এই সুপবিত্র স্থান রক্ষা করছেন!

বেদী পরিক্রমা চলিতেছে। পূর্ব-দক্ষিণ কোণে মস্তক সংলগ্ন করিয়া শ্রীম প্রণাম করিতেছেন। বেদীতে আরোহণ করিবার দুইটি সিঁড়ি আছে, একটি দক্ষিণে একটি উত্তরে। দুইটি সিঁড়িই বিল্বতলে যাইবার রাস্তার পাশে ডান হাতে। শ্রীম দক্ষিণের সিঁড়ির দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ সোপান হস্তদ্বারা স্পর্শ করিয়া মস্তক স্থাপন করিলেন তারপর ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। এইস্থানে পরমহংসদেব প্রায়ই বসিতেন ও শ্রীপাদপদ্ম রক্ষা করিতেন। কেশব সেন, বিজয় গোস্বামী প্রভৃতি ভক্তগণের সহিত এখানে বসিয়া কত ঈশ্বরীয় কথা কহিয়াছেন।

শ্রীম বেলতলার দিকে যাইতেছেন। পথিমধ্যে ঝাউতলা যাইবার রাস্তা দিয়া গঙ্গার দিকে কতকদূর অগ্রসর হইলেন। বলিলেন, এইখানে (রাস্তার পূর্ব দিকে) রেলিংয়ের একটা বেড়া ছিল। এতে পা আটকে গিয়ে ঠাকুর পড়ে যান। আর তাতেই হাত ভেঙ্গে যায়, ভাবে ছিলেন, শরীরের দিকে হুঁশ ছিল না।

বিল্বতল। ইহা শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম মহা সাধনপীঠ। তন্ত্রের প্রায় যাবতীয় সাধন এইখানেই হইয়াছে। এইস্থানেই সেই পঞ্চমুণ্ডির আসন স্থাপন করিয়াছিলেন। বিল্ববৃক্ষের চার দিকে একটি গোলাকার বেদী, দুই ফুট উচ্চ। শ্রীম পশ্চিম দিক হইতে প্রদক্ষিণ করিতেছেন—বিল্ববৃক্ষকে ডান হাতে রাখিয়া। পূর্ব-দক্ষিণ দিকে

আসিয়া ভূ-লুণ্ঠিত হইয়া প্রণাম করিতেছেন। এইস্থানে একদিন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণকে সশরীরে দণ্ডায়মান দেখিয়াছিলেন। শ্রীম বেদীর উপর বসিয়া ধ্যান করিতেছিলেন। হৃদয়ে যাঁহার ধ্যান করিতেছেন, নয়ন মেলিয়া তাঁহাকেই সম্মুখে দণ্ডায়মান দেখিলেন। আহা, মনুষ্যজীবনে এই দৃশ্য কি সুদুর্লভ! ধ্যাননিরত ভক্তপ্রবর ধ্রুবও একদিন বৃন্দাবনে নয়ন মেলিয়া ইষ্টদেব নারায়ণকে সম্মুখে দণ্ডায়মান দেখিয়াছিলেন। অদ্যাবধি শ্রীম নতমস্তকে এই স্থানকে প্রণাম করিয়া থাকেন। ভক্তগণ কয়েকবার দেখিয়াছেন, কর্দমাক্ত থাকিলেও কিছু গ্রাহ্য না করিয়া শ্রীম এই স্থানকে ভূ-লুণ্ঠিত হইয়া প্রণাম করেন। আজও তাহাই করিলেন।

এইবার প্রদক্ষিণ শেষ করিয়া উত্তর দিক হইতে বিল্ববৃক্ষকে স্পর্শ করিয়া উত্তর দিকে আসন করিয়া উত্তরাস্য ধ্যান করিতে বসিলেন। চতুর্দিকে বহু ভক্ত—কেহ বেদীর উপর, কেহ নিচে বসিয়া আছেন। শ্রীম বলিলেন, এই স্থানে একটু তাঁর চিন্তা করুন। সকলে মণ্ডলী করিয়া কিছুকাল ধ্যান করিলেন। কিয়ৎকাল পর শ্রীম নিঃশব্দে উঠিয়া পড়িলেন, বেদীতে দক্ষিণ দিক হইতে হামাগুড়ি দিয়া আরোহণ করিয়া বিল্বমূল স্পর্শ করিলেন। এইবার হাঁসপুকুরের দিকে যাইতেছেন। সঙ্গে দুই একজন ভক্ত—ডাক্তার, জগবন্ধু প্রভৃতি।

লক্ষ্মীদিদি এখানেই রহিয়াছেন দক্ষিণেশ্বরের বাড়ীতে। ইনি ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্রী ও সেবিকা। মাস্টারমহাশয়ের আসার কথা শুনিয়া বড় নলিনীর হাতে প্রসাদ পাঠাইয়া দিয়াছেন—মুড়ি ও মুড়কি। শ্রীম হাঁসপুকুরের পূর্ব তীরে দাঁড়াইয়া ঐ প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। ভক্তগণ এখনও বিল্বমূলে ধ্যান করিতেছেন।

এইবার শ্রীম কালীবাড়ীতে প্রবেশ করিলেন। তিনি রন্ধনশালা, ভাণ্ডার, খাজাঞ্চীর ঘর দেখিতেছেন। জগবন্ধু ও ডাক্তার ইতিমধ্যে গঙ্গায় ডুব দিয়া পুনরায় মা-কালীর মন্দিরের সম্মুখে শ্রীমর সঙ্গে আসিয়া মিলিত হইলেন। হোম এই মাত্র শেষ হইল। ভোগের পর আরতি হইতেছে। মাকে প্রণাম করিয়া শ্রীম পুনরায় ঠাকুরের ঘরে

প্রবেশ করিলেন। ছোট খাটের পূর্ব-উত্তরের কোণের কাছে শ্রীম বসিয়াছেন। এখান হইতে বেশ গঙ্গা দর্শন হইতেছে। ঠাকুর সশরীরে অবস্থানকালেও শ্রীম এই স্থানেই পাপোশের উপর বসিতেন।

শ্রীম ধ্যান করিতেছেন। এতক্ষণে ভক্তমণ্ডলীতে ঠাকুরের ঘর পরিপূর্ণ। সকলেই ধ্যান করিতেছেন। গৃহে এখন একটি প্রশান্ত গম্ভীরভাব বিরাজ করিতেছে।

অনেকক্ষণ অতীত হইল। শ্রীমর ইচ্ছায় ছোট ললিত একটি ভজন গাহিতেছেন। 'মহাদেব পরম যোগীন মহদানন্দেমগন।' রামলালদাদা গৃহে প্রবেশ করিলেন—হাতে মা-কালীর অন্নভোগের প্রসাদ। শ্রীম উহা হাতে করিয়া মাথায় ঠেকাইলেন। ডাক্তার তাহার পর উহা হাতে করিয়া রাখিলেন। শ্রীম বলিলেন, এবার ওখানকার সব নিবেদন করে দিলে হয়। সকলে উঠিলে একজন জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কোন কোন ছবি ঠাকুরের সময়ের?' শ্রীম উত্তর করিলেন, এইটি (রাম-সীতা), এইটি (প্রহ্লাদ), এই সবই (ধ্রুব, যীশু, চৈতন্য-সংকীর্তন)।

শ্রীম উত্তরের বারান্দায় করজোড়ে দাঁড়াইয়া আছেন, উত্তরের দরজা দিয়া বাহির হইয়াছেন। জগবন্ধু জিজ্ঞাসা করিলেন, 'স্বামীজীর গান শুনে কোথায় সমাধি হয়েছিল ঠাকুরের, দাঁড়িয়ে?' বারান্দার দক্ষিণ-পূর্ব কোণে তাঁহাকে লইয়া গিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। আর বলিলেন, এইখানে ঠাকুর দাঁড়ান। পিছনে দেয়াল। সব স্থির, নয়ন পলকহীন। এক দিব্য আনন্দের ছটা মুখমণ্ডলে। শান্তি আর প্রেম যেন জমাট বেঁধে আছে।

উত্তরের বারান্দার পূর্ব-উত্তর কোণের দেয়ালে একটি পুষ্পলতা, আর ময়ূর অঙ্গারে আঁকা রহিয়াছে। লোকে বলে, উহা ঠাকুরের হাতে আঁকা। জগবন্ধু তাই প্রশ্ন করিলেন, 'উহা নাকি ঠাকুরের হাতে আঁকা?' শ্রীম বলিলেন, তাই শুনেছি। শ্রীমর সাক্ষ্য এইরূপ। যাহা নিজ চক্ষে দর্শন করেন নাই, কিংবা নিজ কর্ণে শুনেন নাই, সেই বিষয়ে বলিতে হইলে এইরূপ বলিতেন, 'শুনেছি এইরূপ', 'তাই শুনেছি', 'কেউ কেউ এরূপ বলেন' ইত্যাদি।

এইবার ঐ বারান্দার বাহিরে রোয়াকের উত্তর-পূর্ব কোণে হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলেন। আর বলিলেন, ঠাকুর এখানে দাঁড়িয়ে ভক্তদের বিদায় দিতেন।

গাজীতলা। এখানেই আজকের রন্ধনস্থলী। শ্রীম আসিয়া সব রন্ধনদ্রব্য দর্শন করিলেন। বলিলেন, পঞ্চবটীতে দেয় না বুঝি আজকাল? ভক্তরা বলিলেন, 'আমাদের দেবে।' শ্রীম কহিলেন, ঠাকুর থাকতে ওখানে অনেকবার ওরূপ হয়েছে। দক্ষিণেশ্বরের সর্বত্র পবিত্র হইলেও এ স্থান শ্রীমর মনঃপূত হয় নাই। পঞ্চবটীতে ঠাকুরের স্মৃতি বিশেষভাবে বিজড়িত।

আর একটি ত্রুটি হইয়াছে ভক্তদের। শ্রীম বলিতেছেন, এখানে উৎসবাদিতে কিছু করতে হলে প্রথমে গুরুবংশের অনুমতি নেওয়া উচিত। তারপর ওঁদের সেবার বন্দোবস্ত করে অন্য সব করতে হয়। নইলে দোষ স্পর্শ করে। ঠাকুরের বংশধর-সন্তান ও ভক্ত রামলালদাদা রয়েছেন। সর্বাগ্রে তাঁর অনুমতি নেওয়া আর তাঁর পূজা করা উচিত ছিল।

আজের উৎসবের ভোগরাগ ও মিষ্টান্নাদির প্রচুর আয়োজন। এই ত্রুটি সংশোধনের জন্য শ্রীমর আদেশে ফল, মিষ্টি ও দই অর্ধেক রামলালদাদার উদ্দেশ্যে প্রেরিত হইয়াছে। আর এক ভাগ সর্বাগ্রে ঠাকুরঘরে নিবেদিত হইয়াছে।

রামলালদাদা ইতিমধ্যেই উৎসবস্থলীতে উপস্থিত। শ্রীম ও ভক্তগণ উঠিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া উত্তম আসনে বসাইলেন। মিষ্ট বাক্যে তুষ্ট করিয়া আবার কিছু মিষ্টান্ন উপহার দিলেন। আর শ্রীম যুক্তকরে অনুমতি চাহিলেন—দাদা, অনুমতি করুন আমরা প্রসাদ পাই। এইবার ভক্তগণ আনন্দে প্রসাদ পাইতেছেন। কেহ কেহ অবাক হইয়া ভাবিতেছেন, সামান্য বিষয়েও মহাপুরুষগণের আচরণ নিঁখুত।

ছোট ললিত পক্বদ্রব্য ও মিষ্টান্নাদি শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে নিবেদন করিয়াছেন। ভক্তগণ পশ্চিমমুখী হইয়া আসনে বসিলেন। শ্রীম বলিলেন—না, এটা ভাল হয় নাই। পুকুরের পাকা চত্বরের উপর

সকলে মণ্ডলী করিয়া বসুন। রান্না হইয়াছে খিচুড়ি, বেগুনভাজা কপিভাজা, পাঁপড়ভাজা, আলু-কপির ডালনা ও আলুবোখারার চাটনি। দই, সন্দেশ, রসগোল্লা, কলা প্রভৃতি প্রচুর আসিয়াছে। শ্রীমর জন্য দুধ রাখা হইয়াছিল। উনি আজ আর দুধ খাইলেন না। সেই দুধ সকলে একটু একটু গ্রহণ করিলেন।

রামলালদাদা বসিয়া নানা প্রসঙ্গে সকলকে প্রচুর আনন্দ দান করিতেছেন। ছোট জিতেন, ছোট ললিত ও ডাক্তার পরিবেশন করিতেছেন। পরম পরিতোষে ভক্তগণ প্রসাদ পাইলেন। শ্রীভগবানের জয়গানে ভোজন শেষ হইল। কিন্তু আসন হইতে কেহ উঠিতেছেন না। ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ হইতেছে। শ্রীম বলিতেছেন—দেখুন, তিনি আমাদের mind এর (মনের) constitution (গঠন) এমন করে করেছেন যে, prat cal touch (প্রত্যক্ষ স্পর্শ) না হলে কোন বস্তুর mind-এ impression (মনে দাগ) পড়ে না। এই যে এখানে খাওয়া হচ্ছে বসে, এটি কতকাল মনে দাগ কেটে থাকবে। কথা যা হচ্ছে এ সব ভুল হয়ে যাবে।

ঐ দেখুন, যদু মল্লিকের বাগানবাড়ী (গাজীতলার দক্ষিণ তীরস্থ)। ঐখানে ঠাকুর প্রায়ই যেতেন। যদু মল্লিককে ভালবাসতেন। তা ছাড়া দরোয়ান খুব ভক্ত লোক ছিল।

এক ঘণ্টা লাগিয়াছে আসন হইতে উঠিতে। সকলে হাতমুখ ধুইতেছেন। এখন অপরাহ্ণ দুইটা।

একজন বৈরাগী আসিয়া ভজন গাহিতেছেন—হাতে গোপীযন্ত্র। গৌরলীলার গান এক ঘণ্টা হইল।

শ্রীম উঠিয়া কুঠি বাম হাতে রাখিয়া, উত্তরের দিকে অগ্রসর হইতেছেন। হাঁসপুকুর বাম হাতে রাখিয়া পঞ্চবটীতে প্রবেশ করিলেন, তারপর বকুলতলায়। ঘাটের উত্তর-পূর্বে রাস্তার পশ্চিমে বসিবার একটি উচ্চ বেদিকা রহিয়াছে। শ্রীম পূর্বদিকে মুখ করিয়া উহাতে বসিলেন, পিছনে গঙ্গা। বলিতেছেন, একচল্লিশ বছর পূর্বে ঠাকুরকে এর উপর বসে থাকতে দেখেছিলাম। আজও তা মনে পড়ছে বেশ।

এতকাল হয়েছে, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে যেন কাল হয়েছে। আধঘণ্টা বসিলেন। তিনটার পর বারবেলা পড়িয়াছে। তাই বলিলেন—না, এখন আর যাওয়া হতে পারে না। মন্দির খুললে যাওয়া যাবে—মাকে প্রণাম করে তাঁর অনুমতি নিয়ে।

শ্রীম বকুলতার ঘাট হইতে কুঠিতে যাইতেছেন। বারান্দা অতিক্রম করিয়া দক্ষিণ-পশ্চিমস্থিত গৃহে প্রবেশ করিলেন। গৃহতল দুই হাতে স্পর্শ করিয়া সেই হাত মাথায় ধারণ করিলেন। পশ্চিমের দরজা খুলিয়া দিয়া গঙ্গা দর্শন করিতেছেন। ভক্তদের বলিলেন, দেখুন কি সুন্দর গঙ্গা-দর্শন! জলে প্রতিফলিত শরতের উজ্জ্বল সূর্যকিরণ। গলিত রৌপ্যরাশির ন্যায় গঙ্গা রঙ্গে ভঙ্গে তরঙ্গে প্রবাহিত।

শ্রীম বলিতেছেন, এই ঘরে ঠাকুর ষোল বছর ছিলেন—এইটিন সিক্স্‌টিনাইন (1869) পর্যন্ত। ঠাকুরের মাও সঙ্গে এই ঘরে থাকতেন। কত নাম, কত চিন্তা, কত দর্শন হয়েছে এই ঘরে। বারান্দায় দাঁড়াইয়া কালীবাড়ীর শোভা দর্শন করিতেছেন—হয়তো পূর্বস্মৃতি জাগ্রত করিতেছেন। পুনরায় গৃহে প্রবেশ করিলেন। বলিতেছেন, ভাগ্যে আর হয় কি না হয়।

ঠাকুরের ঘরে প্রবেশ করিয়া প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিলেন—যুক্ত করে ঠাকুর থাকিতে যেমন বিদায় লইতেন সেইরূপ বিদায় লইলেন। তারপর মায়ের মন্দিরে। এখানেও প্রণাম প্রদক্ষিণ করিয়া বিদায় লইলেন। এইবার বিষ্ণুঘরে। এখানেও তাহাই করিলেন। প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া সদাশিবের উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া বিদায়ের অনুমতি লইলেন। শ্রীম ঠাকুরের ঘরের পূর্ব বারান্দার মধ্যবর্তী দরজা অতিক্রম করিয়া উত্তরের বারান্দার সম্মুখে ডাক্তারের ঘোড়ার গাড়ীতে উঠিলেন। ছোট জিতেন বলিলেন, 'ফটো নেওয়া হবে।'

শ্রীম গাড়ীতে উপবিষ্ট—সঙ্গে বড় জিতেন। অনিচ্ছাসত্ত্বেও ভক্তদের আগ্রহে রাজী হইলেন। ফটো নেওয়া হইল। 'জয় শ্রীগুরু মহারাজ কি জয়'—বলিয়া গাড়ী ছাড়িল। ডাক্তারও সঙ্গী হইলেন।

শ্রীম দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া যেন মাতালের মত টলিতে টলিতে

চলেন। আঁট নাই, মুখে প্রায় কথা নাই, কিন্তু আনন্দে ভরপুর। চক্ষুর দৃষ্টি অন্তর্মুখিন্—তাহাতে যেন ঠাকুরের নরলীলা এখনও দেখিতেছেন, জীবন্ত। শ্রীমর চলন, বলন, কথন, সকল ব্যবহার অতি সসম্ভ্রম—মাতৃপিতৃভক্ত বয়স্ক পুত্রের যেমন হইয়া থাকে মাতাপিতার সামনে। শ্রীমর স্বাভাবিক গাম্ভীর্য আরো গম্ভীর ভাব ধারণ করিয়াছিল আজ।

শ্রীম বলেন, দক্ষিণেশ্বরের প্রতিটি ধূলিকণা পবিত্র আর জাগ্রত—জীবন্ত শ্রীভগবানের চরণস্পর্শে। এখানকার বৃক্ষলতা দেব-ঋষি ও ভক্তগণ—শ্রীভগবানের লীলামৃত দর্শন ও উপভোগ করতে দাঁড়িয়ে আছেন। এঁরা সব অবতারলীলার সাক্ষী। তাই কি শ্রীম এখানকার বৃক্ষদের আলিঙ্গন ও প্রণাম করেন সর্বদা।

মর্টন স্কুল, কলিকাতা। ১৮ই অক্টোবর, ১৯২৩ খ্রীঃ
১লা কার্তিক, ১৩৩০ সাল। শারদীয়া নবমী, বৃহস্পতিবার।

দ্বাদশ অধ্যায়

শুধু ঈশ্বরদর্শন নয় আবার কথা কওয়া

১

মর্টন স্কুল। দোতলার ঘর। শ্রীম নববিধান ব্রাহ্মসমাজ হইতে এইমাত্র ফিরিয়াছেন। সিঁড়ির পাশের ঘরে আঠার উনিশজন ভক্ত তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। এখন সন্ধ্যা পৌনে সাতটা।

আজ শুক্লা দ্বাদশী। দুইদিন হয় বিজয়া হইয়া গিয়াছে। ২১শে অক্টোবর, ১৯২৩ খ্রীঃ, ৪ঠা কার্তিক ১৩৩০ সাল, রবিবার।

শ্রীহট্ট হইতে তিনজন ভক্ত আসিয়াছেন, একজন বৃদ্ধ। সুখেন্দু, শুকলাল, মনোরঞ্জন, ছোট নলিনী, সুধীর ও বড় নলিনী রহিয়াছেন। তারপর আসিলেন বড় অমূল্য, অমৃত, ডাক্তার ও বিনয়। জগবন্ধু এখানেই থাকেন।

শ্রীম শ্রীহট্টের ভক্তদের সঙ্গে আনন্দে কথা কহিতেছেন। ঐ দেশের ভক্তদের সংবাদ লইতেছেন আর ঠাকুরের প্রচারকার্যের কথা খুঁটিনাটি জিজ্ঞাসা করিতেছেন। এইবার হঠাৎ কথার মোড় ফিরিয়া গেল।

শ্রীম (শ্রীহট্টের-ভক্তদের প্রতি)—আমরা ব্রাহ্মসমাজে গিছলাম। একটি গান হচ্ছিল শুনলাম—'অবিশ্রান্ত ডাক তাঁরে সরল ব্যাকুল অন্তরে।' কি সুন্দর গানটি! ঠাকুরের ভাবটি ঐ গানে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। তিনি বলতেন, নিরবচ্ছিন্ন তৈলধারার মত তাঁকে ডাক।' জলধারায়ও অবচ্ছেদ, মানে ফাঁক আছে; কিন্তু তৈল ধারায় তা নাই। তেমনি তাঁকে ডাক। ক্রাইস্টও বলেছেন, 'Pray without ceasing'—অবিশ্রান্ত ডাক। সংসারীরা এ-টি পারে না, সাধুরা পারেন। সংসারীদের কেমন—একজন সোনা গালাচ্ছে, তখন পরিবার এসে বললে, চাল নাই আর ঔষধ আনতে হবে। অমনি উঠে গেল, আর সোনা গালান হলো না। এইসব বিঘ্ন।

একদিন আমরা ট্রামে করে যাচ্ছি কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট দিয়ে। বিডন স্ট্রীটের নিকট এসে ট্রাম দাঁড়িয়েছে। হঠাৎ শুনতে পেলাম গানের এই কলিটি। খুব উচ্চৈঃস্বরে একজন গাইছে—'অবিশ্রান্ত ডাক তাঁরে সরল ব্যাকুল অন্তরে'। ওমা চেয়ে দেখি মনমোহন দে গাইছেন। উনি আমাদের বন্ধু, ঠাকুরকে দর্শন করেছেন। ঠাকুর এই কথা বলতেন কিনা! আমি শুনে আনন্দিত হব তাই তিনি গাইলেন। তিনিই ওঁর মুখ দিয়ে আবার আমায় শুনিয়ে দিলেন। অনেক দিন হয় তাঁর দেহ গেছে।

ঠাকুর ' পঞ্চবটীতে দাঁড়িয়ে আছেন। একটি কুকুর এলো। অমনি তার কাছে যাচ্ছেন এই বলে, 'যাই মা এর মুখ দিয়ে কিছু বলাবেন হয়তো। তিনি কুকুরের মুখে কথা বলান। আর মানুষের মুখ দিয়ে পারেন না?'

যোগেন প্রবেশ করিলেন। ইনি নিত্য দক্ষিণেশ্বরে যান। আজ পঞ্চবটী পরিষ্কার হইয়াছে। এইবার সেখানকার কথা চলিতেছে।

শ্রীম (সকলের প্রতি)—আহা, ইচ্ছা হয় আর একদিন আমরা ওখানে (পঞ্চবটীতে) রেঁধেবেড়ে খাই। ঐ এক রোগ—একবার গেলেই যেতে ইচ্ছা হয়। মঠে ও দক্ষিণেশ্বরে গিছলাম পূজোর সময়। দেখুন না, আবার যেতে ইচ্ছে হচ্ছে। সেদিন গাজিতলাতে হলো। ওখানকার গাছপালা সব মনে কেমন বসে গেছে। এর কারণ হলো অনেকক্ষণ থাকা—রান্নাবান্না করা, চলাফেরা এই সবে হয়। তা পঞ্চবটীতে একদিন করতে ইচ্ছা হচ্ছে। দক্ষিণেশ্বরের সব স্থানই পবিত্র। তবুও পঞ্চবটী, বেলতলা, ঠাকুরের ঘর, সব জম্‌জম্ করছে। বেলতলায় দেবে না রাঁধতে, পঞ্চবটীতে বেশ হয়। স্বামীজীরা করেছিলেন। অতি কষ্টে দু'টাকা সংগ্রহ হলো। তাতেই ডাল চাল কিনে কত আনন্দ! তখনকার দু'টাকাই কত! ঐ দিন আমাদের বড্ড বেশী হয়ে গিছলো! এত না, simple (সাদাসিধে) হওয়া চাই। এত কেন? পাতলা খিচুড়ী, একটু ঘি আর সামান্য মিষ্টান্ন।

শ্রীম (যুবকের প্রতি)—ঠাকুরঘর খুব। ঐখানে বসে ঠাকুর মার সঙ্গে সর্বদা কথা কইতেন।

ভক্তরা সেবা জানতো না। কিন্তু তিনি জোর করে করিয়ে নিতেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—একবার একজন ভক্ত দক্ষিণেশ্বরে কিছুদিন ছিলেন। সেই সময় পঞ্চবটীতে কয়েকজন পশ্চিমের সাধু এসেছেন। ঠাকুর তাঁকে বললেন—দেখ, সাধুসেবা করা ভাল, কি বল? ভক্তটি জবাব দিলেন, আজ্ঞে হাঁ। তারপর তিনি টাকা দিলেন। সাধুরা চাল ডাল আটা সব কিনে এনে রাঁধলেন। ঠাকুরও তাই খেলেন। আবার ভক্তের জন্য রেখে দিলেন। রাত্রিতে তাকে দিলেন। তখন একটা গল্প বললেন। দ্রৌপদীর দুরবস্থা—দুঃশাসন বস্ত্রহরণ করছে। তিনি কেঁদে কেঁদে বললেন, 'ভগবান, লজ্জা রাখ।' শ্রীকৃষ্ণ কাছেই। জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কখনও কোন সাধুকে বস্ত্রদান করেছো কি?' দ্রৌপদী বললেন, 'একদিন একজন সাধুর কৌপীন জলে ভেসে যায়। আমি তখন আমার পরবার বস্ত্রের আধখানা তাঁকে ছিঁড়ে দিছলুম।' শ্রীকৃষ্ণ শুনে

বললেন, 'তবে আর ভয় নাই।' বস্ত্র যত টানছে দুঃশাসন, ততই বেড়ে যাচ্ছে।

গল্পটি বলেই জিজ্ঞেস করলেন, 'বল তো কি বললাম?' মানে, impressed (মনে রেখাপাত) হয়েছে কিনা দেখছেন। Lead (চালিত) করছেন আস্তে আস্তে।

অধর সেন ইংরেজীপড়া লোক। যদু মল্লিকের বাড়ীতে গেছেন ঠাকুরের সঙ্গে। সিংহবাহিনীকে প্রণাম করলেন বটে, কিন্তু কিছু দেন নাই। তখনই ঠাকুর বললেন, 'তুমি কিছু দিলে না—মাকে?' অধর বললেন, 'আজ্ঞে প্রণাম করে কিছু দিতে হয়, এটা আমি জানতুম না'। শেষে একটি টাকা দিলেন।

শশী মহারাজ ঐ দিকে (তর্জনীতে দক্ষিণ দিকে দেখাইয়া আমহার্স্ট স্ট্রীট ও হ্যারিসন রোডের মোড়ে) থাকতেন। চার পয়সার বরফ কাপড়ে জড়িয়ে নিয়ে হেঁটে হেঁটে দক্ষিণেশ্বর যেতেন। উঃ, কি রৌদ্র—ঘেমে ঘেমে একাকার। তারই একটু বরফ থাকতো। ঠাকুর কত আগ্রহে তা খেতেন। তাঁর সেবা করে এঁরা কত বড় হয়েছেন এক এক জন।

মাঝে মাঝে বলতেন, 'দেখ, বললে অভিমান হয় পাছে, তাই বলি না। এখানে এলে এক পয়সার কি দু'পয়সার কিছু হাতে করে নিয়ে আসতে হয়—এলাচ টেলাচ যা হোক।' বেশী আনতে বলেন না। পাছে কেউ না আসে টাকা খরচের ভয়ে। কখনও বলতেন 'একটা হরতকী না হয় হাতে করে আনবে।'

শ্রীম (শ্রীহট্টের ভক্তদের প্রতি)—আহা, তিনি জানেন ভক্তরা সেবা জানে না—এসে শুধু বসে থাকে। তাই জোর করে করিয়ে নিতেন। কখনও বলতেন, 'গামছাটা ধুয়ে আন তো? পা-টা কনকন করছে, একটু হাত বুলিয়ে দাও না'—(জিহ্বা ও ওষ্ঠ সংযোগে আপশোষসূচক ধ্বনি করিয়া) সেই জন্যই তো গুরুর ঋণ শোধ হয় না।

একবার একটি ভক্ত দক্ষিণেশ্বরে কিছুকাল বাস করছেন। টাকা ফুরিয়ে গিছলো, কিংবা অন্য কিছু প্রয়োজন হয়েছিল। তাই তিনি

কলকাতা যেতে চাইলেন। ঠাকুর শুনে যেন ভয়ে বিস্মিত হয়ে বললেন, 'সে কি! কেন যাবে কলকাতায়?' মানে তাঁর একটানা একটা ভাব চলছে। সেটা ভেঙ্গে যাবে গেলে। তাই 'কেন যাবে?'

আর একদিন এক ভক্তকে দক্ষিণেশ্বরে থাকতে বললেন। ভক্ত বললেন, বাড়ীতে অসুখ বিসুখ আছে। ঠাকুর বললেন, 'তা পাড়ার লোক দেখবে যদি তেমন বিপদ হয়। তুমি থেকে যাও।' মানে, পরিবারবর্গ তো পাবে সর্বদাই, আমাকে তো পাবে না সর্বদা। 'But me, ye have not always.'

একটি ভক্ত সব ছেড়ে ছুড়ে ঠাকুরের সেবা করছেন। আর একটি গৃহী ভক্ত তাঁকে এনে নূতন চটি জুতা দিলেন। ঐ ভক্তটি খালি পায়েই মেরে দেন—সর্বক্ষণ সেবা। জুতা পরেন কখন! একদিন এক পাটি শেয়ালে নিয়ে গেল। ঠাকুর তা জানতে পারলেন। তারপর একঘণ্টা ধরে খুঁজে খুঁজে ঐ জুতোটি পেলেন, আর হাতে করে নিয়ে এলেন। সর্বত্যাগী ভক্তটি দেখেই বলে উঠলেন, 'এটা করলেন কি আপনি!' এই বলেই জুতোটা ঠাকুরের হাত থেকে নিয়ে নিলেন। এমনি ভক্তবৎসল, আহা!

শ্রীম কিছুকাল নীরব রহিলেন—কি ভাবিতেছেন। পুনরায় কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (যোগেনের প্রতি)—আপনার resignation letter (পদত্যাগ পত্র) দেওয়া উচিত। মহাপুরুষ মহারাজ যখন বলেছেন একথা, তাতে আর ইতস্তত করা উচিত নয়। শীঘ্র দেওয়া উচিত। এঁরা কত তপস্যা করছেন। কিসে মঙ্গল হবে ভক্তদের তা দেখতে পান। তাই বলেছেন আপনাকে ঐ connection (সম্পর্ক) ছাড়তে। আর যে রকম ব্যবহার আপনার সঙ্গে হচ্ছে, আপনিই বলেছেন, তাতে মনে হয় আপনার উপর আর তাঁর বিশ্বাস নাই। এঁরা সব সাধু লোক—চান সরলতা। এঁরা যখন ছাড়তে বলেছেন, তখন অবিলম্বে ছাড়া উচিত। অমৃতবাজারে একটা written letter (লিখিত পত্র) দেওয়া উচিত—I beg to submit my resignation

etc. (আমি সবিনয়ে পদত্যাগ পত্র প্রদান করছি)। মাত্র main pointটি (মুখ্য কারণটি) উল্লেখ করবেন।

শ্রীম (সকলের প্রতি)—মানুষ কি সব বুঝতে পারে? ভাবে, নিজে যা করছে তাই ভাল। অন্যের মতের সঙ্গে না মিললে বলে, 'উনি ভাল না।' এঁরা মহাপুরুষ, কোনটা ভাল তা' বুঝতে পারেন। কত তপস্যা করেছেন। ঠাকুরকে দর্শন করেছেন। তার ওপর আবার সারা জীবন তপস্যাতেই কাটলো। কাশীতে, জঙ্গলে, অনাহারে কত কষ্টে তপস্যা করেছেন। সেইখানে এখন অদ্বৈতাশ্রম। এখন তো অত বড় আশ্রম। তখন কোনও রকমে ভাড়া উঠতো না। এঁরা নিশ্চয়ই সাধারণ সংসারী লোক থেকে ভাল বোঝেন।

সাধু প্রসন্ন না থাকলে শান্তি পাওয়া যায় না। সাধুদের সর্বদা প্রসন্ন রাখতে হয়। মিল না থাকলে, ওঁদের ভালবাসা না পেলে, ওঁদের কথা শুনে মনে রাগ হয়। তাতেই পতন হয়।

এইবার 'দেবী-ভাগবত' পাঠ হইতেছে—নরনারায়ণ ঋষিদ্বয়ের জন্ম, তপস্যা ও তপোবিঘ্ন। বড় অমূল্য পাঠক।

শ্রীম (ছোট জিতেনের প্রতি)—ভোগ নিয়ে থাকলেই ভয়। ইন্দ্রের তাই ভয় হচ্ছে পাছে নরনারায়ণ তাঁর চাইতেও বড় হয়ে যান। সেই জন্য তপস্যার বিঘ্ন উৎপাদন করছেন।

মদনের কথাটি অতি সত্য। বললেন—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব সবকে আমি মোহিত করতে পারি। কিন্তু দেবীভক্তকে পারবো না—মানে, মহামায়াতে বদ্ধ হয় জীব। এখন সেই মহামায়া যাকে অভয় দেন নিজে, তার অনিষ্ট কে করতে পারে?

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—ব্রহ্মার মানসপুত্র ধর্ম। ধর্মের ঔরসে আর দক্ষকন্যার গর্ভে জন্ম নরনারায়ণের। ভগবানের অংশে তাঁদের জন্ম। দেখুন, তাঁদের তপস্যাতেই কত বিঘ্ন। সামান্য লোকের কথা কি!

তাই ঠাকুর বলতেন, মা শরণাগত, মা শরণাগত। লোকশিক্ষার জন্য এরূপ করতেন। বলতেন, তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ করো না। মহামায়ার এই প্রচণ্ড লীলা তিনি দেখতে পেতেন কি না

এই চক্ষে, যেমন আমরা সব দেখছি বাড়ীঘর, মানুষ, সব। শ্রীম কিছুকাল নীরব রহিলেন।

শ্রীম (যুবকদের প্রতি)—তপস্যাতেও সাবধান, অহংকার না হয়। নারায়ণ ঋষির একটু অহংকার হয়েছিল তপস্যা করে। উরু থেকে উর্বশীর সৃষ্টি করলেন। খুব সাবধান হয়ে তপস্যাদি করতে হয়। কাম, ক্রোধ, অহংকার তপস্যার মহাশত্রু। পতন হয় এতে।

এ সব পুরাণ পড়া খুব ভাল। সাবধান হওয়া যায়, এ সব জানা থাকলে। মনে হবে, কি অত বড় ঋষি নারায়ণ, তাঁরই এ অবস্থা, আর আমাদের কথা কি! সর্বদা শরণাগত হয়ে থাকতে হয়।

২

শ্রীম দোতলার ঘরে প্রবেশ করিতেছেন। সঙ্গে সঙ্গে শুকলাল ও জগবন্ধু প্রবেশ করিলেন। জগবন্ধু কার্যোপলক্ষে বেলেঘাটা গিয়াছিলেন। শুকলালকে সঙ্গে লইয়া ফিরিয়াছেন। এখন সন্ধ্যা সাতটা। আজ ২২শে অক্টোবর, ১৯২৩ খ্রীঃ, ৫ই কার্তিক ১৩৩০ সাল। সোমবার শুক্লা ত্রয়োদশী।

শ্রীম মেঝেতে বসিয়াছেন। পাশে ছোট জিতেন, সুধীর, বড় অমূল্য, যোগেন, বিদ্যাপীঠের বলাই মহারাজ, ছোট ললিত প্রভৃতি বসিয়া আছেন। শ্রীম বলাইয়ের সহিত কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (বলাইয়ের প্রতি)—কৃষ্ণানন্দ চিঠি দিয়েছেন, মানভূমে তপস্যা করছেন। স্থানটি খুব সুন্দর। ভিক্ষারও সুবন্দোবস্ত হয়েছে। রাত্রে শুধু দুধ খান। লিখেছেন, এখানে থেকে বাঘের ডাক শোনা যায়। এইরূপ একটি স্থান চেয়েছিলেন। ভগবান তাই জুটিয়ে দিলেন। আবার লিখেছেন, সব সুবিধা হয়েছে। এখন মনের সুবিধা হলেই হয়।

এ-সব দেখতে হয়, তবে তপস্যার একটা idea (ধারণা) হয়। সবই অনুকূল, এখন মনটি অনুকূল হলেই হলো। খাঁটি কথা!

শ্রীম (সকলের প্রতি)—নিচের মনটার গতি সর্বদাই নিচের দিকে, বিষয়ে। তাকে উপরে তুলতে হবে। এ-টি হয় তাঁর কৃপায়।

আর চেষ্টা করতে হয়। একদিন সকলকে ঈশ্বরের কাছে যেতে হবে। ওখানে যে সকলের বাড়ী! ওটিই মনের 'নিজ নিকেতন'।

ঠাকুর বলতেন ও-দেশে (কামারপুকুরে) তল্‌তা বাঁশ আছে, খুব সোজা। মাছ ধরবার জন্য ওটাকে বাঁকিয়ে বড়শী বেঁধে জলে পুঁতে রাখে। মাছটা টোপ খাচ্ছে। যেই একটু নাড়া পড়েছে অমনি চট করে উপরে উঠে গেল। একেবারে সোজা হয়ে গেল। মানুষের মনও তেমনি। স্বাভাবিক দৃষ্টি উপরের দিকে। কিন্তু 'মাছের' জন্য নিম্ন-দৃষ্টি হয়ে গেছে। 'মাছ' মানে বাসনা। বাসনাতেই কর্ম আর তাতেই বন্ধন।

শ্রীম (সাধুর প্রতি)—অবতার এসে এই message (সংবাদ) দেন, ঈশ্বরের সঙ্গে কথা কওয়া যায়। দর্শন নয় শুধু, আবার কথা! একঘর লোক বসা। ঠাকুর বলছেন, 'মাইরি বলছি, মা এসেছেন! এই যে আমার সঙ্গে কথা কইছেন।'

ঠাকুর সর্বদা ঐ ভাবে থাকতেন। কখনও সমাধি, কখনও গান, কখনও নৃত্য, কখনও কথাবার্তা—সর্বদা মার সঙ্গে যুক্ত। এক মিনিটের জন্যও তাঁর থেকে আলাদা হন নাই। নিশিদিন ঐতে মন।

মাকে বলেছিলেন 'আমি মূর্খ। মা, তুমি আমায় জানিয়ে দাও বেদ বেদান্ত পুরাণ তন্ত্রে কি আছে।' মা বললেন, ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা, এ-টি বেদান্তের সার। সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণ, এ-টি পুরাণের সার। আর তন্ত্রের সার, সচ্চিদানন্দ শিব। আর ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ। বলতেন, মা আমাকে সব জানিয়ে দিয়েছেন। আর বলতেন, তাঁর কৃপা হলে জ্ঞানের কমতি হয় না। আপনিই রাশ ঠেলে দেন, যেমন ও-দেশে ধানের রাশ ঠেলে দেয়।

শ্রীম যোগেনের সঙ্গে কথা কহিতেছেন। সাহস পাইয়া যোগেন পদত্যাগ-পত্রের একখানা খসড়া শ্রীমর হাতে দিলেন। শ্রীম বিরক্ত হইয়া তাহা দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। বলছেন, 'এ দেখে কি হবে'?

যোগেন তার বৈষয়িক ব্যাপারেও মহাপুরুষদের টানিতে চায়। এই তাহার দোষ। তাহা ছাড়া ভক্ত লোক। কোন একটি প্রতিষ্ঠানের

সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তাই সাধুরা অনেকে তাহাকে পছন্দ করেন না। শ্রীম তাই বলিতেছিলেন, ঐ সংস্রব ছাড়িতে।

যোগেন (কাঁদ কাঁদ স্বরে)—দশমীর দিনে ওঁকে নিজ মুখেই বলতে শুনেছি, 'ভালমন্দ সবই তিনি করেন। তাঁর ইচ্ছাতেই সব হয়। কিন্তু তাঁ'তে ভালমন্দ নাই।' যদি তাই হয় তবে উনি বিজয়ার দিনে মঠে আমায় কাঁদিয়ে দিলেন কেন? ঐ দিনে শত্রুকেও অমন করে তাড়িয়ে দেয় না—আর প্রতিষ্ঠান কি আমার ইচ্ছায় হয়েছে, ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই হয়েছে। তবে কেন উনি আমার উপর অত কঠোর?

শ্রীম—হাঁ, তিনিই সব করেন। তাঁর দু'টি ডিপার্টমেণ্ট আছে, বিদ্যা ও অবিদ্যা। বিদ্যা—যেমন জপ, তপ, সাধুসঙ্গ, তীর্থ এ-সব। বিদ্যাও মায়া, কিন্তু তাতে মুক্ত হয় মানুষ। অবিদ্যাতে বন্ধন করে। সংসারী লোক কি আর তা চিনতে পারে? যাঁদের ঈশ্বরদর্শন হয়েছে তাঁরা পারেন। সকলের বুঝবার উপায় নাই। তাই তো সাধুরা দেখতে পাচ্ছেন, ও-তে আপনার অকল্যাণ হবে, তাই ছেড়ে দিতে বলেছেন। আপনার উপর শত্রু-ভাব নাই। কথা না শুনলে কি করা যায়? উত্তম বৈদ্য কঠোর হন; বুকের উপর হাঁটু গেড়ে ঔষধ খাওয়ান। সাধুদের কথা শুনলে আপনার মহা কল্যাণ হবে। তাঁদের স্বার্থ কি এতে? আপনার ভালর জন্যই বলেছেন।

আজও দেবী-ভাগবত পাঠ হইতেছে—নরনারায়ণের উপাখ্যান। পাঠক জগবন্ধু। শেষ হইলে শ্রীম কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (যোগেনের প্রতি)—দেখুন,' শাস্ত্র বলছেন, তপস্যা না করলে ভাল মন্দ বোঝা যায় না। তাই নারায়ণ ঋষি তপস্যা করেছিলেন। সেইজন্য যাঁরা অনেক তপস্যা করেছেন তাঁদের কথা আমাদের শোনা উচিত। আমাদের মঙ্গলের জন্যই তাঁরা সব বলেন। উনি আপনার কল্যাণের জন্য বলছেন, ঐ সম্পর্ক ছেড়ে দিতে।

ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব—সব প্রকৃতি সেজে আছেন আদ্যাশক্তির কাছে। মানে, surrender (আত্মসমর্পণ) করেছেন। তাছাড়া উপায় কি?

সৃষ্টির ভিতর থাকতে হলে এ-টি করতেই হবে। ঠাকুরও প্রকৃতিভাবে ছিলেন দু'বছর। গায়ে ওড়না দিতেন আর গহনা পরতেন। সেই গহনা পরে মাঠাকরুণকে দিছলেন।

শ্রীম (মোহনের প্রতি)—হাঁ আপনারা যে মঠে এই কয়দিন তপস্যা করে এলেন তার কথা বলুন। কি কি হলো? (গম্ভীর ভাবে যোগেনের প্রতি) এঁরা সব মঠে থাকেন কি না তপস্যার ভাবে। এই যে মহাযজ্ঞ হয়ে গেল, দুর্গাপূজা—এতে এঁরা সব যোগদান করেছিলেন কি না।

ডাক্তার ও বিনয় প্রবেশ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে অমৃতও আসিলেন।

মোহন—মহাপুরুষগণ কত বড়, বাইরের ব্যবহার দেখে বোঝা যায় না। হয়তো একটুতেই রেগে গেলেন। পর মুহূর্তেই একেবারে জল। মনে কিছু থাকে না যেন শিশু, কত কৃপাবান!

শ্রীম (বালকের মত ঔৎসুক্যে)—বলুন না কি হয়েছিল, বলুন।

মোহন—পূজার সময় মঠে একদিন রাত্রিতে একটা আধপাগল মিস ম্যাকলিওডের ঘরে ঢুকেছিল। খোলা ঘর ছিল। ঢুকে এ-টা ও-টা নাড়াচাড়া করছিল। উনি শুয়ে আছেন। ওঁর গলার লকেটটি খুলে পাশে রেখেছেন, স্বামীজীর মূর্তি।

শ্রীম—তারপর কি হল, শীঘ্র বলুন।

মোহন—অন্ধকারে চক্‌চক্ করছে দেখে পাগলটা ও-টা ওঠাতে গেল। বৃদ্ধারও নিদ্রা ভঙ্গ হয়ে গেছে আর চেঁচিয়ে উঠলেন। তখন অন্যরা সব গিয়ে পাগলকে ধরে নামিয়ে আনে।

সকালে তাকে ধরে পূজামণ্ডপের সামনে আমতলায় নিয়ে এসেছে। মহাপুরুষ মহারাজ এদিক ওদিক বেড়াচ্ছিলেন। হাতে একটা বেতের মোটা লাঠি। উনি রেগে গেছেন, তাই লাঠি দিয়ে ধমক দিচ্ছেন। বলছেন, 'ব্যাটা, মেয়েরা অলঙ্কার পরে না। কি চুরি করতে গিছলে? দাও ব্যাটাকে পুলিশে দিয়ে দাও।' মিস্ ম্যাকলিওড কাছেই দাঁড়ান ছিলেন। তিনি আপত্তি করে বললেন, 'No, no—not to the police. He entered as a thief but he

came out as a saint. Because he stole away Swamiji (না না, পুলিশে নয়। চুরি করতে গিছলো কিন্তু বের হল সাধু হয়ে, কারণ সে স্বামীজীকে চুরি করেছে যে)। মহাপুরুষ একেবারে গলে গেলেন এই কথা শুনে।

আমাকে বললেন, 'ব্যাটাকে স্নান করিয়ে নিয়ে এসো গঙ্গায়। আমি কাপড় পাঠিয়ে দিচ্ছি। গঙ্গায় তখন পূর্ণ জোয়ার। ভয়, পাছে জলে ভেসে যায়। তাই একটা কাপড় ওর কোমরে বেঁধে তাকে স্নান করালাম। ইতিমধ্যে মহাপুরুষ মহারাজ উমেশ মহারাজকে দিয়ে একখানা ভাল নূতন কাপড়, চাদর ও জামা পাঠিয়ে দিয়েছেন। তাকে ঐ কাপড় পরিয়ে মঠে নিয়ে যাই। এবার মহাপুরুষ মহারাজ একথালা খাবার পাঠিয়ে দিলেন, প্রচুর উত্তম মিষ্টান্নাদি। সে খুব পরিতোষ করে খেল। তারপর খোঁজ নিয়ে জানা গেল সে বউবাজারের লোক। তখন একজন সেবক দিয়ে গাড়ী করে তাকে কলকাতায় পাঠান।

শ্রীম (যোগেনের প্রতি)—দেখুন কি হৃদয়, কি দয়া! আহা, 'মহাপুরুষ' বলে এই জন্য। এঁরা সব বজ্রের মত কঠোর আবার কুসুমের চাইতেও কোমল। আদর করে নাইয়ে খাইয়ে, নূতন কাপড়-জামা পরিয়ে বাড়ী পাঠিয়ে দিলেন। এ কে পারে সাধু ছাড়া? তাঁরা চান সরলতা। এ না দেখলে তখন কঠোর ভাব ধারণ করেন।

আর মিস ম্যাকলিওডের কি গাঢ় প্রেম, কি মহৎ আর উঁচুভাব! স্বামীজীর লকেট চুরি করেছে তাতে উনি বলেছেন saint (সাধু) হয়ে গেছে! ধন্য মহিলা!

শ্রীম (সকলের প্রতি)—তাই তো বলি মঠে যেতে সর্বদা। এ সব অমূল্য সম্পদ পাওয়া যায় সেখানে। যেন সত্যিকার ড্রামা হচ্ছে ভগবানকে নিয়ে।

গীতায় তাই বলেছেন ভগবান, স্থিতপ্রজ্ঞের সব ব্যবহার দেখতে হয়, তবে বোঝা যায় নিজে কোথায় দাঁড়িয়ে আছি। বাইরে দেখলে মনে

হয়, পুলি (একপ্রকার পিঠে) সব এক, কিন্তু দেখুন ভিতরে কত তফাৎ।

শ্রীম—আর কিছু হলো ?

মোহন—কবিরাজ মশায়কে একটা নূতন চাদর দিয়েছিলেন মহাপুরুষ মহারাজ। আর কিছু মিষ্টি।

শ্রীম—কত বড় পণ্ডিত, মহামহোপাধ্যায়। অত বয়স—কি ব্যাকুলতা সন্ন্যাসের জন্য! আর কিছু কথাবার্তা হলো ?

মোহন—মহাপুরুষ মহারাজ দশমীর দিন আমাকে রুটি আনতে পাঠিয়েছিলেন কলকাতায়। ফিরবার সময় 'উদ্বোধন' হয়ে ডাক্তার ও বিনয়ের সঙ্গে নৌকায় মঠে আসি। তখন মহাপুরুষ মহারাজ পশ্চিমের বারান্দায় বেঞ্চিতে বসা। সামনে কতকগুলি ভক্ত নিচে মেঝেতে বসে আছেন। রেঙ্গুন থেকে দু'জন ভক্ত এসেছেন- একজন বৃদ্ধ, অপরজন প্রৌঢ়। এঁরা সব কথাবার্তা বলছেন :

মহাপুরুষ (ভক্তদের প্রতি)—কাজকর্ম সবই তাঁর। তাঁতে ভাল মন্দ নাই। তিনি এ দ্বন্দ্বের উপর। কিন্তু তাঁর মহামায়াতে আমাদের কাছে ভালমন্দ দেখাচ্ছে। তিনি নিজে আনন্দস্বরূপ। তাঁর সব ভাল। আমাদের অহং বুদ্ধিটাই যত গোল বাধায়। এতেই ভালমন্দ দেখায়। তাই বলেছিলেন, এটাকে ঈশ্বরের দাস করে সংসারে থাক।

প্রৌঢ় ভক্ত—কিছু উপাখ্যান গল্প করে বললে বেশ মনে থাকে—যেমন অজামিলের গল্প। পৌরাণিক গল্প শুনতে ইচ্ছা হয়।

মহাপুরুষ—সে তো আপনি জানেনই। আর এ-সব একদিনে হয় না। আর আমার এক কথা, কিছু করা ভাল।

প্রৌঢ় ভক্ত—তারকব্রহ্ম নাম কি ?

মহাপুরুষ—ওর মানে জানিনা। কাশীতে মরলে শিব ঐ নাম শুনান কানে, এই জানি। ঋষিরা, অবতাররা এক এক নাম প্রচার করেছেন। ঐ সব নাম জপ করলে, চিন্তা করলে মুক্তি হয়। আসল কথা হচ্ছে, কিছু করা। খালি বলা, শোনা বা পড়া থেকে করা ভাল—এই জপধ্যান।

প্রৌঢ় ভক্ত—নামে রুচি হয় কি করে?

মহাপুরুষ মহারাজ—আগে সাঁতার শিখে জলে নামা হয় না। আগে ভাল লিখতে শিখে পরে লিখিয়ে হয় না। আগে খারাপ লিখতে লিখতে তারপর হাত পাকে।

প্রৌঢ় ভক্ত—ঈশ্বরকে ডাকবার সৎ ইচ্ছা হয় কি করে?

মহাপুরুষ মহারাজ—সাধুসঙ্গ করতে করতে হয়। মাঝে মাঝে সাধুসঙ্গ করবেন। এরূপ করলে একটা নেশা হয়ে যাবে—মদের, গাঁজার যেমন নেশা হয়। তখন রোজ সাধুসঙ্গ করতে ইচ্ছা হবে। এ-টি না করলে ঈশ্বরকে ভাল লাগবে না। একদিনে কি হয়? যেখানেই ভাল লাগে সেখানেই সাধুসঙ্গ করবেন।

শ্মশান-বৈরাগ্য আছে একরকম। কেউ মরলো, তখন সংসার একটু অনিত্য বলে বোধ হল। তারপর যেই সেই। মানুষের কখনও সৎ ইচ্ছা হয়, তারপর সব ভুলে যায়। ঠাকুর বলতেন, যেমন স্প্রীংএর গদী। যতক্ষণ মানুষ বসা ছিল ততক্ষণ নিচু ছিল। যেই উঠে পড়লো অমনি স্প্রীংও সঙ্গে সঙ্গে উঠলো।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—ধন্য আপনারা এ-সব সৎসঙ্গ হচ্ছে। আর অমন সব অমূল্য কথা শোনা যাচ্ছে। সকলের উপর লাভ তাঁদের কাজ, তাঁদের দৈনন্দিন জীবন দেখা যাচ্ছে। এ-টিতে যেমন হয় তেমন হাজার পড়াতেও হয় না। আমরাও ধন্য এ-সব কথা শুনতে পাচ্ছি। তিনি মঠ করেছেন বলে এ-সব হচ্ছে। আহা, কি কথা এ-সব—মহাপুরুষ যা বললেন—'কিছু করা ভাল', 'সাধুসঙ্গ করবেন'। এ সবের প্রত্যক্ষ ফল তাঁদের নিজের জীবন। তাই তো বলেন, অত জোর দিয়ে এ-কথা। সাধু অর্থাৎ ঠাকুরের সঙ্গ করে করেই তো এঁরা অত বড় সাধু হয়েছেন। তাই সাধুসঙ্গ করা বড়ই দরকার।

৩

শ্রীম চারতলার সিঁড়ির ঘরে উপবিষ্ট। অনেক ভক্তের সমাগম—বড় জিতেন, শুকলাল, মনোরঞ্জন, ডাক্তার, বিনয়, জগবন্ধু প্রভৃতি।

আজ ১৯শে নভেম্বর ১৯২৩ খ্রীস্টাব্দ। সোমবার।

এখন একটু শীত পড়িয়াছে—বাহিরে বসা যায় না। এখন রাত্রি নয়টা। আসামের ডাক্তার বালীগঞ্জ হইতে এক বন্ধুকে সঙ্গে নিয়া আসিয়াছেন। প্রথম যৌবনে ডাক্তারের সঙ্গীর পদস্খলন হইয়াছিল। এখন সামলাইয়া নিয়াছেন। উভয়ের বয়স প্রায় ত্রিশ। সঙ্গী অতি ভক্তিভরে শ্রীমর সহিত কথাবার্তা কহিতেছেন।

সঙ্গী (শ্রীমর প্রতি)—আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে ঠাকুরকে দেখছি।

শ্রীম (প্রশান্ত গম্ভীরভাবে)—তা আর হবে না। দক্ষিণেশ্বরে এমন অনেক ভক্ত যান যাঁরা ওখানকার বৃক্ষাদিকে আলিঙ্গন করেন (শ্রীম নিজেও করেন)। তাঁরা মনে করেন তাঁকে (ঠাকুরকে) আলিঙ্গন করছি। বৃক্ষগণ ত্রিশ বৎসর ধরে তাঁকে দর্শন করেছে, স্পর্শনও পেয়েছে। তাঁর শরীরের হাওয়া ওদের গায়ে লেগেছে। রাস্তার পাশে তাঁকে দর্শন করবার জন্যই যেন তারা দাঁড়িয়ে আছে। সব রাস্তা দিয়েই তিনি গিয়েছেন। ওখানকার প্রতি ধূলিকণা জীবন্ত —surcharged with spirituality.

আপনি যে এরূপ দেখবেন এতে আর আশ্চর্য কি? তিনি বলতেন, চোখে লাল চশমা পরলে সব লাল দেখায়। আবার ন্যাবা লাগে চোখে। 'ন্যাবা' কি জানেন? সবই তখন হল্‌দে দেখায়। আপনার তাই হয়েছে। যাঁরা তাঁর নিকট অত বসেছেন তাঁদের দেখলে কেন না হবে আপনার উদ্দীপন?

আমরা অনেক লেকচার শুনতাম কেশব সেন প্রভৃতির, ঠাকুরের কাছে যাবার আগে। মনে হতো বেশ বলেন। কিন্তু ওঁর কাছে গিয়ে দেখলাম, এমন কথা তো কখনও শুনি নাই—প্রাণে যেন গেঁথে যায়। এমন আশা, এমন ভরসা তাঁর কথায়। তাঁর কথামৃত স্নিগ্ধশীতল আর 'তপ্তজীবন'ই বটে।

আগে সব বক্তৃতা শুনে মনে হতো ঈশ্বর যেন কত দূরে। ওমা, ওখানে গিয়ে মনে হতে লাগলো অতি নিকটে, যেন দর্শন হয়ে যাচ্ছে।

মাঝে মাঝে ঠাকুর কথা কইছেন ঈশ্বরের সঙ্গে। একঘর লোক সেই দৃশ্য দেখছে বসে।

উঃ, কি ব্যাকুলতা ঈশ্বরের জন্য। এমন ব্যাকুলতা কোথাও দেখিনি। যেন জগন্মাতার কোলে শিশু খেলছে। খেলতে খেলতে হঠাৎ কান্না— সন্দেশ চাই। সন্দেশ দেওয়া হলো। হাতেই আছে, একটুও খায়নি। এমন সময় মার কথা মনে হলো, তখন সব ফেলে 'মা, মা' বলে কাঁদতে লাগলো। আর কিছু ভাল লাগে না, মা ছাড়া। আগে যাকে দেখে ভয় পেতো, পালিয়ে যেতো সে যদি এখন এসে বলে, আয় মার কাছে নিয়ে যাই, অমনি তার গলা জড়িয়ে ধরে। সব ছেড়ে চললো মার কাছে। মার জন্য ব্যাকুল। তেমনি ব্যাকুলতা ঠাকুরের।

আর বৈরাগ্য কি তীব্র! পরণের কাপড়খানা পর্যন্ত রাখতে পারেন নাই। আপনি সব খসে পড়ে যাচ্ছে। নেংটা হয়ে বেড়াচ্ছেন, যেন পাঁচ বছরের শিশু।

দুইদিন পর। আজ একুশে নভেম্বর। শ্রীম দোতলার ঘরে পূর্বাস্য বসা। নিত্যকার ভক্তগণ উপস্থিত।

সংসারে থেকে ঈশ্বরদর্শন বড়ই কঠিন। তবে তাঁহার কৃপায় কাহারও কাহারও হয়। সে খুব কম। অনেক অভ্যাস আর সাধনা করিলে কতকটা হয়। এই সব কথা হইতেছে।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—গড়ের মাঠে গিছলেন ঠাকুর, সঙ্গে দুই তিনজন ভক্ত। 'উইলসনের সার্কাস দেখাতে ভক্তরা নিয়ে গেছেন। আট আনার সীটে বসা হল গ্যালারীতে। খুব আনন্দে সব দেখলেন। একচল্লিশ বছর আগে—এইটিন এইটিটু-র অক্টোবর। পরে বাইরে এসে বলেছিলেন, দেখ, কত চেষ্টা করে, সাধনা করে তবে বিবি দাঁড়াতে শিখেছে চলন্ত ঘোড়ায় একপায়ে। সংসার তেমনি। উঃ কি অভ্যাস! ঘোড়াটা বেদম দৌড়াচ্ছে একটা রিংএর চারদিকে, যেন তীর ছুটেছে। এরই ওপর যেন স্বাভাবিকভাবে বিবি উঠে পড়ছে আর নামছে, যেমন মানুষ একটা জলচৌকির উপর উঠলো আর নামলো।

সংসার জলন্ত অগ্নিকুণ্ড। অভ্যাস থাকলে আগুন গায়ে তত লাগে

না। খুব অভ্যাস চাই প্রাণপণ করে অভ্যাস, ষোল আনা মন দিয়ে করা চাই। তবে হয়। দু'চারটে মানুষ এরূপ তিনি করেন, লোকশিক্ষার জন্যে।

আহা, একচল্লিশ বছর হয়ে গেছে। আমার মনে হচ্ছে যেন কাল হয়ে গেল। (কতকগুলি ভক্তকে দেখাইয়া) তখন এদের কারো জন্ম হয় নি। এখান থেকে একটা লাইন টানলে ওদিককার (উত্তরের) ওদের কারো জন্ম হয় নাই তখন। ওরা সব তখন ছিল in the womb of futurity (ভবিষ্যতের গর্ভে)। এখন গোঁফ দাড়ি উঠেছে। একটু কথা বল্লেই, বাবা অভিমান কত!

শুকলাল ও বড় জিতেন শ্রীমর ডান দিকে বসা। বয়স পঞ্চাশ হইবে। আর জগবন্ধু, ডাক্তার, বিনয়, ছোট অমূল্য, মণি ও ছোট রমেশ শ্রীমর বামদিকে বসা। শ্রীম পূর্বাস্য।

পরদিন রাসপূর্ণিমা। একটু শীত পড়িয়াছে। শ্রীমর গায়ে সোয়েটার, মাথায় কমফোরটার জড়ান। দোতলায় সিঁড়ির ডান দিকের ঘরে বসা। পাশেই শুকলাল, বড় জিতেন, ছোট অমূল্য, ডাক্তার, ছোট রমেশ, বিনয়, ছোট জিতেন, জগবন্ধু প্রভৃতি বসিয়া আছেন।

শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ হইতেছে লণ্ঠনের আলোতে। রাসপঞ্চাধ্যায়। গৃহ নিস্তব্ধ। পাঠ্য বিষয়ের সহিত শ্রীম যেন এক হইয়া গিয়াছেন— জলে বরফ গলিয়া যেমন এক হইয়া যায়। নড়ন চড়ন নাই, স্থির। সোজা হইয়া বসিয়া আছেন। চক্ষু অর্ধ নিমীলিত। হস্তদ্বয় অঞ্জলিবদ্ধ, ক্রোড়ে স্থাপিত। বদনমণ্ডল প্রসন্নোজ্জ্বল। দেখিলে মনে হইতেছে পঠনীয় বিষয় যেন আর কর্ণে প্রবেশ করিতেছে না। অথচ আনন্দোৎফুল্ল মুখমণ্ডল। দীর্ঘকাল এইভাবে বসিয়া আছেন। পাঠ শেষ হইয়া গেল তবুও শ্রীম ঐভাবে বসিয়া আছেন।

এইবার চক্ষু মেলিয়া শ্রীম মৃদু মধুরকণ্ঠে কথা বলিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—ঠাকুর বলতেন, এই গোপী-প্রেমের এক বিন্দু কেউ পেলে হেউ ঢেউ হয়ে যায়। আহা, কি ভালবাসা ভগবানের জন্য। পতি পুত্র গৃহ, পিতা মাতা পরিজন সর্বস্ব ত্যাগ করেছেন।

এমন প্রিয় যে নিজ দেহ তারও হুঁশ নেই—স্ত্রী কি পুরুষ। তাঁতে মন মগ্ন। তাঁতে প্রেম হলে আপনি সব ছেড়ে যায়, ত্যাগ হয়ে যায়—যেমন খসে পড়ে পত্র-পুষ্প। জোর করে ত্যাগ নয়—সহজ স্বাভাবিক ত্যাগ। প্রেমভক্তির মুকুটমণি রাসলীলা।

এই প্রেম বাংলা দেশেই একটু দেখা যায়। আর কোথাও তেমন নেই। পশ্চিমে, আর দক্ষিণে—শিবকাঞ্চি, বিষ্ণুকাঞ্চি, রামেশ্বর, কন্যাকুমারী, মীনাক্ষী, চিদম্বরম, বালাজী সর্বত্রই দাস্য ভক্তি। গোপী-প্রেমের আস্বাদ পেয়েছে বেঙ্গল। এখান থেকে ওদিকে গেছে—বৃন্দাবনে।

ডি. এল. রায়ের গানে আছে 'এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি। সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি'—এইটি 'সকল দেশের রাণী'। World (জগতের) মধ্যে India (ভারত) সেরা, তার শ্রেষ্ঠ বেঙ্গল।

চৈতন্যলীলার মূল এই প্রেমভক্তি। তাঁর সঙ্গে এইটি বৃন্দাবনে যায়।

শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পাঁচটি ভাব। তার মধ্যে মধুর ভাব শ্রেষ্ঠ। এই মধুর ভাবেই রাসলীলা হয়। তার পূর্ণ বিকাশ এখানে হয়েছিল। চৈতন্যদেব বার বছর এইভাবে ছিলেন, মহাভাবে।

একটি ভক্ত ভাবিতেছেন, শ্রীম আজ চৈতন্যলীলার স্মৃতিতে মগ্ন। ঠাকুর শ্রীমকে চৈতন্যের দলে দেখিয়াছিলেন। তাই কি এই অবস্থা ?

শ্রীম—ক্রাইস্টের ভক্তদেরও কারো কারো প্রেম হয়েছিল। মেরীর প্রেম হয়েছিল। ক্রাইস্ট নিজে বলেছেন, 'Mary has chosen that good part, which shall not be taken away from her' —মেরীর এই প্রেম অনন্তকাল থাকবে। ভগবান প্রেমস্বরূপ।

(জনৈক ভক্তের প্রতি) এইসব পরে retrospectively (পিছন ফিরে) দেখলে আনন্দ হবে, উদ্দীপন হবে—আমরা রাসের দিন পাঠ শুনেছিলাম, এই মনে করে।

হিমপুঞ্জের শীতল স্পর্শের ন্যায়, প্রেমস্পর্শ হৃদয়ে বহন করিয়া, ভক্তগণ স্বস্থানে গমন করিলেন, পূর্ণিমার চাঁদ দেখিতে দেখিতে।

মর্টন স্কুল, কলিকাতা, ২২শে নভেম্বর ১৯২৩ খ্রীঃ
৬ই অগ্রহায়ণ, ১৩৩০ সাল, পূর্ণিমা, বৃহস্পতিবার।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

গদাধর আশ্রমে রাসপূর্ণিমায় শ্রীম

১

শ্রীম সকালে ট্রামে চড়িলেন, গড়ের মাঠে বেড়াইতে যাইতেছেন। বেড়াইতে বেড়াইতে এসপ্লানেডে স্বামী কমলেশ্বরানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। ইনি গদাধর আশ্রমের অধ্যক্ষ। ইহা শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের অন্যতম শাখা। শ্রীমৎ স্বামী কমলেশ্বরানন্দকে অত্যন্ত স্নেহ করেন। ইনি ধরিয়া বসিলেন শ্রীমকে আজ গদাধর আশ্রমে যাইতেই হইবে। জোর করিয়া লইয়া গেলেন। শ্রীম তাঁহার প্রেমের আকর্ষণ এড়াইতে পারিলেন না।

আজ ২৩শে নভেম্বর, ১৯২৩ খ্রীঃ শুক্রবার।

মর্টন স্কুল হইতে ভক্তগণ দলে দলে ভবানীপুর আসিতেছেন —গদাধর আশ্রমে। ডাক্তার, বিনয় ও ছোট অমূল্য স্কুল বাড়ীতে শ্রীমকে না পাইয়া গদাধর আশ্রমে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা নিজেদের বাসায় ফিরিতেছেন কাশীপুর। যাওয়া আসায় চৌদ্দ পনের মাইল হইবে। এখন রাত্রি দশটা। সুধীর ও জগবন্ধু ঠনঠনিয়া কালীবাড়ীতে ট্রামে উঠিলেন, ভবানীপুর যাইবেন।

পূর্ণিমা আজও দুই প্রহর পর্যন্ত ছিল। গদাধর আশ্রমে রাসপূর্ণিমা উৎসব আজও চলিতেছে। মঠের নিম্নতলে রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি স্থাপিত হইয়াছে। পূজা, ভোগরাগাদি হইয়া গিয়াছে। আজ

এখানে অখণ্ড ভাগবত পাঠ চলিতেছে। সন্ধ্যার পর শ্যামনাম কীর্তন হইয়াছে।

শ্রীম দোতলায় আসন করিয়াছেন—সিঁড়ির ডানদিকের ঘরে। ইহা আশ্রমের মহন্তর ঘর। শ্রীমকে এই ঘর ছাড়িয়া দিয়া মহন্ত তিনতলায় টিনের ঘরে আশ্রয় লইয়াছেন।

দুইটি ভক্ত শ্রীমর ঘরে প্রবেশ করিলেন। শ্রীম তাঁহাদিগকে দেখিয়াই বলিলেন—যান, ঠাকুরকে প্রণাম করে আসুন। ও, ঠাকুর তো এখন ঘুমুচ্ছেন।

দ্বারকাবাবু ঠাকুরকে একদিন বলেছিলেন, আপনি তো দক্ষিণেশ্বরে মা কালীকে জাগিয়ে দিলেন। এখানেও মাকে জাগ্রত করে দিন। ঠাকুর উত্তর করলেন, কুঁড়ো ফেল। তা হলে আপনিই রাঙ্গা-চোখ বড় রুই মাছ আসবে। অর্থাৎ ঈশ্বর জাগ্রত হবেন।

দ্বারকাবাবু মথুরবাবুর বড় ছেলে, রাসমণির দৌহিত্র আর জগদম্বার পুত্র। ইনি চানকে মা কালীকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

দশজন ভক্ত মাকে ডাকলে তিনি জাগ্রত হন। তীর্থে তিনি জাগ্রত সর্বদা। কত ভক্ত ডাকছেন সেখানে। আবার যেখানে তিনি জাগ্রত হন, সেই স্থান তীর্থ হয়ে যায়, যেমন দক্ষিণেশ্বর। এই কালীঘাট জাগ্রত স্থান—মা রয়েছেন বলে।

আন্তরিক হওয়া চাই। মনপ্রাণ দিয়ে ডাকা চাই। ভক্তের অধীন ভগবান। প্রাণপণে ডাকছে দেখলে দেখা না দিয়ে পারেন না। যেমন শিশু কাঁদছে দেখলে—আছাড় পিছোড় খেয়ে কাঁদছে—মা না এসে পারে না। তেমনি কাঁদা চাই। শেষ জন্মে এই ব্যাকুলতা হয় শুনেছি।

গীতা ক্লাস হইতেছে নিচের ঘরে পরদিন সকালে। একখানা তক্তপোশের উপর বসিয়া স্বামী কমলেশ্বরানন্দ গীতা ব্যাখ্যা করিতেছেন। শ্রীম আসিয়া মেঝেতে পূর্বাস্য বসিয়াছেন। অনেক সাধু ও ভক্তগণ উপস্থিত। তৃতীয় অধ্যায়ের কর্মযোগের ব্যাখ্যা চলিতেছে। শ্রীম একটি ভক্তের কানে কানে বলিলেন, আপনি জিজ্ঞাসা করুন,

তা হলে সন্ন্যাসের দরকার কি ? ভক্তের প্রশ্নে স্বামী কমলেশ্বরানন্দ বলিলেন, ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে কর্ম করতে করতে ঈশ্বরে ভক্তি হয়। তখন কর্ম আপনিই খসে যায়, যেমন অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীলোকের হয়। প্রথম প্রথম অল্প অল্প করে ত্যাগ হয় কর্ম। শেষে সর্ব কর্ম ত্যাগ, জোর করে সন্ন্যাস করতে হয় না। ভেতরে থেকে আপনি হয়।

বেলা নয়টা। কালীঘাটে মা কালীর মন্দিরের ভিতর শ্রীম দাঁড়াইয়া আছেন, সকলের উপরের সিঁড়িতে উত্তর কোণে। মাকে দর্শন করিতেছেন। অসংখ্য লোক আসিতেছে যাইতেছে। খুব ভীড়। স্বামী কমলেশ্বরানন্দ মায়ের পদতলে বসিয়া পূজা করিলেন। শ্রীমকে একবার ভিতরে মায়ের কাছে লইয়া গেলেন। মণীন্দ্র ও জগবন্ধু সঙ্গে আছেন। সুধীর বাহিরে জুতার প্রহরী। একজন ভক্ত আসিয়া দাঁড়াইলে তিনি ভিতরে দর্শন করিয়া আসিলেন।

শ্রীম একটি ভক্তের সঙ্গে পরিক্রমা করিতেছেন। মন্দিরের পূর্ব দিকে দাঁড়াইয়া মন্দিরশীর্ষ দর্শন করিতেছেন। পরিক্রমা শেষ করিয়া পূর্ব দিকের ফটক দিয়া শ্রীম বাহিরে আসিতেছেন। দরজার সামনে একটা গরু শিং দিয়া আঘাত করিতেছিল। একটি ভক্ত দুই হাতে দুইটা শিং ধরিয়া উহাকে পিছনে সরাইয়া দিলেন। শ্রীম মোটরে চড়িয়া গদাধর আশ্রমে চলিলেন।

২

গদাধর আশ্রমের দ্বিতলের গৃহ। শ্রীম মেঝেতে বসিয়া আছেন পূর্বাস্য। সম্মুখে কয়েকজন সাধু ও ভক্ত বসা। জগবন্ধু, বিনয়, ছোট নলিনী, সুধীর প্রভৃতিও আছেন। ভবানীপুরেরও কয়েকজন ভক্ত আসিয়াছেন। তন্মধ্যে একজন ইন্‌জিনিয়ার আছেন, বয়স পঁয়ষট্টি হইবে। ইনি বেশ সৌখীন লোক, দাড়ি ফ্রেঞ্চকাট, কিন্তু শুভ্র। সঙ্গে যুবক পুত্র। ইনি একটু বেশী কথা কন।

আজ ২৫শে নভেম্বর, রবিবার ১৯২৩ খ্রীস্টাব্দ।

কলিকাতা হইতে একটি সাহেব-ভক্তকে সঙ্গে করিয়া অপর

একজন আসিয়াছেন। এই সাহেব ভক্তের নাম মিঃ ডাউলিং (Mr. Dowling)। গত দুর্গাপূজায় ইনি বেলুড় মঠে শ্রীমর সঙ্গে পরিচিত হইয়াছিলেন। স্বামী অভেদানন্দ আলাপ করাইয়াছেন। আজ শ্রীমকে দর্শন করিতে মর্টন স্কুলে যান। না পাইয়া একজন ভক্তসঙ্গে এখানে আসিয়াছেন।

ইন্‌জিনিয়ার শ্রীমর সঙ্গে নানা কথা কহিতেছেন।

ইন্‌জিনিয়ার—আপনিই বুঝি 'কথামৃত' লিখেছেন ?

শ্রীম (বিনীতভাবে)—আজ্ঞে হাঁ।

ইন্‌জিনিয়ার—খুব উপকার করলেন।

শ্রীম—মানুষ কিছু করে না। তিনিই করান। Credit-টি (বাহাদুরী) তাঁর।

এই কথা লইয়া ইন্‌জিনিয়ার মহাশয় নানা আলোচনা করিতেছেন। এক কথা হইতে অন্য কথায় ঝম্প প্রদান করিতেছেন। তারপর অন্য কথা। অনবরত কতকক্ষণ বাগ্‌বৈখরী চলিতেছে। ভক্তগণ অসহ্য বোধ করিতেছেন।

ইন্‌জিনিয়ার মহাশয়ের দৃষ্টি মিঃ ডাউলিং-এর উপর পড়িল। আর রক্ষা নাই। তাঁহার সঙ্গে কথা শুরু করিয়া দিলেন।

Engineer (to Mr. Dowling)—Please, speak something, we wish to hear you.

ডাউলিং খুব বিনয়ী আর অল্পভাষী। ইনি চুপ করিয়া আছেন। ইন্‌জিনিয়ার মহাশয় নাছোড়বান্দা। বার বার বিরক্ত করায় ডাউলিং-এর মুখ খুলিল।

Dowling—I have come here to hear, not to speak. I wish to hear about Ramakrishna from him (M.)

ইন্‌জিনিয়ার (শ্রীমর প্রতি)—আপনি এঁকে সংস্কৃতে দীক্ষিত করুন।

M. (with a smile to Dowling)—They want you to learn Sanskrit.

ইন্‌জিনিয়ারের পুত্র—বাংলা শিখলে প্রথমে 'কথামৃত' দেবেন এঁর হাতে।

Engineer (to Dowling)—You better learn Bengali.

Dowling—Some say to learn Sanskrit. Other want me to learn Bengali. I have spent much time of my life in nothingness, should I spend the remaining days of my life in being a linguist ?

M. (to Dowling)—Yes, you are right. Sri Ramakrishna said, there is nothing in mere scholarship. One may commit to memory all the Sastras, but if one does not practise, and translate the spirit in one's life, all is in vain.

He told us a parable. A Pundit was once crossing a river in a ferry boat. He asked the boatman, by and by, if he had acquired any learning ; if he had read any of the six systems of the Hindu Philosophy. The latter replied in the negative. 'But I have learnt', the boatman added, 'only how to ply the boat and to swim.' Suddenly a storm arose and the boat capsized. The Pundit sank. But the boatman swam to the shore, remarking, 'your philosophy could not save you now.'

M. (to all)—The moral is that one who knows God knows all. Sri Ramakrishna said, a fool becomes a saint, the wisest of man by His grace. Saraswati, the Goddess of learning, resides then in his tongue. He lacks in no knowledge.

M. (to a Bhakta)—আহা, সাধুসঙ্গ করেছে কিনা তাই ধারণা হয়েছে।

Engineer (to Dowling)—Whom do you love—Kali, Durga or Shiva ?

Dowling—Shiva !

M. (to all)—দেখুন, শিব ideal of sannyasins (সন্ন্যাসীর আদর্শ) তাই ভাল লাগছে।*

---

* ইন্‌জিনিয়ার (মিঃ ডাউলিংএর প্রতি)—আপনি দয়া করে কিছু বলুন আমরা শুনতে উৎসুক।

ডাউলিং—আমি এখানে বলতে আসিনি, এসেছি শ্রীরামকৃষ্ণের কথা শুনতে শ্রীমর কাছে।

শ্রীম (স্মিত হাস্যে ডাউলিংএর প্রতি)—এদের ইচ্ছা আপনি সংস্কৃত শিখুন।

ইন্‌জিনিয়ার (ডাউলিংএর প্রতি)—আপনি বরং বাংলা শিখুন।

ডাউলিং—কেউ বলেন সংস্কৃত শিখুন, কেউ বলেন বাংলা। অকর্মে আমার আধা জীবন কেটে গেছে। বাকী জীবনটা কি ভাষা শিখে কাটাতে হবে ?

শ্রীম (ডাউলিংএর প্রতি)—হাঁ, আপনি ঠিক বলেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন শুধু পাণ্ডিত্যে কিছুই নাই। একজন সর্বশাস্ত্রজ্ঞ হতে পারে। কিন্তু যদি শাস্ত্রের মর্মার্থ অভ্যাসের দ্বারা নিজ জীবনে প্রতিফলিত করতে না পারে তবে সবই বৃথা।

শ্রীরামকৃষ্ণ একটা গল্প বলেছিলেন। একজন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত খেয়া নৌকা করে নদী পার হচ্ছিল। কথায় কথায় মাঝিকে জিজ্ঞেস করলে সে ষড়দর্শন পড়েছে কিনা। মাঝি উত্তর করল, আমি পড়ি নি। তবে নৌকো চালাতে আর সাঁতার কাটতে শিখেছি। দৈবযোগে তখন হঠাৎ ঝড় উঠলো, আর নৌকো উল্টে গেল। পণ্ডিত জলে ডুবতে লাগল। মাঝি কিন্তু সাঁতরিয়ে তীরে এসে গেল আর বললে, আপনার শাস্ত্রজ্ঞান এখন আপনাকে রক্ষা করতে পারলে কই ?

শ্রীম (সকলের প্রতি)—এর সারার্থ এই, যে ভগবানকে জেনেছে সে সব জেনেছে। ভগবানকে জানলে নিরক্ষর মহাপুরুষ হয়, জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ হয়। তখন সর্ববিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতী তার কণ্ঠে বিরাজ করেন। তার তখন জ্ঞানের কমতি হয় না।

ইন্‌জিনিয়ার (ডাউলিংএর প্রতি)—আপনি কা'কে ভালবাসেন—কালী, দুর্গা কি শিব ?

ডাউলিং—শিব।

শ্রীম (সকলের প্রতি)—সন্ন্যাসীর আদর্শ শিব।

মিঃ ডাউলিং বিদায় লইলেন। এখন সাড়ে আটটা রাত্রি। ভক্তরা সঙ্গে গিয়া তাঁহাকে ট্রামে উঠাইয়া দিলেন।

পরদিন সকালে বিনয় ও জগবন্ধু শ্রীমর কাছে বসিয়া আছেন। মিঃ ডাউলিংএর প্রসঙ্গ উঠিল। শ্রীম বলিলেন, দেখ, ঠাকুর কি করছেন। কোথায় একটি ফুল করে রেখেছেন। খুঁজে খুঁজে আপনার লোক বের করছেন।

২৭শে নভেম্বর শ্রীম মর্টন স্কুলে আসিয়াছেন। এখন বেলা এগারটা হইবে। একজন শিক্ষক পড়াইতেছিলেন চারতলার ঘরে। শ্রীম ঐ ঘরে প্রবেশ করিলেন। ছেলেদের বলিতেছেন, কয়েকদিন পর পরীক্ষা। এখন তোমরা শুধু গল্প পড়। গ্রামার-টামার তো অনেক হয়েছে। আর বই না দেখে questions and answers (প্রশ্ন ও উত্তর) করতে থাক। শ্রীম মর্টন স্কুলের রেক্টর।

অপরাহ্ন পাঁচটা। শ্রীম ঠাকুরবাড়ী হইতে ফিরিয়াছেন। তিন তলার উত্তরের ঘরে প্রবেশ করিলেন। একটি ভক্ত শিক্ষককে দিয়া স্কুলের অফিস হইতে কিছু অর্থ আনাইলেন। বলিতেছেন, আর পারা যায় না একা একা। শ্রীমর বয়স সত্তর। একটি ভক্ত কাপড়-চোপড় কিছু বাঁধিয়া রাখিলেন। এ সব গদাধর আশ্রমে যাইবে। সন্ধ্যার কিছু পূর্বে শ্রীম ট্রামে উঠিলেন ঠনঠনে কালীতলায়। গদাধর আশ্রমে রওয়ানা হইয়াছেন। একজন সেবক তাঁহাকে পৌছাইয়া দিবার জন্য সঙ্গ লইলেন। কিন্তু লাহাদের বাড়ীর সম্মুখে তাহাকে নামাইয়া দিলেন। মণি সঙ্গে যাইতেছেন।

পরদিন সকালে শ্রীম গদাধর আশ্রমের দোতলার ঘরে বসা, মেঝেতে দক্ষিণাস্য। কঠোপনিষদ্ পাঠ করিতেছেন। বলিতেছেন, নচিকেতা স্ত্রী পুত্র রাজ্য আয়ু কিছু নেবে না, শুধু ব্রহ্মজ্ঞান চায়। একেই বলে সন্ন্যাস! আর এইজন্য কঠোপনিষদ্ সন্ন্যাসীদের অত প্রিয়। বটবৃক্ষের allegoryটি (রূপকটি) কি সুন্দর—'ঊর্ধ্বমূলমধঃ-শাখং'। অর্থাৎ, সংসারের মূল ঈশ্বর, তাই 'ঊর্ধ্বমূলং'। 'অধঃশাখং' মানে নীচে শাখা যার—অর্থাৎ ঈশ্বরের বিপরীত দিকে সংসারের গতি।

বিষয়ানন্দ নিয়ে আছে সংসার। এ ত্যাগ হলে তখন ঈশ্বরের আনন্দ, ব্রহ্মানন্দ। সংসারের লোকে যাতে আনন্দ পায় সেইগুলি নচিকেতাকে দিতে চাইলেন যম—স্ত্রী পুত্র রাজ্য আয়ু। তিনি তা নিলেন না। তিনি মূলকে অর্থাৎ সকল আনন্দের খনিকে চাইছেন। খণ্ড আনন্দ নেবেন না। অখণ্ড সচ্চিদানন্দ চাই।

এখন সকাল সাড়ে আটটা। শ্রীম বেড়াইতে বাহির হইলেন। ভক্তদের চাউলপট্টির মোড় পর্যন্ত আগাইয়া দিয়া তিনি অন্যদিকে চলিলেন। ভক্তরা কলিকাতা যাইতেছেন।

রাত্রি আটটা। গদাধর আশ্রম। নিচের ঘরে ভাগবত পাঠ হইতেছে। শ্রীম মাঝের দেয়াল-আলমারীর সামনে মেঝেতে বসিয়া ভাগবত শুনিতেছেন, স্বামী গিরিজানন্দ পাঠক।

একজন সরল ভক্ত পাঠ শুনিয়া বলিতেছেন, 'ভাগবত কি সুন্দর গ্রন্থ। এমন গ্রন্থ আর হয় না। ভগবানের শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য রাসলীলার কথা আছে।' পাঠক বলিলেন, 'তা বটে, কিন্তু অপর গ্রন্থ ভাল নয় তাও বলা যায় না। এ বলা উচিতও নয়। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ নানা সংশয় তুলে বসেন ভাগবতের। কেউ কেউ বলেন, বোপদেব গোস্বামী রচনা করেছেন ভাগবত। কেউ বলেন, অনেক অংশ প্রক্ষিপ্ত—বুদ্ধদেবের কথা উল্লেখ আছে বলে। কেউ কেউ বলেন, রাসলীলাও প্রক্ষিপ্ত। কারণ রাধার নাম একটিবারও নাই ভাগবতে।'

ভক্ত—কিন্তু এতে কত লোকের উপকার হচ্ছে। কত লোক মুক্ত হয়ে গেছেন ভাগবতের কথা সাধন করে।

পাঠক—তা তো নিশ্চয়। অন্য ধর্মমত আচরণ করেও অপর সব লোক মুক্ত হচ্ছেন। কত গ্রন্থ, কত মত। যার যা ভাল লাগে তাতে বিশ্বাস করে পড়ে থাকা। অন্যের ওপর আক্রমণ না করা। অপরকে কিছু বললে তারা ছাড়বে কেন? যার যার বিশ্বাস্ তার তার কাছে।

এইসব কথা হইতেছে। শ্রীমর ভাল লাগিতেছে না—ডাঙ্গায় যেন মাছ। উদাস দৃষ্টি, উর্ধ্বমুখ করিয়া বসিয়া আছেন। এসব কথা কানে প্রবেশ করিতেছে না।

গভীর নিশি। আশ্রমের ছাদে কালীপূজা হইতেছে। স্বামী কমলেশ্বরানন্দ কিছুকাল হইতে সারারাত্রি জাগিয়া কালীপূজা করেন, আর নিত্য হোম হয়। একটি ঘট স্থাপিত হইয়াছে। তাহারই পাশে সিন্দুররঞ্জিত একটি ত্রিশূল। কালীঘাটের মা কালীর দিকে মুখ করিয়া পূজক বসেন। তাঁহার ডান দিকে আদি গঙ্গা প্রবাহিতা। নিশীথ সময়। রজনী ঘোররূপা, অন্ধকারে আবৃতা। কয়েকজন মাত্র ভক্ত, সাধু ও ব্রহ্মচারী বসিয়া পূজা দর্শন করিতেছেন।

শীত পড়িয়াছে। আকাশ কুয়াশা ও ধোঁয়াতে আবৃত। তাহার ফাঁক দিয়া আকাশে তারাগুলি ঝিকিমিকি করিতেছে। আর নিম্নে হোমাগ্নি প্রজ্বলিত।

এই গভীর রাত্রিতে শ্রীম দোতলার ঘরে বসিয়া আছেন। পাশে দুই তিনটি ভক্ত। একজনকে বলিলেন, যান যান উপরে, কত কাণ্ড হচ্ছে। পূজা হোম কতদিন ধরে। আপনি বুঝি জানেন না? একবার গিয়ে দর্শন করে আসুন। (বিনয়ের প্রতি) বিনয়বাবু, তুমি নিয়ে যাও সঙ্গে করে। দেখিয়ে দাও জায়গাটা।

পনর মিনিট বসলেও কত! পনর মিনিট করতে করতে আধ ঘণ্টা হয়ে যাবে।

অনেকে বলে সময় নেই। কেন, সারারাত পড়ে রয়েছে সামনে! তখন ছাদে বসে করতে পারে না? যে খেলে সে কানাকড়িতে খেলে।

৩

গদাধর আশ্রম। নিচের ঘরে রামনাম সংকীর্তন হইতেছে। দোতলার ঘরে শ্রীম বসিয়া আছেন। বিনয় ও জগবন্ধু পাশে বসিয়া আছেন। শ্রীমর শরীর অসুস্থ, সর্দিকাশি হইয়াছে। রাত্রি এখন নয়টা। আজ ৪ঠা ডিসেম্বর ১৯২৩ খ্রীঃ, ১৮ই অগ্রহায়ণ, ১৩৩০ সাল, মঙ্গলবার। কৃষ্ণা একাদশী।

সারারাত শ্রীমর নিদ্রা নাই রোগের যন্ত্রণায়। ভোর প্রায় চারিটায়

সময় তিনি মেঝেতে বসিয়া ভজন গাহিতে লাগিলেন। আশ্রমের সকলে আসিয়া একত্রিত হইলেন। স্বামী কমলেশ্বরানন্দ শ্রীমর সহিত গাহিতেছেন। পাশে বসিয়া আছেন আর সকলে—বিনয়, জগবন্ধু, মণি, মণীন্দ্র, প্রিয়নাথ প্রভৃতি। শ্রীম মত্ত হইয়া গাহিতেছেন।

গান। কে জানে কালী কেমন, ষড় দর্শনে না পায় দরশন।
মূলাধারে সহস্রারে সদা যোগী করে রমণ॥
কালী পদ্মবনে হংস সনে, হংসীরূপে করে রমণ,
আত্মারামের আত্মাকালী প্রমাণ প্রণবের মতন,
তিনি ঘটে ঘটে বিরাজ করেন ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যেমন॥
মায়ের উদরে ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ড, প্রকাণ্ড তা জান কেমন,
মহাকালে জেনেছেন কালীর মর্ম, অন্য কেবা জানে তেমন॥
প্রসাদ ভাসে লোকে হাসে, সন্তরণে সিন্ধু তরণ,
আমার মন বুঝেছে প্রাণ বুঝে না, ধরবে শশী হয়ে বামন॥

গান শেষ হইল, ব্যাখ্যা চলিতেছে।

শ্রীম (কমলেশ্বরানন্দের প্রতি)—'মন বুঝেছে প্রাণ বোঝে না, ধরবে শশী হয়ে বামন'। 'মন' আর 'প্রাণ' ঠাকুর দৃষ্টান্ত দিয়ে বেশ করে বুঝিয়ে দিছলেন। বলতেন, একজন মরে গেছে। তার মরার খবর নিয়ে এসেছে আর একজন। অপর একজন শুনে বললে, 'হাঁ বল কি! এমন সর্বনাশ! অমন ভাল লোক চলে গেল!' এ-টি হল 'মন'। আর একজন উঠোন ঝাড়ু দিচ্ছিল। যেই মরণের সংবাদ শোনা, অমনি 'এঁ্যা' বলেই একেবারে অজ্ঞান! ঝাঁটা হাত থেকে পড়ে গেল। এটি 'প্রাণ'।

পুনরায় শ্রীম গাহিতেছেন শেষের চরণ দুইটি :

প্রসাদ ভাসে লোক হাসে সন্তরণে সিন্ধু তরণ।
আমার মন বুঝেছে প্রাণ বোঝে না, ধরবে শশী হয়ে বামন॥

বার বার এইটি গাহিতে লাগিলেন মত্ত হইয়া। এইটি থামিল। পুনরায় আর একটি আরম্ভ হইল। গানের পর গান চলিল। যেন ঝরনার জল অনর্গল অফুরন্ত বাহির হইতেছে।

গান। মন কি তত্ত্ব কর তারে যেন উন্মত্ত আঁধার ঘরে।
সে যে ভাবের বিষয় ভাব ব্যতীত অভাবে কি ধরতে পারে॥
অগ্রে শশী বশীভূত কর তব শক্তিসারে।
ওরে কোঠার ভিতর চোর কুঠরি, ভোর হলে সে লুকাবে রে॥
ষড়দর্শনে না পায় দরশন আগম নিগম তন্ত্রসারে।
সে যে ভক্তি রসের রসিক সদানন্দে বিরাজ করে পুরে॥
সে ভাব লাগি পরম যোগী যোগ করে যুগ যুগান্তরে।
হলে ভাবের উদয় লয় সে যেমন লোহাকে চুম্বকে ধরে॥
প্রসাদ বলে মাতৃভাবে আমি তত্ত্ব করি যাঁরে।
সেটা চাতারে কি ভাঙ্গবো হাঁড়ি বোঝ নারে মন ঠারে ঠোরে।।

শ্রীমর সঙ্গে কমলেশ্বরানন্দ গাহিতেছেন।

গান। দেখিলে তোমার সেই অতুল প্রেম আননে।
কি ভয় সংসার শোক, ঘোর বিপদ শাসনে॥
অরুণ উদয়ে আঁধার যেমন যায় জগত ছাড়িয়ে।
তেমনি দেব তোমার জ্যোতি মঙ্গলময় বিরাজিলে।
ভকত হৃদয় বীতশোক তোমার মধুর সান্ত্বনে॥
তোমার প্রেম তোমার করুণা হৃদয়ে প্রভু ভাবিলে।
উথলে হৃদয় নয়নবারি রাখে কে নিবারিয়ে॥
জয় করুণাময় জয় করুণাময়, তোমার নাম গাহিয়ে।
যায় যদি যাক্ প্রাণ তোমার কর্মসাধনে॥

স্বামী কমলেশ্বরানন্দ একা গাহিতেছেন।

গান। জয় কালী জয় কালী বলে যদি আমার প্রাণ যায়।
শিবত্ব হইবে প্রাপ্ত কাজ কি বারাণসী তায়;
অনন্তরূপিণী কালী, কালীর অন্ত কেবা পায়,
কিঞ্চিৎ মাহাত্ম্য জেনে শিব পড়েছেন রাঙ্গা পায়॥

শ্রীম গাহিতেছেন:

গান। সুরা পান করি না আমি সুধা খাই জয় কালী বলে।
মন মাতালে মাতাল করে, মদ মাতালে মাতাল বলে॥

গুরুদত্ত বীজ লয়ে প্রবৃত্তি তার মশলা দিয়ে
জ্ঞান শুঁড়ীতে চোয়ায় ভাটি, পান করে মোর মন মাতালে।
মূলমন্ত্র যন্ত্রে ভরা শোধন করি বলে তারা,
প্রসাদ বলে এমন সুরা খেলে চতুর্বর্গ মিলে।

গান। শিব সঙ্গে সদা রঙ্গে আনন্দে মগনা, মা,
সুধাপানে ঢল ঢল ঢলে কিন্তু পড়ে না॥
বিপরীত রতাতুরা পদ ভরে কাঁপে ধরা,
উভয় পাগলের পারা লজ্জা ভয় আর মানে না॥

এইবার কমলেশ্বরানন্দ আরম্ভ করিলেন। শ্রীমও সঙ্গে ধরিলেন।

গান। গয়া গঙ্গা প্রভাসাদি কাশী কাঞ্চি কেবা চায়,
কালী কালী কালী বলে অজপা যদি ফুরায়॥
ত্রিসন্ধ্যা যে বলে কালী পূজা সন্ধ্যা সে কি চায়,
সন্ধ্যা তার সন্ধানে ফিরে কভু সন্ধি নাহি পায়,
দানব্রত যজ্ঞ আদি আর কিছু না মনে লয়,
মদনের যাগযজ্ঞ বহ্মময়ীর রাঙ্গা পায়।
কালী নামের এত গুণ কেবা জানতে পারে তায়,
দেবাদিদেব মহাদেব যার পঞ্চমুখে গুণ গায়॥

ব্রাহ্ম মুহূর্ত। দেবীপীঠ কালীঘাট। আদি গঙ্গাতট। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাঙ্গপাঙ্গগণ বিভোর হইয়া ভগবদ্ ভজন করিতেছেন। কি অপার্থিব দৃশ্য!

কমলেশ্বরানন্দ একাকী গাহিতেছেন।

গান। কে এলো এলোকেশে ন্যাংটা বেশে রণেতে।
নাচে সবে, নাশে সবে, শিবা সব সঙ্গেতে॥
অধরে রুধির ধারা সর্বাঙ্গ শোণিতে ভরা,
শাণিত কৃপাণ ধরা, কাঁপে ধরা ভয়েতে॥
শব দোলে কর্ণমূলে নরশির শোভে গলে,
অনল জ্বলিছে ভালে কাল ফণী কাঁধেতে;

প্রেমিক বলে ওমা কালী, ভূ-ভার করিলি খালি,
করলি না ভার আমার খালি, পারি না ভার বহিতে ॥

এই গানটি হইতেছে। শ্রীম জগবন্ধুর কানে কানে বলিলেন, এ গানটা লিখে নিন্।

এইবার গান থামিয়াছে। কিছুকাল সকলে নীরব। সকলে যেন ধ্যান করিতেছেন। তারপর কথা হইতেছে।

স্বামী কমলেশ্বরানন্দ (শ্রীমর প্রতি)—'ইমিটেশন অব ক্রাইস্ট' পড়ছিলাম। একটা জায়গা বুঝতে পারি নি। আপনাকে দেখাচ্ছি। এই বলিয়া তিনি বই খুলিয়া পড়িতেছেন।

"But if thou abidest in thyself, and doest not offer thyself up freely into my will, thine oblation is not entire, neither will there be perfect union between us.

"Therefore a free offering of thyself into the hands of God, ought to go before all thine actions, if thou desire to obtain liberty and grace.

"For this cause so few become inwardly free, and enlightened, because they are loath wholly to deny themselves." (Book IV, Chap. VIII).

শ্রীম (সকলের প্রতি)—এর মানে—সম্পূর্ণ শরণাগত না হলে তাঁকে পাওয়া যায় না। মন প্রাণ দেহ সব, ত্যাগ চাই। গীতায়ও আছে এই কথা :

মন্মনা ভব মদ্ভক্ত মদযাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্তৈ্বমাত্মাং মৎপরায়ণঃ ॥

দেহ মন প্রাণ সব তাঁর পায়ে ঢেলে দিলে তবে হবে। অন্য সব দিলেও হবে না, মন সম্পূর্ণ না দিলে। বাইরে ত্যাগ দরকার। কিন্তু মনে ত্যাগ না হলে তাঁকে লাভ হয় না।

ঠাকুর বলতেন, মা আমি আর কিছু জানি না। এইমাত্র জানি—

তুমি মা, আমি ছেলে। যেমন চালাও তেমনি চলি। যেমন বলাও তেমনি বলি। যেমন করাও তেমনি করি।

দেখ, এরপরই আছে ক্রাইস্ট বলেছেন, 'whosoever he be of you that forsaketh not all that he hath, he cannot be my disciple'. খানিকটা তুমি খানিকটা আমি, এ নয়। সব তুমি। সর্বত্যাগীই কেবল আমার শিষ্য।

এই বইটি যিনি লিখেছেন তিনি একজন যোগী। তাঁর মৃত্যুর চার শ' বছর or more (কিম্বা তারও বেশী) পরে এই manuscript (পাণ্ডুলিপি) বেরুলো। তিনি নিজে প্রার্থনা, চিন্তা যেভাবে করতেন সেই সব লিখে রাখতেন—প্রচারের জন্য।

ঠাকুরের এমনই কাণ্ড! কোথায় একটি বীজ কাণিসে পড়েছে, পাখীতে ফেলেছিল। তা থেকে প্রকাণ্ড বটগাছ কত বছর পর জন্মালো। এমনি কাণ্ড সব তাঁর!

(কমলেশ্বরানন্দের প্রতি)—ও গানটি, 'পাবিনা ক্ষেপা মায়েরে'।

স্বামী কমলেশ্বরানন্দ গাহিতে আরম্ভ করিলেন। আর সকলে যোগদান করিলেন।

গান। পাবি না ক্ষেপা মায়েরে ক্ষেপার মত না ক্ষেপিলে,
সেয়ান পাগল বুঁচকি বগল, কাজ হবে না ওরূপ হলে।
শুনিস নে তুই ভবের কথা, এ যে বন্ধ্যার প্রসব ব্যথা,
সার করে শ্রীনাথের কথা চোখের ঠুলি দে না খুলে॥
মায়া মোহ ভোগ তৃষা দেবে তোরে যতই তাড়া,
বোবার মত থাকবি বসে সে কথায় না দিয়ে সাড়া॥
নিবৃত্তিরে লয়ে সাথে, ভ্রমণ কর তত্ত্ব পথে,
নৃত্য কর প্রেমে মেতে, সদা কালী কালী বলে॥
মজা আছে এ পাগলে, জানবি আসল পাগল হলে,
'আয়রে পাগল ছেলে বলে', ঐ পাগলী মায়ে নেবে কোলে;
ফুরাবে পাগলের মেলা ঘুচিবে ত্রিতাপের জ্বালা,
শান্তি ধামে করবে লীলা এ যুক্তি প্রেমিকে বলে॥

শ্রীম গভীর ধ্যানমগ্ন। শিবনেত্রে স্পন্দনহীন। সব স্থির। গান শেষ হইল তবু ঐরূপ উপবিষ্ট।

পরের দিন ৫ই ডিসেম্বর। শ্রীম আজ সকালে মর্টন স্কুলে আসিয়াছেন। অপরাহ্ণ পাঁচটায় গদাধর আশ্রমে ফিরিয়া যাইতেছেন। ভক্তরা সঙ্গে লইয়া শ্রীমকে ঠনঠনে কালীবাড়ীর কাছে গড়ের মাঠের ট্রামে তুলিয়া আসিতেছেন।

রাস্তায় অন্তেবাসীকে বলিলেন, তুমি সেক্রেটারীর কাছে গিয়ে খুব নরম হয়ে বলবে, তিনি বুড়ো মানুষ নিজে আসতে পারবেন না। আমায় এই কথা বলে পাঠিয়েছেন। আমাদের নাম যে দিয়েছেন তাতে আপত্তি নেই। আর এই কথাটা বলা—সত্তর বছর বয়স, চলতে পারেন না।

শ্রীমকে বেদান্ত সোসাইটির কমিটির সভ্য করিয়াছেন। চলিতে চলিতে শঙ্কর ঘোষের লেনে প্রবেশ করিলেন। পুনরায় অন্তেবাসীকে বলিতেছেন, না, অভেদানন্দকেই বলবে। সেক্রেটারী কি আবার বলে বসে। এই বলবে যে তিনি পাঠিয়েছিলেন এই বলতে—তিনি বুড়ো মানুষ চলতে পারেন না। তাই সর্বদা আসতে পারবেন না এবং সমিতির সেবা করতে পারবেন না। তবে নাম রাখতে ওঁর কোন আপত্তি নেই। ও থাকলে থাকতে পারে।

কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটে শ্রীম ভক্তদের বলিতেছেন, দেখুন, এ বয়সের লোক খুব rare (কম), রাস্তায় প্রায় দেখা যায় না।

শ্রীম ট্রামে উঠিয়াছেন—ভবানীপুর যাইতেছেন।

৪

গদাধর আশ্রম। ঠাকুরমন্দিরে শ্রীম বসিয়া আছেন পূর্বাস্য, পশ্চিমের জানালার পাশে। আজ ৮ই ডিসেম্বর রাত্রিতে কালীপূজা হইবে। সম্মুখে পশ্চিমাস্য মা-কালীর ছবি চৌকির উপর স্থাপিত হইয়াছে। স্বামী কমলেশ্বরানন্দ পূজা করিতে বসিলেন। রাত্রি এখন নয়টা। আশ্রমের সাধু ব্রহ্মচারিগণ সকলে পূজা দর্শন করিতেছেন।

ছোট জিতেন, জগবন্ধু, বিনয়, মণি প্রভৃতি ভক্তরাও বসিয়াছেন। ভবানীপুরের ভক্তও কয়েকজন আসিয়াছেন। সমস্ত রাত্রি শ্রীম পূজা দর্শন করিয়াছেন। ভোর সাড়ে পাঁচটায় হোমের পূর্ণাহুতি হইল। সকলের সঙ্গে দাঁড়াইয়া শ্রীম শান্তি পাঠ করিতেছেন।

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।

পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে। ওঁ শান্তিঃ, শান্তিঃ, শান্তিঃ।

পরদিন প্রভাতে শ্রীম বেড়াইতে বাহির হইলেন—আজ ৯ই ডিসেম্বর ১৯২৩ খ্রীঃ, ২২শে অগ্রহায়ণ, ১৩৩০ সাল। শনিবার, শুক্লা প্রতিপদ।

গত রাত্রিতে কালীপূজা দেখিয়াছেন। আজ সকালে বেড়াইতে বেড়াইতে হরিশ পার্কে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, সঙ্গে জগবন্ধু ও বিনয়। ওয়েটিং হাউসের উত্তরের মাঠের বেঞ্চিতে শ্রীম বসিয়াছেন। পার্কে প্রায় লোক নাই। সূর্য উঠিতেছে। শ্রীম একজন ভক্তকে বলিলেন, এই যে কাল রাত্রে পূজা হয়ে গেল এ সব খুব গোপনে রাখতে হয়, কারুকে বলবেন না। (বিনয়ের প্রতি) বিনয়বাবু, তুমিও শোন। আমাদের আর কে কে ছিলেন? ছোট জিতেনবাবু, তিনি তো চলে গেছেন। তাঁর সঙ্গে দেখা হলে বলবেন এই কথা। আর মণিবাবুকেও বলবেন। তিনি তো এ বেলা এখানে আছেন।

এ-সব খুব secret (গোপন) রাখতে হয়। পাব্লিক পূজো আছে, তা সকলে দেখতে পারে। তার জন্যই তো এ-সব পূজো রাত্রে হয়। তখন সকলে যেতে পারে না।

এ স্থান কি পবিত্র, কালীক্ষেত্র! কত দেশের লোক আসে এখানে। মায়ের নাটমন্দিরে ধ্যান, জপ, পাঠ, কত হচ্ছে। ইচ্ছা হয় রোজ একবার যাই।

বিনয় বলিলেন, গিরিজা মহারাজ বলেন, যাবার সময় বেড়াতে বেড়াতে গিয়ে রিকশাতে ফিরলে হয়। শ্রীম উত্তর করিলেন, বুড়োদের সব বাসনা পূর্ণ হয় না। শরীরে বল নেই কিনা। তাই মনে মনেই যেতে হয়। আমরাও তাই করি। মনকে পাঠিয়ে দি।

এইবার অন্য সব কথা হইতেছে—রাজনীতি, ইলেকশান্, কনস্টিটি-উশান দলের পরাজয় এই সব। আজ ইউনিভারসিটি ইনস্টিটিউটে বরিশালের অশ্বিনীবাবুর স্মৃতিসভা হইবে। শ্রীম ভক্তদের বলিলেন, ওখানে আজ সকলে থাকবেন। দেশের মঙ্গল হবে। দেশ যখন এমন লোককে সম্মান করতে শিখেছে তখন মঙ্গল নিশ্চয় হবে। অশ্বিনীবাবুর চরিত্র খুব high (উচ্চ)। ইনি আমাদের সঙ্গে পড়তেন আর ঠাকুরের দর্শন লাভ করেছিলেন। ঠাকুর ভালবাসতেন। তাঁর পিতা ব্রজবাবুকে ঠাকুর নিজের কাছে তিন দিন রেখে দিয়েছিলেন। কত উচ্চ বংশ! ভক্তদের সকলকে নিয়ে ওখানে যাবেন।

আজ 'দরবার ডে'। শ্রীম গদাধর আশ্রমে আছেন। অপরাহ্ণ পাঁচটার সময় মুকুন্দ, শচী ও জগবন্ধু মর্টন স্কুল হইতে আসিয়াছেন। মুকুন্দ রামপুরহাট স্কুলের রেক্টর, শ্রীমকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। শ্রীম শৌচাগারে।

আশ্রমের নিম্নতলে ভক্তদের মজলিস বসিয়াছে। তাঁহারা সব আনন্দোৎসব করিতেছেন। বিনয়, প্রিয়নাথ, মণীন্দ্র, নীলকণ্ঠ, জ্ঞানদির সনৎ মহারাজ। ইনি কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট অম্বিকা মজুমদারের ভ্রাতুষ্পুত্র। ইঁহারা সকলে বসিয়া কিছু জলযোগ করিবেন। ঝুরিভাজা চিনাবাদাম ভাজা—এসব আনা হইয়াছে। নবাগত ভক্তগণও ঐ উৎসবে যোগদান করিলেন।

অপরাহ্ণ সাড়ে পাঁচটা। শ্রীম হরিশ পার্কে প্রবেশ করিলেন। সঙ্গে জগবন্ধু, বিনয়, মুকুন্দ, শচী প্রভৃতি। সূর্য প্রায় অস্তগামী। শ্রীম উত্তর দিক দিয়া পার্কে ঢুকিয়াছেন। সামনেই দুইটি দোলনা। অল্পবয়স্ক ছেলেমেয়েরা দুলিতেছে। কি আনন্দ তাহাদের! ভক্তরা দেখিলেন, শিশুদের এই আনন্দ বৃদ্ধে সংক্রামিত হইয়াছে। শ্রীমর আনন্দ দেখে কে, যেন তাহাদেরই একজন! উহাদের সহিত দোল খাইতে যেন প্রাণ চাহিতেছে!

পার্কের ভিতর চলিতেছেন দক্ষিণের দিকে। সামনেই দুইটি বালক কুস্তি লড়িতেছে। উভয়ের পরনে কোটপ্যাণ্ট। একজন

অপরকে ধপাস করিয়া মাটিতে ফেলিয়া দিল। যাহাকে ফেলিয়াছে দেখিতে সে বড়, যে ফেলিয়াছে সে ছোট। ফেলিয়াই আবার টানিয়া তুলিতেছে, কাপড় ঝাড়িয়া দিতেছে। শ্রীম দাঁড়াইয়া এই তামাসা দেখিতেছেন। বলিলেন, ওটি লিডার ছাড়া আর কি হবে বল? শুধু ফেলে দেয় নি, তুলেছে আবার ঝেড়ে দিচ্ছে।

এইবার ভাইবোনের মজলিস। দুই-এক পা আগাইয়া আসিয়া শ্রীম দাঁড়াইয়া আছেন। তিনটি ভাই, দুইটি বোন। বোনটি সকলের বড়। তাহাদের সঙ্গে আয়া। চিনেবাদাম খাওয়া হইতেছে। বড় বোন বাঁটিয়া দিতেছে। নিবিড় দৃষ্টিতে কি যেন দেখিতেছেন—বুঝি বা ইহাদের ভবিষ্যৎ। একটু আগাইয়া শ্রীম বলিতেছেন, ওখানে বাদাম দিচ্ছে। না, রস আস্বাদন হচ্ছে। রূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শ, এই রস। মানিকে এই মাটি পড়ছে। এই মাটি যাবে তবে মণির (ঈশ্বর) দর্শন হবে।

এবার বড়দের টেনিস্ খেলা। পার্কের দক্ষিণ প্রান্তে দাঁড়াইয়া শ্রীম কিয়ৎক্ষণ দেখিলেন। পার্কের মধ্যস্থলে মেজোরা ব্যাডমিনটন খেলিতেছে। শ্রীম ঘুরিয়া আসিয়া তাহাদের কাছে দাঁড়াইয়াছেন। তিন চারটি সাত আট বছরের ছেলে আসিতেছে। সকলেরই সাহেবী পোশাক, সঙ্গে আয়া। শ্রীম কৌতুকচ্ছলে বলিলেন, কি গো, তোমরা সব সাহেব? ছেলেরা লজ্জিত হইয়া মুচকি হাসিয়া পাশ ফিরিয়া চলিয়া গেল।

পশ্চিমের ফটক দিয়া শ্রীম বাহিরে আসিয়াছেন। ফুটপাথে দাঁড়াইয়া রাস্তার গাড়ীঘোড়া, লোকজনের যাতায়াত দর্শন করিতেছেন। শ্রীমর চোখমুখ দেখিলে মনে হয় তিনি যেন এই সব সামান্য জিনিসের ভিতর অপর কিছু দর্শন করিতেছেন। তাই তাঁহার দৃষ্টি নিবিড়, অর্থপূর্ণ ও আনন্দোৎফুল্ল। বহুরূপী প্রেমময়কে কি তিনি দর্শন করিতেছেন।

হরিশ মুখার্জির রোড সম্মুখে, বেশ প্রশস্ত রাজপথ। দুইদিকে বিজলীর আলো জ্বলিতেছে। অপর পারের পশ্চিমোত্তরের বড় বাড়ীটি একটি উকিলের। সেখানে বিবাহের আয়োজন হইতেছে। রং-বেরংএর আলোর আভায় বাড়ী হাসিতেছে। ঐ লাইনের দক্ষিণ দিকে অপর একটি বাড়ীতেও বিবাহোৎসব। শ্রীম আহ্লাদে

বলিতেছেন, এই দেখ বিয়ের আনন্দ। এখানে হচ্ছে, আবার ওখানেও। আহা, কি আনন্দ—সর্বত্র শিবশক্তির মিলন! মোহন উত্তর করিলেন, আনন্দ বটে, যখন হয়। তারপর সব বের হয়ে যায় আনন্দ। শ্রীম বলিলেন, না, তাতেও আনন্দ। আর যখন পালকি চড়ে যায় বর-কনে—তখন খুব আনন্দ, কি বল শচীবাবু?

গদাধর আশ্রম। শ্রীম ঠাকুরের সন্ধ্যারতি দর্শন করিতেছেন। সাধু ও ভক্তে গৃহ পূর্ণ। যন্ত্র সংযোগে সকলে গাহিতেছেন:

খণ্ডন ভববন্ধন জগবন্দন বন্দি তোমায়।
নিরঞ্জন নবরূপধর নির্গুণ গুণময়॥ ইত্যাদি।

একটি পশ্চিমের রামায়েত সাধুও আরতি দর্শন করিতেছেন। শেষ হইলে কেহ কেহ বসিয়া ধ্যান করিতেছেন। কেহ প্রণাম করিয়া নিম্নতলে গিয়া বসিলেন।

নিচের হলে কথামৃত পাঠ হইতেছে। শ্রীম দক্ষিণাস্য বীরাসনে বসিয়া আছেন। মুকুন্দ, শচী, বিনয়, জগবন্ধু প্রভৃতি আছেন। আর আশ্রমের কয়েকজন সাধু ও ব্রহ্মচারীও বসিয়া আছেন। ভবানীপুরের ভক্তরাও অনেকে আসিয়াছেন।

ব্রহ্মচারী প্রিয়নাথ পড়িতেছেন চতুর্থ ভাগ। মণির গুরুগৃহবাস। এখন রাত্রি সাতটা।

ঠাকুর বলিতেছেন—মা, সীতার মত করে দাও। একেবারে সব ভুল, দেহ ভুল। যোনি হাত পা স্তন কোন দিকে হুঁশ নেই। কেবল এক চিন্তা কোথায় রাম।

কামিনীকাঞ্চনই মায়া। মন থেকে এই দুটি গেলেই যোগ। আত্মা-পরমাত্মা চুম্বক পাথর। জীবাত্মা যেন একটি ছুঁচ। তিনি টেনে নিলেই যোগ। কিন্তু ছুঁচে যদি মাটি মাখা থাকে চুম্বকে টানে না। মাটি সাফ করে দিলে আবার টানে। কামিনীকাঞ্চন-মাটি পরিষ্কার করতে হয়।

গদাধর আশ্রম, ভবানীপুর, ১২ই ডিসেম্বর, ১৯২৩ খ্রীঃ
২৬শে অগ্রহায়ণ, ১৩৩০ সাল। বুধবার শুক্লা পঞ্চমী।

চতুর্দশ অধ্যায়

ভক্তসঙ্গে শ্রীম
শ্রীরামকৃষ্ণ ও গিরিশ, শ্রীশ্রীমা ও আমজেদ
ক্রাইস্ট ও ম্যাগডেলেন

১

মর্টনের দোতলার ঘরে শ্রীম বসিয়াছেন। এখন অপরাহ্ণ তিনটা। গদাধর আশ্রম হইতে এইমাত্র আসিলেন। আবার চলিয়া যাইবেন। আজ ১৪ই ডিসেম্বর, ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দ, শুক্রবার।

অন্তেবাসী বলিতেছেন—ঠাকুর বলতেন, 'তোরা কে আর আমি কে এটা জানতে পারলেই হবে। তোদের বেশী কিছু করতে হবে না।' অর্থাৎ তিনি ঈশ্বর আর আমরা তাঁর পার্ষদ, সাঙ্গোপাঙ্গ। তিনি পিতা, আমরা তাঁর সন্তান। অতদূর বুঝতে পারলেই হল। বাকী তিনি করবেন।

কত সোজা করে দিয়েছেন, কত নেমেছেন। জানেন কিনা, কলির জীব, বেশী কিছু করতে পারবে না। একটু সাধুসঙ্গ করা দরকার। সাধুসঙ্গ আর নির্জনে একটু তপস্যা—তাঁকে ডাকবার চেষ্টা করা। তা হলেই তাঁর কৃপায় বোঝা যায় এইটি। একবার বুঝলে পরে বেশী কিছু করতে হয় না। যেমন বলতেন, নৌকোটা বেয়ে একটু মাঝ নদীতে নিয়ে যাও। তখন অনুকূল পবনে চলতে থাকবে। পাল তুলে দাও। শুধু বৈঠাটা ধরে বসে থাক। আর তামাক খাও, গান গাও আনন্দে, নৌকো আপনি চলবে। 'বৈঠে ধরে বসা' মানে, আমি তাঁর ছেলে এটা জানা। 'তামাক খাও, গান গাও' মানে, আনন্দে নিশ্চিন্ত মনে সংসারে থাক। দেখ কত সোজা করে দিয়েছেন। একটু করা দরকার।

অপরাহ্ণ প্রায় পাঁচটা। শ্রীম গদাধর আশ্রমে ফিরিতেছেন। সিটি কলেজের পাশ দিয়া বেচু চ্যাটার্জি স্ট্রীটে প্রবেশ করিলেন,

গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেনের মোড়ে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বাম হাতে রাজেন্দ্র মিত্রের বাড়ী। দাঁড়াইয়া ঐ বাড়ী দর্শন করিতেছেন, আর প্রণাম করিতেছেন। বলিলেন, এখানে ঠাকুর এসেছিলেন। কেশববাবুও সেদিন উপস্থিত ছিলেন। এ সব তীর্থ হয়ে গেছে। রাজেন্দ্রবাবু বেঙ্গল গভর্নমেণ্টের এ্যাসিস্টাণ্ট সেক্রেটারি হয়েছিলেন।

শ্রীম দুই চার পা আগাইয়া চলিলেন। একটি ভক্ত আস্তে আস্তে শ্রীমকে বলিতেছেন, কাল রাত্রে একটা স্বপ্ন দেখলাম। আমার গায়ে গেরুয়া বসন, সন্ন্যাসী হয়েছি। কিন্তু মনটার একটা অংশ দেখলাম ভয় পেয়েছে যেন। এরূপ কেন হলো—এই ভেবে কি আর সংসার ভোগ করতে পারবে না বলে? শ্রীম আহ্লাদের সহিত উত্তর করলেন, এ সব স্বপ্ন খুব ভাল। আমি সন্ন্যাসী, আমি ভক্ত—এ সব অভিমান উত্তম। মনের ঐ রকম একটু আধটু থাকে। ও-তে দোষ নেই। আমি সন্ন্যাসী, এ বেশ স্বপ্ন।

শ্রীম কালীবাড়ীর সামনে ট্রামে উঠিলেন।

২৫শে ডিসেম্বর মঙ্গলবার। আজ বড় দিন। ভগবান যীশুর জন্ম-মহোৎসব। কলিকাতা মহানগরীতে সর্বত্র হইতেছে। তাঁহার ভক্তগণ আনন্দোৎফুল্ল। বেলুড় মঠে গত রাত্রিতে 'ক্রীসমাস্ ইভ' অনুষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্তগণও এই সব উৎসবে যোগদান করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, 'আমি, ক্রাইস্ট আর গৌরাঙ্গ এক।'

শ্রীম আজ মর্টন স্কুলে আসিয়াছেন। রাত্রিতে এখানে থাকিবেন। চারতলার সিঁড়ির ঘরে বসিয়াছেন। ভক্তরা অনেকে দর্শন করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। এখন রাত্রি প্রায় নয়টা। বড় জিতেন, বিনয়, বড় অমূল্য, জগবন্ধু, বলাই প্রভৃতি বসিয়া আছেন। বলাই সম্প্রতি আসা যাওয়া করিতেছেন।

শ্রীমর আজ অন্তর্মুখীন ভাব—করুণাপূর্ণ। করুণাময় ভগবান যীশুর কথা ভাবিতেছেন। যীশু পতিতপাবন। মেরী প্রভৃতিকে পাপপঙ্ক হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন। যীশু-লীলামৃত পান ও

কীর্তন করিতে করিতে শ্রীরামকৃষ্ণলীলার উদ্দীপন হইল। শ্রীমর কণ্ঠ হইতে অমৃত-কণিকা নির্গত হইতে লাগিল।

শ্রীম (করুণ স্বরে)—মানুষের কি vision (দৃষ্টি) আছে? তিনি দেখতে পেতেন কার ভিতরে কি আছে। গিরিশবাবুকে এদিককার লোক বলতো মাতাল, বেশ্যাবাড়ী যায়। কিন্তু ঠাকুর দেখেই চিনে ফেললেন—মহৎ, ভিতরে 'মাল' আছে।

শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন, ওঁর ওখানে যখন থিয়েটারের লোক যাতায়াত করতে লাগলো তখন আমরা যাওয়া বন্ধ করলুম। Good boy (ভাল ছেলে) সাজলেন আর কি।

তিনি পতিতদের স্থান দেবেন না তো কে দেবে? তিনি আসেনই পতিতের জন্য। আবার সাধুর জন্যও। বরাবর আমরা এই কথা তাঁর মুখে শুনেছি।

চৈতন্যদেব জগাই মাধাই উদ্ধার করলেন। কেন? না, দেখাতে যে আমি পতিতের জন্যই আসি।

বড় অমূল্য—স্বামীজী এক জায়গায় লিখেছেন চিঠিতে, ভগবান পতিতদের জন্যই আসেন।

শ্রীম—স্বামীজী কি আর নূতন কথা বলেছেন? যা যুগে যুগে বলা হচ্ছে তাই বলেছেন। তবে নূতন ঢংএ বলেছেন ইংরেজীতে। দেশী ভাষায়, বাংলায়, অবতারের নামই হলো পতিতপাবন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—মার কাছে একটি ভক্ত থাকত দেশে। মুসলমান, আমজেদ তার নাম। মায়ের কাজ করতো, ঘর মেরামত, এ সব। মা মেটে ঘরে থাকতেন তো! আমজেদ ও-সব কাজ জানতো। মাকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করতো। অন্য মুসলমান হিন্দুর বাড়ী খায় না। কিন্তু আমজেদ মায়ের বাড়ীতে ঠাকুরের প্রসাদ খেতো। সকলে যে থালা গ্লাসে আহার করে, আমজেদকে তাতেই খেতে দিতেন। খাওয়া হয়ে গেলে বলতেন, 'উঠে পড় বাবা, উঠে পড়।' সে হাতমুখ ধুতে উঠে গেল। আর মা অমনি থালা গ্লাস নিয়ে মেজে ধুয়ে আনলেন। আবার ঐ কাপড়েই ঠাকুর ঘরে যাচ্ছেন—স্নানটান কিছু নেই।

দেখ কি আচরণ মায়ের! কার আছে এ দৃষ্টি? প্রথম জীবনে ডাকাত ছিল। তাই সকলে ঘৃণা করতো তাকে। কিন্তু মা দেখেছিলেন ভিতরে 'মাল' আছে। মা বলতেন, 'আমার কত ছেলে কত স্থানে রয়েছে—হিন্দু, মুসলমান, খ্রীস্টান। সকলকেই আমার দেখতে হবে, খাওয়াতে হবে, আদর করতে হবে—ছেলে যে!' আহা কি উদার দৃষ্টি! পাড়াগেঁয়ে লোক। আবার গোঁড়া বামুনের মেয়ে। লেখাপড়া নেই। কিন্তু কি বিশাল হৃদয়, কি জগৎ জুড়ে দৃষ্টি! মানুষে এ সব হয় না ভগবান ছাড়া। জগদম্বা তাই সকলের মা।

আমজেদের দেহ গেছে। একটু বাকী ছিল। মাকে দর্শন করে মুক্ত হয়ে গেল।

একবার পাঁচটি ছেলে গেল দীক্ষার জন্য। একটি ছেলে একটু অন্য রকম। তাকে বাইরে বসিয়ে রেখে দিল। ঠাকুরঘর অপবিত্র হবে সে গেলে। সে ছেলেটি বাইরে বসে কাঁদছে। মা ঘরে ঢুকে চারজনকে দেখতে পেলেন। আর একজন কোথায় জিজ্ঞেস করলেন। ওরা বললে, সে ধোপা, বাইরে রয়েছে। শুনে মা ছুটে বাইরে এলেন, 'এসো বাবা, ঘরে এসো' বলে ডেকে ভিতরে নিলেন। সে যেতে রাজী নয়। জোড়হাত করে কেঁদে বলছে—না, মা, না। মা শুনলেন না। সকলের সঙ্গে তাকেও দীক্ষা দিলেন।

এ দৃষ্টি কি সকলের আছে? মার ছিল। সকলে দেখছে ধোপা। তিনি দেখলেন ভিতরটা ভিতরে মাল আছে। মানুষের মলিন দৃষ্টি ভিতর দেখতে পায় না। এদের কর্ম বাকী ছিল। মাকে দর্শন করে উদ্ধার হয়ে গেল।

শ্রীম (সকলের প্রতি)—মেরী ছিলেন একজন খুব ভক্ত ক্রাইস্টের। খুব বড়লোকের মেয়ে। যেমন রূপ তেমনি গুণ ছিল তার। ম্যাগডালা (Magdala) নামক রাজপ্রাসাদে তার বাড়ী। পিতামাতার মৃত্যুর পর চরিত্র খারাপ হয়। শোনা যায়, এত বিলাসিনী হয়েছিল যে, কাপড় চোপড় আর অলংকার সব আসতো গ্রীস আর রোম থেকে। ম্যাগডালা প্রাসাদের ওপর থেকে একদিন দেখলে, ক্রাইস্ট

ভক্তসঙ্গে যাচ্ছেন। সেই থেকে তার পরিবর্তন আরম্ভ হলো। সে বুঝতে পারলো যেন তার সমস্ত পাপ চলে গেছে। আর তার স্থানে ক্রাইস্টের পুণ্য স্পর্শ প্রবেশ করেছে। বিলাসিতা ছেড়েছে। সামান্য স্যাক্‌ক্লথে লজ্জা নিবারণ করে। প্রাণে ব্যাকুলতা ক্রাইস্টের কাছে যাবার। সুযোগ খুঁজছিল। কি করে যায়—একে অভিমান, তাতে আবার 'সিনার' বলে লজ্জা। বেশ্যাদের ওরা 'সিনার' বলতো।

একদিন ক্রাইস্ট সাইমনের বাড়ীতে এসেছেন। খবর পেয়ে মেরী স্যাক্‌ক্লথ, মানে মোটা চট, পরে কাঁদতে কাঁদতে তাঁর দর্শনে এলো। সাইমন আপত্তি করলো। ক্রাইস্ট অন্তর্যামী, জানেন সে তাঁকে কত ভালবাসে। তাই তিনিও স্নেহ করেন। দেখা হয় নি পরস্পরের তবুও। সাইমনের আপত্তি শুনে বললেন, 'সাইমন, আমার একটা কথা শুনবে?' 'Tell Master' (বলুন গুরুদেব), সাইমন উত্তর করলেন। 'কথাটা হচ্ছে এই, একজনের কাছ থেকে এক ব্যক্তি সামান্য অর্থ ধার নিয়েছে, আর একজন নিয়েছে প্রচুর। দু'জনকেই সে ব্যক্তি মাপ করলেন। তাদের ঋণ শোধ আর করতে হবে না। এখন কে বেশী কৃতজ্ঞ হবে? 'কে বেশী ভালবাসবে মনিবকে? সাইমন তখন উত্তর করলেন, যে বেশী ধার নিয়েছে। ক্রাইস্ট উত্তর করলেন, 'এটি তুমি নিজে বোঝ।'

তারপর মেরী এসে পায়ে পড়ে 'এক ঘটী' কাঁদলো। তার চোখের জলে পা ভিজে গেছে ক্রাইস্টের। চুল দিয়ে তাই মুছে দিলেন। ক্রাইস্ট প্রসন্ন হয়ে বললেন, Woman, thy sin is forgiven (তুমি পাপমুক্ত)।

শরীর ত্যাগের পর প্রথম দর্শনই মেরী পায়। কবরের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন ক্রাইস্ট। তাঁরই নাম হয় শেষে মেরী ম্যাগডেলেন। গোপীদের মত ভগবানে প্রেম হয়েছিল তাঁর। তাঁর সম্বন্ধেই ক্রাইস্ট বলেছিলেন, 'But one thing is needful: and Mary has chosen that good part' মানুষের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ হচ্ছে ভগবানকে ভালবাসা। মেরীর সেটি হয়েছে, ভগবানে প্রেম।

এই যে পায়ে পড়ে কান্না—এ-টি কত ভালবাসা হলে হয়। যোগীরা যুগযুগান্তর তপস্যা করেন এই ভালবাসার জন্য। ভালবাসার গ্যাবা লাগলে তবে কান্না আসে। ভোগান্ত না হলে গ্যাবা লাগে না। মোহে আচ্ছন্ন করে রাখে। মোহ-মেঘ গলে তবে জল হয়।

তাই ক্রাইস্ট বলেছিলেন, 'for he maketh his sun to rise on the evil and on the good, and sendeth rain on the just and on the unjust'—পাপী, পুণ্যাত্মা সকলের উপর ভগবানের স্নেহ কৃপা সমানভাবে বর্ষিত হয়—সূর্যকিরণ ও জলবর্ষণের স্থায়।

চৈতন্যদেব জগাই মাধাইকে মাপ করলেন। তবে তো তারা বুঝলো কত কৃপা। কত বড় পাপের বোঝা নিয়ে গেছেন।

শ্রীম (বড় জিতেনের প্রতি)—ঠাকুরের ভক্তদের কি wonderful change (অদ্ভুত পরিবর্তন) দেখতে পাওয়া যায়। তার সঙ্গে অভাবনীয় পরিবর্তন ঘটেছে। কতদিন তাই এখানে সেখানে ঘুরে ঘুরে দেখছি ঠাকুরের কথা কেমন ছড়াচ্ছে।

ময়দানে বেড়াচ্ছি একদিন। ঠাকুর ধরে নিয়ে গেলেন গদাধর আশ্রমে। আশ্রমের মহন্ত ধরে নিয়েছেন, মানে ঠাকুরই নিয়েছেন। কত ভক্ত আসছে। ঠাকুরের মহিমা দিকে দিকে ছড়াচ্ছে। জগৎ ভরে যাবে তাঁর মহিমায় এর পর।

বড় জিতেন—আপনার শরীর কেমন যাচ্ছে ?

শ্রীম—ভালই। আহা, বিরিঞ্চিবাবু চলে গেলেন। তাঁর দেওয়া ঔষধ—সেই পুঁটুলি, ওপরে তাঁর হাতে লেখা অনুপান, সবই এখনও পড়ে আছে। 'তিনি চলে গেলেন।

বিরিঞ্চি কবিরাজের কয়দিন হয় শরীর ত্যাগ হইয়াছে। কুড়ি দিন পূর্বে গদাধর আশ্রমে যান শ্রীমকে দর্শন করিতে। শ্রীমর তখন সর্দি ছিল। তিনি তাঁহাকে ঔষধ দিয়া আসেন। বাড়ী ফিরিয়া হঠাৎ দেহত্যাগ করেন। ইনি বড় জিতেনের খুব বন্ধু। শ্রীমকে দর্শন করিতে প্রায়ই আসিতেন।

শ্রীম (বড় জিতেনের প্রতি)—আপনারা ঐটি বড় দোষ করেন। পূজোর সময় দেশে যান্ আর ম্যালেরিয়া নিয়ে ফেরেন। শুনেছি, টাকা দিলে বামুনরা পাঁতি লিখে দেয়। পূজো উঠিয়ে কলকাতায় নিয়ে আসুন। নিত্যপূজা থাকে তা দেশে হোক। ঐ সময় বড্ড ম্যালেরিয়া পাড়াগাঁয়ে। টাকা দিলেই হয়ে যাবে, পাঁতি দেবে। ওখানে গিয়ে শরীরটা কেন দেওয়া! যার resist (প্রতিরোধ) করবার ক্ষমতা আছে সেই বেঁচে যায়।

ঠাকুর বলতেন, সোনা গালান না হওয়া পর্যন্ত এর যত্ন নিতে হয়। এতেই সোনা গালাতে হবে কিনা, এই শরীরে। 'সোনা গালান' মানে ভগবান দর্শন। তার জন্য দেহের যত্ন নেওয়া। সোনা গালান হয়ে গেলে স্যাকরারা মাটির ছাঁচটা ফেলে দেয়। তখন আর দরকার নাই। ভগবান দর্শন হয় কেবল মানুষ শরীরে।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—সারা জগতে খ্রীস্টান ভক্তরা ভগবানকে নিয়ে আনন্দ করছে। অন্য সময় ভুলে যায়। উৎসবে মনে পড়ে। তাই এ উৎসবের ব্যবস্থা। ও সব ব্যবস্থা ভগবানেরই করা। মানুষ করে নি কিছু। তিনিই বন্ধ করেন আবার তিনি ওঠান। তিনিই ফেলে দেন—পতিত করেন, আবার তিনিই কোলে তোলেন। তাঁর এ লীলা চলছে অনন্তকাল!

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—ঠাকুর বলতেন, গোষ্ঠ বড় মুস্কিলে পড়েছে। রসিক পুরুষ ছিলেন কিনা তিনি, তাই ঐ রকম করে put (বর্ণনা) করতেন। বৃন্দাবনে গিয়ে 'বৃকোদ' ভেক নিয়েছে। সকলে বলছে, আর ঘরে যেতে পারবে না। সে বললে, ওমা, সেকি কথা! একমাস ঘুরে ঘুরে এক ব্যবস্থা পেল। কে একজন বললে, দেড়শ' টাকা আর এক কাহন কড়ি হলে হয়। অনেক কষ্টে তা যোগাড় করে প্রায়শ্চিত্ত করলে। তারপর ঘরে ফিরে এলো। টাকা পেলেই বামুনেরা ব্যবস্থা দেয়, শুনেছি। (বড় অমূল্যকে দেখাইয়া) এঁর একটি মেয়ে বছর দেড়েকের, প্লীহাজ্বর সব।

বড় জিতেন (অমূল্যকে)—পূজোর সময় বিয়েতে গিছলে বুঝি?

অমূল্য—না।

বড় জিতেন—অমনি কি দিতে হয় ঐ সময় যেতে ?

অমূল্য—কি করি, ওদের অত জেদ।

শ্রীম—ওদের জেদ কি শুনতে হয় সব সময় ? এমন সময় শুনতে নেই, জেদ করলেই শুনতে হবে ?

৩

শ্রীম কি ভাবিতেছেন। পুনরায় কথা।

শ্রীম (সকলের প্রতি)—মার কাছে যেতেন একটি ভক্ত ডাক্তার। বাড়ীতে তুই তিন বছরের একটি মেয়ে আছে, আর স্ত্রী আর মা। জমির ধান আছে। ভাতের অভাব নেই। একদিন মার কাছে গিয়ে বললে, 'আমার সংসার ভাল লাগে না।' মা বললেন, আচ্ছা, তু'দিন সবুর কর। এরই মধ্যে মা-ঠাকরুনের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে ডাক্তার স্থির করে ফেলেছে সংসারে থাকবে না। তু'তিন দিন পর, স্নান করে এলে, মা তাকে ডেকে এনে সন্ন্যাস দিলেন। দীক্ষা আগেই হয়েছিল।

দিনকতক আছে। খবর পেয়ে ডাক্তারের মা ও স্ত্রী মেয়েকে নিয়ে হাজির। সকলেই পূর্ব থেকেই প্রস্তুত ছিলেন। স্ত্রী যখন বললে, আমাদের কি হবে ? মা উত্তর করলেন, 'কেন, তোমাদের খাওয়াপরার তো কোন কষ্ট নেই ? ওর কাজ ও করছে, তোমাদের কাজ তোমরা কর।' স্ত্রী তার সব অলঙ্কার দিয়ে দিতে চাইলেন মা-ঠাকরুনের কাছে। মা বাধা দিয়ে বললেন, 'তা কেন হবে ? তোমাদের ভাবে তোমরা থাক, তার ভাবে সে থাকুক'।

আহা, এমন কথা স্ত্রী হয়ে বলা। ঠাকুরের সঙ্গিনী ছাড়া আর কে বলতে পারে ? বিয়ের কথায় বলতেন, 'কি করে বলি আমি তোমাদের আগুনে ঢুকতে ?' সংসার জ্বলন্ত অনল। ছেলেপুলে হবে, তাদের খাওয়াপরা যোগান। হয়তো সেই ছেলে অবাধ্য হয়ে গেল। মেয়ের বিয়ে দিলেও রেহাই নেই। শ্বশুরবাড়ীর কথা ভাবতে

হবে। এই সব সংসার ছাড়তে কে বলতে পারে—মা ছাড়া?

তারপর, ডাক্তারের বাড়ীর কাছে একটি আশ্রম ছিল, ঠাকুরের নামে। সেটি নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। মা তাকে পাঠিয়ে দিলেন ওখানে। মা ওর ভিতর জানেন কি না—বীর ভক্ত। তাকে পাঠিয়ে দিলেন ওখানে। ডাক্তারের মা মাঝে মাঝে দেখা করতে আসেন, কখনও স্ত্রীও সঙ্গে আসেন।

আশ্রমটি খাড়া হয়ে পড়লো। ঐ ভক্তটি ডাক্তারি আরম্ভ করে দিল। আট টাকা ফি তার। গরীব হলে অমনি। ধনী হলে বলে, 'না, এত টাকা না দিলে যাব না।' সাত আটটি ছেলে ওখানে থেকে পড়াশোনা করছে। বেলুড় মঠের সাধুরাও চার পাঁচজন থাকেন। মাসে খরচা তিনশ' টাকা।

শ্রীম—(স্বগত) মা-ঠাকরুন স্ত্রীকে বললেন, তোমাদের অভাব কি? খাওয়াপরার তো কষ্ট নেই। তার যোগাড় যখন তিনি করে দিয়েছেন, আর ওঁর যখন সৎবুদ্ধি এসেছে তখন তাঁকে ডাকুক না একটু। আহা, বীর বাণী।

জনৈক ভক্ত—সন্ন্যাসী হয়ে টাকা রোজগার করা এটা কেমন?

শ্রীম—ও পারে আশ্রমের জন্য। অনেক থাক করেছেন তিনি। অর্জুনকে বললেন যুদ্ধ করতে, আবার উদ্ধবকে বললেন, বদরিকাশ্রমে যেতে। যার যা ধাতে সয় নিষ্কাম ভাবে করলে ফল এক।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—যদি বল, এরূপভাবে স্ত্রীকে ত্যাগ করা নিষ্ঠুরতা। তার উত্তর—কেন, স্ত্রীর সঙ্গে গা ঠেকিয়ে না শুলে ভালবাসা হয় না! তোমার মতে তুমি থাক। ঈশ্বরচিন্তা করে সে ধন্য হয়ে যাবে। স্ত্রীর সঙ্গে আড়ি করে নয়। তাকে ভালবেসে ঈশ্বরের কাজে লাগাতে হয়।

যতদিন দেহ থাকে ততদিন স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া। মরলে ঝগড়া করে? এর ভিতরই তুমি-শালার একদিন হয়ে গেল। তখন একটু কাঁদলে লোক দেখান। আবার খাবে এক থালা। (সহাস্যে) 'সাঁজসকালে ভাতার মলো কাঁদবো কত রাত।' এই তো স্ত্রী।

শ্রীম (যুবকের প্রতি)—লোকের কি বিশ্বাস হয় শীঘ্র? এত সব দেখেও মোহে ডুবে আছে।

"Life is not a joke as long as death is not extinguished" : অমৃতত্ব লাভ, ভগবানের দর্শন যতদিন না হয় সেই চেষ্টা আগে। তারপর অন্য সব।

রাত্রি দশটা। ভক্তরা বিদায় লইলেন।

শ্রীম চারতলার ঘরে বিছানায় বসা। একটি ভক্ত-শিক্ষক কাছে দাঁড়াইয়া আছেন। শ্রীম তাঁহার সহিত স্কুলের আলোচনা করিতেছেন। একটি ছাত্রের সম্বন্ধে কথা হইতেছে। দশম শ্রেণীর উৎকৃষ্ট ছাত্র প্রণবপ্রকাশ সেন। সে আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া একটি পদক উপহার পাইয়াছে। আবৃত্তির বিষয় ছিল, স্বামী বিবেকানন্দের লিখিত 'বীর বাণী'। 'সাহিত্য পরিষদ' কেন্দ্র ছিল। এই শিক্ষকের চেষ্টায় এটি তৈরী হয়।

মঠের অনেক সাধু ভক্ত উপস্থিত ছিলেন। প্রণবের শান্ত ও সরল ব্যবহার ও সুমধুর আবৃত্তি শুনিয়া সকলে মুগ্ধ হন। তাহার 'সন্ন্যাসীর গীতি' এত সুন্দর হয় যে, স্বামী ধীরানন্দ নিজের গলার ফুলের মালা প্রণবের গলায় পরাইয়া দেন। জ্ঞান মহারাজও খুব আশীর্বাদ করেন। শ্রীম এই সব কথা শুনিয়া বলিলেন, আমার সঙ্গে দেখা করতে বলবেন তো প্রণবকে। শিক্ষক বলিলেন, পূর্বেই বলেছি। দেখা করতে কাল এসেও ছিল। শ্রীম উত্তর করিলেন, কাল এখানে ছিলাম না আমরা। নিশ্চয় দেখা করতে বলবেন। ঠাকুর বলতেন, যার ওপর সাধুরা প্রসন্ন তার ভিতরে সোনা আছে। সামান্য একটু মাটি চাপা। এটা সরিয়ে দিলেই সোনা বেরিয়ে পড়ে। 'সোনা' মানে, ভগবানে ভক্তি-বিশ্বাস। শিক্ষক বলিলেন, সব সাধুদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছি। এবার মঠে নিয়ে যাব। সেও যেতে চাইছে। শ্রীম বলিলেন, হাঁ, মঠে নিয়ে যাবেন তাহলে পূর্ব সংস্কার জাগ্রত হবে। এখানেও নিয়ে আসবেন।

শ্রীম একটি ভক্তের হাতে দশটি পয়সা দিলেন। বলিলেন, আপনি kindly (দয়া করে) ছ' পয়সার পাঞ্জাবী রুটি তিন খানা, আর চার পয়সার মিষ্টি নিয়ে আসুন। নববিধান ব্রাহ্মসমাজের সামনে থেকে আনবেন। তরকারিও দেবে। জলখাবারের মত হবে। এ খুব ভাল। আমরা পূর্বেও খেতাম। (ভক্তের প্রতি) বলুন তো কোন্ দোকান থেকে আনবেন? ভক্ত বলিলেন, ছোট জিতেন যেখানে খান? শ্রীম উত্তর করিলেন, হাঁ ঐ দোকান।

ভক্ত রুটি লইয়া ফিরিতেছেন। তিনি ভাবিতেছেন, কি আশ্চর্য! নিজের বাড়ীঘর, নিজের স্ত্রীপুত্রাদি সব রয়েছে কিন্তু তাদের কষ্ট দেবেন না। অসময়ে আজ এসেছেন গদাধর আশ্রম থেকে, তাই নিজে কষ্ট করে দোকানের খাবার খাচ্ছেন। কারও সেবা নেবেন না। সত্তর বছর পার হয়ে গেছে, দাঁত নাই। তবুও দোকানের এই শক্ত রুটি আহার করবেন। ইনি বুঝি পান্থশালার পথিকের মত আছেন সংসারে। ইহাই কি বড়লোকের বাড়ীর দাসীর মত, সংসারে থাকা! কিংবা 'হাতে তেল মেখে কাঁঠাল ভাঙ্গা'।

৪

ব্রাহ্মসমাজে মাঘোৎসব চলিতেছে। নববিধান ও সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজ শ্রীমর বাসস্থানের নিকট। তিনি সর্বদা যাতায়াত করেন। আদি সমাজ চিৎপুরে। সেখানেও কখন ভক্তসঙ্গে গমন করেন। আজও বেলা নয়টার সময় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে গিয়াছিলেন, সঙ্গে অন্তেবাসী। আজ ২৫শে জানুয়ারি ১৯২৪ খ্রীঃ, ১১ই মাঘ শুক্রবার।

ব্রাহ্মসমাজে যাইবার পূর্বে সকাল সাড়ে সাতটার সময় শ্রীম একটি শিক্ষক ভক্তের সঙ্গে কথা কহিতেছিলেন নিজের ঘরে। কথাপ্রসঙ্গে কথামৃতের ইংরাজী অনুবাদের কথা উঠিল।

শিক্ষক ভক্ত (শ্রীমর প্রতি)—আমার ইচ্ছা হয় কথামৃতের ইংরেজী অনুবাদ করি। পরে আপনি দেখে দেবেন। দেশবিদেশের অনেক সাধু ও ভক্ত আমাদের অনুরোধ করেছেন।

শ্রীম—অনুবাদ তো স্কুলের ছেলেরাও করে। থার্ড ক্লাসের ছেলেও করতে পারে। করলেই তো হোলো না। ভাবটা যাতে থাকে সেটা দেখতে হবে। শুধু কথার অনুবাদ করলে হবে না। সাহেবরা আদপেই বোঝে না বাংলা ভাষা। ছেলেরা করলে তবুও অনেকটা বুঝবে। আমাদের ইচ্ছা যাতে সোজা করা যায়, আর ভাবটি থাকে। ভাব ছেড়ে ভাষার অনুবাদ করা উচিত নয়।

বেদান্ত-কেশরীতে দু'বার বের করেছিল অনুবাদ। ওদের উচিত ছিল আমাদের consult (জিজ্ঞাসা) করা। বোঝে না তো ওরা, কি রকম হলে লোকে পড়তে চায়! আমরা তাই শিবানন্দ স্বামীকে চিঠি দিলুম। উনি আবার ঐ চিঠি ওখানে forward (প্রেরণ) করেছিলেন। কাগজে আর বের করে নি। কিন্তু ভেতরে ভেতরে বই ছাপিয়ে দিলে।

শিক্ষক—একটা আইন আছে লেখক দশ বছরের ভেতর অনুবাদ না করলে অপরে করতে পারে।

শ্রীম—না। আইনের কথা নয়। খুব আপনা-আপনির ভিতর কি না, তাই ঐ রকম করেছে। কিন্তু তারা বোঝেন না যে কি রকম করা উচিত।

এই বলিয়া দ্বিতীয় ভাগ খুলিয়া তাহার কয়েকটা দোষ দেখাইলেন। দুই একটা স্থান দেখাইয়া বলিলেন, এখানে এই লিখেছে অনুবাদে। হওয়া উচিত ছিল এই। আমরা সর্বদা চেষ্টা করেছি যাতে সোজা হয়—যাতে সেভেন্থ ক্লাসের ছেলেও বুঝতে পারে। অনেক স্থানে একটা wordএর (শব্দের) বদলে একটা sentence (বাক্য) দিয়েছি।

এই বইখানা (Gospel part I) সানফ্রানসিস্‌কোতে ছাপান হয়েছিল। ত্রিগুণাতীত বার করেছিলেন। এটার সম্পূর্ণ অনুবাদ আমরা করেছি। মা শক্তি দিয়েছিলেন, তাই হলো। আবার শক্তি দিলে বাকীগুলিও হবে।

আমরা বরাবর ঐ করেছি, ভাবটা দিতে চেষ্টা করেছি, যেমন শুনেছিলাম। ঠাকুর কথা বলার সময় একটা ভাব প্রকাশ করতেন

—জীবন্ত ভাব। আমরা সেটা যথাশক্তি দিতে চেষ্টা করেছি—শব্দ যথাসম্ভব রক্ষা করে। ভাবটার **primary importance** (প্রাথমিক প্রাধান্য) দেওয়া হয়েছে। শব্দ বা ভাষা তারপর। আর সোজা কথায় প্রকাশের চেষ্টা হয়েছে। কি উদ্দেশ্যে বলেছেন, সেটার উপর লক্ষ্য না রাখলে অর্থ অন্য রকম হয়ে যায়।

সন্ধ্যার অল্প বাকী। শ্রীম জগবন্ধুকে নববিধান ব্রাহ্মসমাজে পাঠাইয়া দিলেন। সঙ্গে সদানন্দও গেলেন। মাঘোৎসব চলিতেছে। সন্ধ্যারতি দর্শন করিয়া ভক্তরা শ্রীমকে তাহার বিবরণ বলিতেছেন। ব্রাহ্ম ভক্তগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আলোকদানীতে মোমবাতি জ্বালাইয়া আরতি করিয়াছেন—মা, মা নাম করিতে করিতে। অতি মনোমুগ্ধকর দৃশ্য।

রাত্রি আটটা। শ্রীম চারতলার আপন ঘরে বসিয়া আছেন পশ্চিমাস্য। কাছেই সম্মুখে বসা বিনয়, ছোট অমূল্য, জগবন্ধু ও হাবড়ার চাষাধোপা পাড়ার সুধীর। শ্রীম উপনিষদের প্রার্থনা আবৃত্তি করিতেছেন গুরুগম্ভীর ধ্বনিতে। 'অসতো মা সদগময়। তমসো মা জ্যোতির্গময়। মৃত্যোর্মা অমৃতং গময়। রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যং॥'

একটু পর শ্রীম নববিধান ব্রাহ্মমন্দিরে দাঁড়াইয়া উত্তর পশ্চিম দরজার নিকট ব্রাহ্ম ভক্তদের দর্শন করিতেছেন। নানা রংয়ের বিজলীর আলোকে গৃহ আলোকিত। আচার্য বেদীতে বসিয়া প্রার্থনা করিতেছেন, 'মা, আমাদের মনোবাসনা পূর্ণ কর।

এইবার শ্রীম মেছুয়াবাজার স্ট্রীট দিয়া চলিতেছেন। সঙ্গে জগবন্ধু, বিনয়, ছোট অমূল্য ও বড় সুধীর। ঝামাপুকুর লেনে প্রবেশ করিয়া ডান হাতে রাজা দিগম্বর মিত্রের প্রাসাদ দেখাইয়া ভক্তদের বলিলেন, এই বাড়ীতে ঠাকুর প্রথম প্রথম পূজো করতেন। আরো কিছু অগ্রসর হইয়া ডান হাতের ২৭নং বাড়ী দেখাইয়া বলিলেন, এখানেও এসেছিলেন ঠাকুর, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীকে দেখতে। এটা ছোট দোতলা বাড়ী। গোস্বামী মহাশয় কিছুকাল এখানে ছিলেন। আরও আগাইয়া বেচু চাটার্জীর স্ট্রীটে আসিয়া পড়িলেন। ঠিক বিপরীত

দিকে একটি মুড়িমুড়কির দোকান। উহা দেখাইয়া বলিলেন, এখানেও এসেছিলেন। এই স্থানেই সংস্কৃত পাঠশালা ছিল ঠাকুরের বড় ভাই রামকুমারের, এইরূপ শোনা যায়। (বেচু চাটার্জীর স্ট্রীট দেখাইয়া) আর এই রাস্তায় ঠাকুর সর্বদা চলতেন। নিত্য ঠনঠনে মা কালীর কাছে যেতেন। মাকে ভজন শোনাতেন। এ সব স্থানের প্রতি ধূলিকণা পবিত্র তাঁর পাদস্পর্শে। আরো আগাইয়া গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর মোড়ে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বাঁ হাতের বাড়ীটি দেখাইয়া বলিলেন, এটি রাজেন্দ্র মিত্রের গৃহ। এখানেও সর্বদা আসতেন। কেশব সেন মশায়ও এখানে আসতেন, ঠাকুরকে দর্শন করতে।

শঙ্কর ঘোষের গলি দিয়া কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট পার হইতেছেন। অগ্রে জগবন্ধু যাইতেছেন, পিছনে শ্রীম। সম্মুখেই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ। এখানেও উৎসব। মন্দিরগাত্রে নানা রংএর আলো। পূর্ব বারান্দায় একটি বেঞ্চিতে বসিয়া শ্রীম মন্দিরের ভিতর দর্শন করিতেছেন। গৃহ পূর্ণ। ভিড়ের জন্য ভিতরে প্রবেশ করেন নাই। পনর মিনিট থাকার পর পুনরায় রাস্তা পার হইলেন। এই স্থানে আশুতোষ ব্যানার্জীর সঙ্গে দেখা হইল। ইনিই 'কথামৃতে'র 'আগড়পাড়ার ছেলেটি।' ঠাকুরের কৃপাপ্রাপ্ত ভক্ত। এখন বৃদ্ধ। মাঝে মাঝে শ্রীমকে দর্শন করিতে আসেন। শঙ্কর ঘোষের গলি দিয়া শ্রীম আশুবাবুর সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে চলিলেন। শ্রীম ঠাকুরবাড়ীতে গেলেন। বিনয় আর জগবন্ধুর সঙ্গে আশুবাবুকে নিজ গৃহে পাঠাইলেন। আমহার্স্ট স্ট্রীট দিয়া চলিতেছেন সকলে, সুকিয়া স্ট্রীটের দিকে। রাস্তায় আশুবাবু ঠাকুরের সহিত প্রথম ও দ্বিতীয় মিলনের সংবাদ বলিতেছেন। বলিলেন, দ্বিতীয় দর্শনে ঠাকুরের সমাধি দেখেই মুগ্ধ হই। কি এক আকর্ষণ মনকে টেনে জোর করে নিয়ে গেল তাঁর দিকে। চেষ্টা-টেষ্টা করে যাইনি। ভূতে পেলে যেমন হয় তেমনি হয়েছিল। ঐ দর্শনেই মনপ্রাণ অপার আনন্দে পূর্ণ হয়ে গেল। তদবধি ঐ চরণে মনপ্রাণ বিকিয়ে গেল।

রাত্রি সাড়ে নয়টা। মর্টন স্কুলে শ্রীম বসিয়া আছেন, দোতলায়

বসিবার ঘরের মেঝেতে। কাছেই বসিয়াছেন বড় জিতেন, ছোট জিতেন, সুখেন্দু, ছোট অমূল্য, ডাক্তার, ছোট নলিনী ও রমণী। জগবন্ধু ও বিনয় আশুবাবুকে গৃহে পৌঁছাইয়া ফিরিয়াছেন।

বড় জিতেন (শ্রীমর প্রতি)—ভগবানকে মানুষ এত করে ডাকে, অত উৎসব, ব্রত উপবাস করে, তবুও কেন লোকের শান্তি হয় না?

শ্রীম—ব্যাকুলতা নাই তাই, ঠাকুর বলেছিলেন। ডাকতে হয় তাই ডাকা। অল্প আনন্দ অল্প শান্তি হয় তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু স্থায়ী হয় না। ঠাকুর বলেছিলেন, 'আন্তরিক যারা তাঁকে ডাকবে তাদের এখানে আসতেই হবে। আর যারা এখানে আসবে, মা তাদের মনোবাসনা পূর্ণ করবেন।'

বলেছিলেন, 'আমার চিন্তা যে করবে সে আমার ঐশ্বর্য লাভ করবে—যেমন পিতার ঐশ্বর্য পুত্র লাভ করে।' পিতার ঐশ্বর্যে ছেলের right (অধিকার) আছে। তাই সে তা পায়। আন্তরিক ডাকলে তবে শান্তি লাভ হয়। ক্রমে ক্রমে আন্তরিক হয় অভ্যাসকে ধরে থাকলে।

যদি বল, ভগবানকে ডাকলেও কেন দুঃখকষ্ট হয়? তার উত্তর এগুলি লোকের চৈতন্য করিয়ে দেয়। তখন আন্তরিক ডাকে। ব্রাহ্ম সমাজেও আজ শুনে এলাম, এগুলি মানুষকে হুঁশিয়ার করে। তাহলে এগুলিকে কি করে খারাপ বলা যায়? তার সবই ভাল। Retrospective way-তে (পেছন ফিরে চেয়ে) দেখছি এখন, সব ভাল। অশান্তি না হলে কি করে শান্তির চেষ্টা হবে? তবে তো লাভ হবে শান্তি। সত্যিকার শান্তি তাঁ'তে। তিনি নিজে শান্তিস্বরূপ। এই শান্তিস্বরূপের আশ্রয় নিয়েছিলেন সনকাদি ঋষিগণ, সব ছেড়ে দিয়ে তবে শান্ত হয়েছিলেন।

ভক্ত হলেই দুঃখ হবে না, তা-ও নয়। ভক্তদেরও দুঃখ হয়। পাণ্ডবদের দেখ না। দুঃখযন্ত্রণা সর্বদা লেগে আছে।

আমার নিজের বিষয়েও দেখেছি, দুঃখ কষ্টে আমার ভালই করেছে। একদিন যাকে মনে করেছিলাম মহা বিপদ, সেইটেই

হলো মহা সম্পদ। তখন বাপ ভাই সব এক সঙ্গে রয়েছি। কিছু দিন আগে মা গত হয়েছেন। সে অবস্থায় যা হয় তাই হলো। পরিবারে ঝগড়াঝাঁটি লেগে গেল। শান্তি নেই। মনে নিদারুণ কষ্ট। আর সহ্য হল না। একদিন রাত্রি দশটা এগারটার সময় বের হয়ে পড়লাম ঘর ছেড়ে। সেদিন আবার অমাবস্যা রাত। সঙ্গে ওরাও (স্ত্রী) চললো। রাস্তায় ঘোড়ার গাড়ী করা হলো। ওমা, অন্ধকার রাতে গাড়ীর চাকা গেল ভেঙ্গে শ্যামবাজারের মোড়ের কাছে। মহা বিপদ—কি করা যায়? পাশেই এক বন্ধুর বাড়ীতে ওঠা গেল। বন্ধু হয়তো ভাবলে অত রাতে কি আপদ! তাই cold reception (অনাদরের সহিত অভ্যর্থনা) হলো। অনেক কষ্টে আর একখানা গাড়ী যোগাড় হলো রাত বারটায়। তারপর বরানগর বড় বোনের বাড়ীতে গিয়ে ওঠা গেল। মনের অবস্থা তখন ভয়ঙ্কর—suicide-ই (আত্মহত্যাই) একমাত্র বন্ধু। এই ভয়ঙ্কর মনোভাব নিয়ে এ বাগান সে বাগান বেড়াতে বেড়াতে তাঁর দর্শন হলো পরের দিন। দেখ, কোথায় আত্মহত্যা আর কোথায় আত্মলাভ। এই ভয়ঙ্কর বিপদ লাভ করলো অতুল সম্পদ—ভগবানকে। সাত দিন পর যাঁরা যন্ত্রণা দিছলেন, তাঁরাই গিয়ে নিয়ে এলেন আদর করে। আমাদেরই দোষ হয়েছে—এই বলে। দেখুন না, এই যে বাড়ীতে episode-টি (ঘটনাটি) হলো, তাঁর দর্শন হবে বলে তো। আমি তো তাই বুঝেছি।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন সকলে। পুনরায় কথা হইতেছে। এইবার সংযমের সম্বন্ধে। অনেকে চেষ্টা করিয়াও সংযম রক্ষা করিতে পারে না, তাহাদের কি হইবে?

ডাক্তার—ঠাকুর বলেছেন, তাঁকে পেতে হলে বীর্যধারণ করতে হয়। তা হচ্ছে কই? কারো কারো বেশ চেষ্টা করে দাঁড়িয়ে গেছে। কিন্তু অন্যদের এটাই সব চাইতে বড় বিপদ। উপায় কি?

শ্রীম—তাঁকে কেঁদে কেঁদে বলা। এ সব আর কথা কি! তিনি সব ঠিক করে দিতে পারেন। যত বিপদ তত সম্পদ। চেষ্টা করা,

আর তাঁকে বলা। ঠাকুরের কৃপায় ভক্তরা এ বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়েছেন।

শ্রীম (ছোট জিতেনের প্রতি)—ধর্মযুদ্ধ করতে গিয়ে কোন কোন নাইট স্ত্রীলোকের পাল্লায় পড়ে গেলেন—যেমন ল্যান্সলট (Lancelot) চেষ্টা করে আবার সামলে গেল। কেউ কেউ আদপেই পড়েনি।

জগবন্ধু—যেমন, বেডিবিয়ার (Bold Sir Bedivere).

শ্রীম—হাঁ, সার বেডিবিয়ার। যারা পড়েনি তারাই একেবারে 'হোলি গ্রেইল' (Holy Grail) নিলে। যুদ্ধক্ষেত্রেও স্ত্রীলোকের কাছে পড়ে যায় আবার সামলে নেয়।

মর্টন স্কুল, কলিকাতা। ২৫শে জানুয়ারী ১৯২৪ খ্রীঃ
১১ই মাঘ ১৩৩০ সাল, শুক্রবার রাত্রি সাড়ে দশটা

পঞ্চদশ অধ্যায়

নববিধান ব্রাহ্মসমাজে শ্রীম

১

শ্রীম স্কুলের অফিসে দোতলায় সারাদিন বসা। তিনটার সময় তিনতলায় উঠিলেন। কয়েকজন ভক্ত শ্রীমর অপেক্ষায় আছেন—ভবানীপুরের যতীনবাবু, সদানন্দ, জগবন্ধু, 'ক্রকবণ্ড' (যতীন), গদাধর প্রভৃতি। একটু পরে বড় জিতেন আসিলেন। এখন পৌনে পাঁচটা। কাঁকুড়গাছি বাগানের কথা হইতেছে। আজ ২৬শে জানুয়ারি, ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দ। ১২ই মাঘ, ১৩৩০ সাল।

শ্রীম (যতীনবাবুর প্রতি)—ঐটি মহাতীর্থ। ওখানেই তো প্রথম অস্থি স্থাপন করেন স্বামীজী। মাথায় করে ঘটটি বয়ে নিয়ে যান। তা ছাড়া ঐ বাগানে একবার ঠাকুর গিছলেন। এখন যেখানে তুলসীকুঞ্জ মন্দিরের দক্ষিণে, সেখানে বসেছিলেন। ঘরেও বসেছিলেন।

জগবন্ধু—অস্থি কি প্রথমেই ওখানে নেওয়া হয় ?

শ্রীম—না। প্রথম শ্মশান থেকে কাশীপুর বাগানে যায়, তারপর বলরামবাবুর বাড়ীতে। সেখান থেকে দু'ভাগ হয়। শশী আর নিরঞ্জন একভাগ গোপনে রেখে দেন, এটি এখন মঠে। বাকীটা ঐ বাগানে। সেখানেই সমাহিত করা হয়।

ভবানীপুরের যতীনবাবু—কেউ কেউ বলে, ললিত মহারাজের মাথা খারাপ হয়ে গেছে। এ কথা কি সত্যি ?

শ্রীম—ঐ রকম হয় ঈশ্বরচিন্তা করলে। লোকে তাকেই পাগল বলে, কিন্তু ঠাকুরই তো ঐ রাস্তা দেখিয়ে গেছেন। ঠাকুরকেও পাগল বলতো লোকে। বাবুরাম মহারাজ, রাখাল মহারাজ, হরি মহারাজ, এঁদের এরূপ ভাব হতো। তারক মহারাজের হতো যখন নিত্য-গোপালের সঙ্গে থাকতেন। রামবাবু, নিত্যগোপাল আর তারক মহারাজ এঁরা এক সঙ্গে যেতেন ঠাকুরের কাছে। রামবাবুর বাড়ীতেই তিনজনে থাকতেন। এইটিন এইটিটু থেকে এইটিসিক্স (1882—1886) পর্যন্ত যাওয়া আসা করতেন চার বছর। এইটিসিক্সে কাশীপুরের বাগানে একেবারে রয়ে গেলেন তারক মহারাজ।

ঠাকুর একবার নন্দনবাগানে গেছেন। সেখানে জানকী ঘোষালের সঙ্গে দেখা হয়। কথা হচ্ছে, তখন জানকীবাবু patronising wayতে (মুরুব্বীর মত) বললেন, ওসব কিছু নয়, ভাবটাব (হাস্য)। Matter of fact man (সংসারী লোক) কিনা। কিন্তু ঠাকুর শুনে protest (আপত্তি) করলেন।

এরূপ হওয়া তো আশ্চর্য কিছু নয়। ব্যাকুল হলেই nerve excited (নাড়ী চঞ্চল) হয়ে যায়। অন্য কারণে হলে অন্য রকম হয়। বিষয়চিন্তা করে উন্মাদ, আর ঈশ্বরচিন্তা করে উন্মাদ, আলাদা জিনিস।

শ্রীম (যতীনের প্রতি)—আপনাদের এঁদের দর্শন হয়েছে কি ? মা, রাখাল মহারাজ, রামবাবু ?

যতীনবাবু—কাশীতে হরি মহারাজকে দর্শন করেছিলাম।

শ্রীম—তা হলেই হল। দর্শনটি মনে থাকে। আমাদের শুধু

'সিন্'-টি দেখতে ইচ্ছা হয়। ব্রাহ্মসমাজে যাই এইজন্য। কথা মনে থাকে না। আর অত কথা মনে থাকে কি করে ? 'সিন্'-টি মনে থাকে।

অন্য লোক ঠাকুরের ভাবাবস্থাকে পাগলামি বলতো। ব্রাহ্ম-সমাজের কেউ কেউ বলতো মৃগী। ব্রাহ্মণী এসে বললেন, 'না, এ মহাভাবের অবস্থা। চৈতন্যদেবের অমন হতো। তারপর বৈষ্ণবচরণ এসে তা corroborate (সমর্থন) করলেন।

জগবন্ধু—ইংলিশম্যানরা সব যেতেন ঠাকুরের কাছে। তাদের শীগ্‌গির এ সব বিশ্বাস হয় না।

শ্রীম (সহাস্যে)—সবই ইংলিশম্যান এবারকার লীলায়। এইটি একটি বৈশিষ্ট্য। এখনও যারা আসছে প্রায় সবই ঐ। ইংলিশম্যানরা বিচার করে কিনা (হাস্য)। যারা বিচার করে তাদের এই সব হয় না, ভাবটাব। ভিন্ন ভিন্ন থাকের লোক আছে। সি. আর. দাশ মঠে দরিদ্রনারায়ণদের সঙ্গে বসে খেতেন। অন্তেবাসী (জনান্তিকে বড় জিতেনের প্রতি)—আজ এঁর বিশ্রাম হয়নি, সারাদিন আফিসে ছিলেন।

এই কথা শুনিয়া ভক্তগণ দোতলার ঘরে নামিয়া গেলেন। শ্রীম কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিতেছেন।

আজ শনিবার। দোতলার ঘরে বহু ভক্ত একত্রিত হইয়াছেন। ভাটপাড়ার ললিত, ভোলানাথ, বসন্ত ও তাহার বন্ধু আসিয়াছেন। ইঁহারা শনিবারে আসেন—আফিসের ফেরত। তাই ভক্তরা আনন্দ করিয়া ইঁহাদের শনিবারের ভক্ত বলিয়া থাকেন। বড় অমূল্য, ছোট জিতেন, বড় জিতেন, ছোট অমূল্য, সুখেন্দু, তাহার বন্ধু রমণী, 'ক্রকবণ্ড' (যতীন) ডাক্তার, বিনয়, ছোট ললিত (উকিল), অমৃত, জগবন্ধু প্রভৃতি আসিয়াছেন।

ছয়টার সময় শ্রীম দোতলার ঘরে আসিয়াছেন। এখন সন্ধ্যা। মেঝেতে পূর্বাস্য হইয়া কিছুক্ষণ ধ্যান করিতেছেন। ভক্তরাও ধ্যান করিতেছেন। ইতিমধ্যেই বিপিন সেন আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীম তাঁহাকে পরম স্নেহে পাশে বসাইয়া কুশল প্রশ্ন করিতেছেন। তারপর ভক্তদের সঙ্গে পরিচয় করাইতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—ইনি অধর সেনের বংশের লোক। তাঁর ভাইপো। এঁর বয়স তখন দশ এগার বছর। ঠাকুরকে দর্শন করেছিলেন। তাঁদের বাড়ীতে যেতেন কিনা।

বড় জিতেন—তাহলে আমাদের আত্মীয় লোক।

শ্রীম—আত্মীয়, তা আবার নয়—পরমাত্মীয়!

ভক্ত কি কম গা? নৃসিংহ অবতারের গর্জনে আকাশপাতাল বিদীর্ণ হচ্ছে। দেবতা গন্ধর্ব সব অস্থির। সকলে ভাবলো পৃথিবী রসাতলে যায়। তখন দেবতারা বসে resolution pass (প্রস্তাব গ্রহণ) করলেন—ভক্ত প্রহ্লাদকে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেওয়া যাক্। যেই প্রহ্লাদ গেলেন—কোথায় গর্জন! সব বন্ধ হয়ে গেল। সস্নেহে জিভ্ দিয়ে গা চাটতে লাগলেন ভগবান। যেমন সিংহিনী আপন সন্তানের গা চাটে। ভক্ত এমন প্রিয়!

কেশব সেন এইটিন্ এইটিফোরে (১৮৮৪ খ্রীঃ) শরীর রাখলেন। ওঁর ছেলেরা যেতো মাঝে মাঝে ঠাকুরের কাছে। এইটিন্ এইটিসিক্সের (১৮৮৬ খ্রীঃ) গোড়াতে একজন গিছলো তাঁর কাছে, বয়স এগার বার হবে। কেশববাবুর ছেলে, এই কথা শুনে তিনি কোলের কাছে টেনে নিয়ে কাঁদতে লাগলেন। গায়ে হাত বুলুচ্ছেন। তখন অসুস্থ তিনি কাশীপুর বাগানে। কেশববাবুর কথা স্মরণ হয়েছে কিনা! তাঁকে কত ভালবাসতেন। ভক্ত এমন জিনিষ!

শ্রীমর চক্ষু ছলছল, কণ্ঠস্বর গাঢ় আর জড়িত।

বিপিনবাবু (বিনীতভাবে)—তাঁকে দর্শন করেছি, পাদস্পর্শ করেছি, কিন্তু কি হলো বুঝতে পারছি না। মন কেন শান্ত হয় না?

শ্রীম—একজন লোক পঞ্চাশ মাইল রেলে চড়ে গেল, ঘুমন্ত ছিল। নিদ্রা ভেঙ্গে গেলে বলছে, গাড়ী ছাড়বে কখন? গাড়ীর ভেতর সেই স্থান, সেই সব লোক, সেই বিছানা। বুঝতে পারে না গাড়ী কোথায় এসেছে। আপনাদেরও তাই হচ্ছে। কোথায় পৌঁছেছেন তা বুঝতে পারছেন না। তিনি যেকালে আপনাদের বাড়ীতে গেছেন আপনাদের বংশ উদ্ধার হয়ে গেছে। সাক্ষাৎ ভগবানকে গৃহে নিয়ে সেবা, আর

অত প্রেম! আপনারা কি কম? নিজেকে নিজে চিনতে পারছেন না।

সাধারণ সাধুগণ আসেন উদ্ধার হতে আর তিনি আসেন উদ্ধার করতে। এই কথাটি মা-ঠাকরুনকে বলেছিলেন একজন ভক্ত মহিলা (শ্রীমর স্ত্রী)।

অন্য সব সাধু বাড়ীতে এলে খুব উৎসব লেগে যায়। বাড়ীর লোকে বলে, উনি আমাদের বাড়ীতে আসার পর আমাদের সব— টাকাকড়ি, বাড়ীঘর, ছেলেপুলে বেড়েছে—মানসম্মান, নামযশ এইসব হয়েছে। ইনি খুব সাধু বটে। এই হলো সাধুর conception (ধারণা) সাধারণ লোকের।

ঠাকুর কিন্তু বলেছিলেন স্বামীজীকে, 'ডাল ভাত হলে হয়— এর বেশী নয়।'—মাকে বলতে বলায়।

অধরবাবুর সম্পর্কেও বলেছিলেন, কিন্তু কি হীনবুদ্ধি মা। যেখানে পরমার্থ লাভ হয় সেখানে তা না চেয়ে কিনা টাকাকড়ি চাইছে!

অধরবাবু তিনশ' টাকা মাইনে পেতেন—ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। হাজার টাকা মাসে চাকরীর চেষ্টা করছিলেন কর্পোরেশনে। ঠাকুরকে অনুরোধ করেছিলেন মাকে বলতে। ঠাকুর মাকে বললেন বটে, কিন্তু ঢং অন্যরূপ। ঠাকুর বললেন, মা, অধর বলছে তোমায় বলতে চাকরির জন্য। তা হয় হোক না, মা। তারপর ঐ কথা বললেন, কিন্তু কি হীনবুদ্ধি মা, যেখানে পরমার্থ লাভ হয় সেখানে তা না চেয়ে কিনা টাকাকড়ি চাইছে!

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—একজন বলেছিলেন ঠাকুরকে, অমুক বড় বুদ্ধিমান। ঠাকুর শুনে বললেন, কি রকম বুদ্ধি গো—চিড়াভেজা বুদ্ধি তো নয়? বলেই জিজ্ঞাসা করলেন, বুঝতে পারলে না বুঝি? ও দেশে (কামারপুকুরে) দই পাওয়া যায়। ফার্স্ট ক্লাস, সেকেণ্ড ক্লাস দই আছে। আর একরকম আছে থার্ড ক্লাস। এতে চিড়া ভিজান চলে। আলাদা জলের দরকার হয় না; জলবৎ তরল (হাস্য)। তেমনি বুদ্ধি। এরও নানা ভেদ আছে। যে বুদ্ধিতে গাড়ীঘোড়া,

ধনদৌলত, মানসম্ভ্রম লাভ হয় তাকে বলে চিড়াভেজা বুদ্ধি। অর্থাৎ বিষয়বুদ্ধি। তা দিয়ে সংসারের লাভ হতে পারে। কিন্তু ভগবান লাভ অতি দূর। যে বুদ্ধিতে ভগবানের দিকে মন যায়, তাঁর দর্শন হয়, সেই বুদ্ধি খাসা বুদ্ধি। (বিপিনের প্রতি)—এই যে আপনারা এখানে ঘুরছেন, ওখানে ঘুরছেন (সৎসঙ্গের জন্য), তাঁকে দেখেছিলেন বলেই তো। এ বুদ্ধি সকলের হয় না। তাঁর কৃপা হলে তবে এ বুদ্ধি হয়। নচেৎ বিষয়বুদ্ধি যাওয়া বড় কঠিন।

শ্রীম একটু চুপ করিয়া আছেন। তারপর ভক্তদের বলিতেছেন, এ-টি একবার হোক না—"এসেছে নূতন মানুষ।" ভক্তগণ মিলিত কণ্ঠে গাহিতেছেন। শ্রীমও যোগদান করিলেন, সকলে একেবারে মত্ত।

গান। এসেছে নূতন মানুষ দেখবি যদি আয় চলে।
ও তাঁর বিবেক বৈরাগ্য ঝুলি দু কাঁধে সদাই ঝুলে॥
শ্রীবদনে 'মা মা' বলে পড়ে গঙ্গা সলিলে।
বলে ব্রহ্মময়ী গেল তো দিন দেখা তো নাহি দিলে॥ ইত্যাদি

গান শেষ হইল। পুনরায় সকলে নীরব। ক্ষণকাল পর শ্রীম আবার ঠাকুরের কথামৃত বর্ষণ করিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—ঠাকুরের তখন অসুখ। একজন ভক্ত তাঁকে বলছেন, আপনাকে দেখে তৃপ্তি মেটে না। ঠাকুর সস্নেহে উত্তর করলেন, হাঁ, ভগবানকে দেখে তৃপ্তি মেটে না।

ভক্ত কি কম? যদি worldএ (জগতে) real (সত্য) কিছু থাকে তবে ভক্ত। ভক্তই অন্যরূপে ভগবান। They are leading a real life (ভক্তরাই ঠিক ঠিক জীবনযাপন করছেন)। (বিপিন-বাবুকে দেখাইয়া) এই এঁকে দেখে কত কথাই না আজ মনে পড়ছে! (বিপিনের প্রতি) খবরদার ঐ বাড়ীটি যেন ঠিক থাকে। ঠাকুর কত আনাগোনা করেছেন ওখানে। আজও কত ভক্ত তা দর্শন করতে যায়। ও সব মহাতীর্থ হয়ে রয়েছে—যেখানে তিনি সর্বদা যেতেন। ওরা সব কেমন আছেন, নূতন কাকী (অধর সেনের স্ত্রী)?

বিপিন—আজ্ঞে, ভাল আছেন। তবে মেয়েদের শোক।

শ্রীম—তিন মেয়েই গেছে?

বিপিন—আজ্ঞে হাঁ, তিনজনই গত হয়েছেন।

শ্রীম—হাঁ, আপনারা তাঁকেও দেখবেন, মাঝে মাঝে যাবেন। শুনতে পাচ্ছি অর্থের একটু টানাটানি চলছে। তা আপনারা গেলে অনেক সাহস হবে। আপনার লোক দেখলে সাহস হয়। স্ত্রীলোকদের হাতে পয়সা না থাকলে বড় মুস্কিল।

মর্টন স্কুলের দক্ষিণ পাশে একটি শ্রমজীবীদের পল্লী আছে। মুসলমান ভক্তগণ কখনও ভজন করেন। আজও তাঁহারা ভজন গাহিতেছেন। তাঁহাদের গানের সু-স্বর আর ধূপের সুগন্ধ শ্রীমর ভক্তমজলিসেও পৌঁছিয়াছে। শ্রীম হজরত মহম্মদের কথা ভাবিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—ভক্তের জন্য ভগবানও ব্যাকুল, যেমন ভক্ত ব্যাকুল ভগবানের জন্য। Last illness এর (মহম্মদের শেষ অসুখের) সময় অনেকগুলি ভক্ত মসজিদে সমবেত হয়েছেন। তাঁরা জানতে পারলেন, মহম্মদের খুব অসুখ। আজ আর আসতে পারবেন না তাঁদের কাছে। এই কথা শুনে সকলে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করতে লাগলেন। মহম্মদ ঐ রোদনের রোল শুনে আর স্থির থাকতে পারলেন না। কয়েকজন সেবকের স্কন্ধে ভর দিয়ে তিনি মসজিদে এসে উপস্থিত হলেন। তখন ভক্তদের কত আনন্দ! চুম্বক ছুঁচকে টানে। ছুঁচও কখনও চুম্বককে টানে, ঠাকুর বলতেন।

ঠাকুর বলতেন, পূর্ণ কায়েতের ছেলে, তার জন্য মন কেমন করে কেন, বল দেখি? নরেন্দ্র যখন গেলেন, তাঁকে দেখিয়ে অন্য ভক্তদের বলেছিলেন, মা আমাকে বলেছিলেন, কায়েতের ঘরে জন্মেছে। আগেই দেখিয়ে দিয়েছিলেন।

বড় জিতেন—চৈতন্যসংকীর্তনেও কাউকে কাউকে (শ্রীম, বলরাম প্রভৃতিকে) দেখেছিলেন। পরে তাঁদের দেখে চিনেছিলেন।

শ্রীম—হাঁ, মা পূর্বে যাদের দেখিয়েছিলেন তাদের চিনতে পেরেছিলেন। আনাগোনায় পূর্ব স্মৃতির উদ্দীপন হয় কিনা। ভক্তের জন্য ভগবানও ব্যাকুল হন। (ভক্তদের প্রতি) কোনও ভক্তকে

বাড়ী পাঠিয়েছেন আর এদিকে কল টিপছেন, মা একে ভুলিও না। তাঁকে যারা যত বুঝবে, (বিপিনকে দেখাইয়া) এঁদের তারা তত ভালবাসবে।

বিনয় (শ্রীমর প্রতি)—কাল বিবেকানন্দ সোসাইটির মাসিক অধিবেশন হবে দক্ষিণেশ্বরে।

শ্রীম—তাহলে কাল খুব function (উৎসব) আছে সেখানে। তাঁর স্থানে তাঁর কথা আলোচনা। যাওয়া উচিত সকলের।

জনৈক ভক্ত—ঠাকুরের সময়কার কেউ যাবেন কি?

শ্রীম—রামলালদাদা আছেন। বৃক্ষলতা এঁরাও সব তাঁর সাক্ষী। তাঁরা রয়েছেন। আর মা আছেন, রাধাকান্ত আছেন, শিব আছেন। আর সেই সব জীবন্ত জাগ্রত রজঃ, যার উপর দিয়ে তিনি চলতেন সেই সবই রয়েছেন। মা গঙ্গা সম্মুখে।

বড় অমূল্য—অবতারের সঙ্গে সব সময় একই দল সাঙ্গোপাঙ্গ আসেন কি?

শ্রীম—শুনেছি, ঐ রকম।

ঠাকুর বলেছিলেন, আমার চিন্তা যে করবে সে আমার ঐশ্বর্য লাভ করবে, যেমন পিতার ঐশ্বর্য পুত্র লাভ করে। এই আমরা যেমন তাঁর ঐশ্বর্যলাভ করেছি। আপনারাও লাভ করছেন। পরেও করবে।

রাত্রি দশটায় ভক্তগণ বিদায় লইলেন।

২

পরদিন রবিবার। আজ সারাদিনব্যাপী উৎসব নববিধান ব্রাহ্ম-সমাজে। শ্রীম সকাল সাড়ে সাতটায় নববিধানে গিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে ছিলেন, অমৃত, বিনয় আর জগবন্ধু। সেখান হইতে ঝামাপুকুরের ভিতর দিয়া গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেনে আসিয়াছেন। ঠাকুরবাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইয়াছেন। জগবন্ধু আর বিনয়কে বলিলেন, তোমাদের দক্ষিণেশ্বর গেলে হয়। তাঁহারা কাশীপুর ডাক্তারভবনে আহার করিয়া ছোট অমূল্যকে সঙ্গে লইয়া দক্ষিণেশ্বর গমন করিলেন।

নাটমন্দিরে বহু ভক্ত সমাগম। মঠ হইতেও অনেক সাধু আসিয়াছেন। বিবেকানন্দ সোসাইটির মাসিক অধিবেশন। আমেরিকার নিউইয়র্ক বেদান্ত সোসাইটির অধ্যক্ষ স্বামী বোধানন্দ সভাপতি। সভার শেষে কালীকীর্তন হইল। আরতি দর্শন করিয়া ভক্তরা কেহ কেহ কাশীপুর রহিলেন ডাক্তারের গৃহে—বিনয়, জগবন্ধু, ছোট অমূল্য, সুখেন্দু প্রভৃতি।

পরের দিন সোমবার, ২৮শে জানুয়ারী, ১৯২৪ খ্রীঃ। মর্টন স্কুলের দোতলার বারান্দায় শ্রীম বসিয়া আছেন—সিঁড়ির সামনে দক্ষিণাস্য। শ্রীমর বাঁ হাতে ঐ বেঞ্চিতেই মুকুন্দ ও জগবন্ধু বসিয়াছেন। বিনয় বসিয়াছেন আর একখানা বেঞ্চিতে পূর্বদিকে। উহা হাইবেঞ্চ সংযুক্ত। মুকুন্দ রামপুরহাটের প্রধান শিক্ষক। এইমাত্র আসিয়াছেন। বিনয় ও জগবন্ধু দক্ষিণেশ্বর প্রত্যাগত। তাঁহাদের নিকট হইতে গতকালের বিবেকানন্দ সোসাইটির মাসিক উৎসবের কথা শুনিলেন। এখন নিজে ব্রাহ্মসমাজের উৎসবের বিবরণ দিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—কাল আমরাও বিকালে নববিধানে গিছলাম। তখন বেলা সাড়ে চারটা। কামাখ্যাবাবু 'পুলপিট' (বেদী) থেকে sermon (উপদেশ) দিলেন। ইনি বাঁকীপুর কলেজের অধ্যাপক। বেশ ভালো লাগলো তাই রয়ে গেলাম। উনি যা বললেন তাতে মনে হয় নিশ্চয় সাধুসঙ্গ করেছেন। ঠাকুরের অনেক কথা বললেন—নির্জন বাস, ব্রহ্মচর্য এই সব কথা। দেখলাম, এতে অনেকে uncomfortable feel (অস্বস্তি বোধ) করছিল। একজন আসন ছেড়ে উঠে পড়লো। যেতে যেতে দাঁড়িয়ে আবার শুনছে কি বলেন। আর কতকক্ষণ বললে হয়তো মহা গোলমাল হতো। বক্তা আবার বেশ চালাক লোক। সব কথার পরেই ব্রহ্মানন্দের (কেশব সেনের) নাম করেন। বলেন, উনিও তাই বলেছিলেন অমুক বক্তৃতায়। অন্যের নাম করলে ক্ষেপে উঠতে পারে লোক, তাই ব্রহ্মানন্দের নাম করলেন। (সহাস্যে) তাঁর নাম করলে সকলে চুপ। আর কথাটি বলবার যো নাই। ওদের tendency (ভাব) ভাইবোনে মিলে প্রেমে হালুচালু করে। কিন্তু এর

sermon-এ (উপদেশে) এ সব কথা নেই। (সংযত গভীর হাস্যের সহিত) ও বাবা, এ-টি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে হলে রক্ষে ছিল! একবার শিবনাথ শাস্ত্রী 'পুলপিটে' বসা, sermon (উপদেশ) দিচ্ছিলেন। তখন কুড়োল নিয়ে কাটতে এলো 'পুলপিট' কয়েকজন। বলছে, না এ 'পুলপিট' আর রাখবো না। এখানে বসে এ সব কথা!

কামাখ্যাবাবুর কথা শুনে খালি মনে হচ্ছিল এ সব কথা পেলেন কোথায়? পাটনায় ঠাকুরের আশ্রম হয়েছে। ওখানে কি যাতায়াত করেন? আর বললেনও বেশ ধীরে ধীরে, স্পষ্ট করে সকলে যাতে বুঝতে পারে।

জগবন্ধু—অনেককাল প্রফেসারী করছেন তাই।

শ্রীম—তা তো অনেকেই করছে। কি হচ্ছে? সকলের বিরুদ্ধে ঐ সব কথা বলা—কতখানি moral courage (নৈতিক সাহসের) দরকার। This argues moral courage—নৈতিক শক্তিতেই কেবল এরূপ বলা সম্ভব। প্রমথবাবুও বেশ বলেন—কিন্তু overlap (একটির উপর আর একটি আনয়ন) করেন। তাড়াতাড়িতে সবগুলি idea (ভাব) লোক নিতে পারে না।

কামাখ্যাবাবু বললেন, অ-বস্তু না ছাড়লে বস্তু লাভ হয় না। ও সব কথা ঠাকুরের। সাধুসঙ্গ করেছেন কি না! সাধুকে যে ভাল না বাসে সে beast in life (জীবন্ত পশু)। পশুদের সঙ্গে মানুষের community of interest (সমব্যবহার) হলো আহার, বিশ্রাম, সন্তান উৎপাদন আর ভয়। মানুষের ভিতর ভগবানকে ডাকবার শক্তি রয়েছে। সে যদি তা না করে তা হলে, ঐ শুধু রূপে মানুষ, কিন্তু কার্যে পশু।

কামাখ্যাবাবু প্রথমেই বলে নিয়েছেন, 'অনেক দিন ধরে মনের মধ্যে কতকগুলি কথা সঞ্চিত হয়েছিল। আজ বলবার সুবিধা হল তাই বলছি।' বাঁকীপুরে থাকেন কিনা, তাই সুবিধা হয় না বলবার।

শ্রীম (জগবন্ধুর প্রতি)—আপনারা গিয়ে ওঁর সঙ্গে আলাপ করুন—স্বামীজীর উৎসবের পর মঠ থেকে ফিরে এসে। একটি গানও

হয়েছিল অনাহত শব্দের। ঐ গানটি মনকে টেনে কোথায় উঠিয়ে দিলে। মনে হয় গানটিও উনিই lead (পরিচালনা) করেছিলেন। ঐটিও লিখে আনবেন। ঐটি ধারণা করলে তাঁর দর্শন হয়। আমাদের ইচ্ছা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। শুনেছি, মির্জাপুর পার্কের কাছে থাকেন। ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকদের একটি আশ্রম আছে। সেখানে গেলে জানতে পারবেন তাঁর ঠিকানা। তাঁকে জিজ্ঞাসা করবেন, 'আপনি কি পাটনা আশ্রমে যান? আর কতদিন ধরে যান?' বলবেন 'আপনার বক্তৃতায় আমরা বড়ই সন্তুষ্ট হয়েছি।'

আজ বেলুড় মঠে স্বামীজীর জন্ম-মহোৎসব। শ্রীমর গদাধর আশ্রমে যাইবার কথা ছিল। কিন্তু ভক্তগণ বলিলেন, আজ মঠে গেলেও হয়। ডাক্তারবাবু 'কার' (car) নিয়ে এসেছেন। বেলা সাড়ে নয়টায় শ্রীম মঠে রওনা হইলেন—সঙ্গে বিনয় ও ডাক্তার।

এখন বেলা তিনটা। শ্রীম বেলুড় মঠে একটি বেঞ্চির উপর পূর্বাস্য বসিয়া আছেন। সম্মুখে স্বামীজীর মন্দির তারপর গঙ্গা। পাশে বসা, স্বামী সারদানন্দ, সান্যাল মহাশয় আর 'আবদুল' (কিশোরী রায়)। ইঁহারা সকলেই ঠাকুরের সন্তান—তাঁহার সময়কার লোক। পরস্পর ঠাকুরের পুরান কথা কহিয়া আনন্দ করিতেছেন। কিছুক্ষণ পর স্বামী সারদানন্দ শ্রীমকে সঙ্গে লইয়া স্বামীজীর মন্দিরে দ্বিতলে উঠিলেন। উত্তর-পূর্ব কোণে বসিয়া আমেরিকার ভক্ত ফকস্ ভগিনীদ্বয় গঙ্গা ও দক্ষিণেশ্বর দর্শন করিতেছেন। ইঁহারা সানফ্রান্সিসকো মঠের অধ্যক্ষ স্বামী প্রকাশানন্দের সহিত এই পুণ্যভূমি দর্শন করিতে আসিয়াছেন। স্বামী সারদানন্দ শ্রীমর সহিত তাঁহাদের পরিচয় করাইয়া দিলেন। ভগিনীদ্বয় সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছেন। আবার ভূমিষ্ঠ হইয়া শ্রীমকে প্রণাম করিতেছেন।

শ্রীম পাঁচটায় 'কারে' উঠিলেন, গদাধর আশ্রমে যাইবেন।

৩

বেলা দুইটা। শ্রীম মর্টন স্কুলে আসিয়াছেন গদাধর আশ্রম হইতে।

সঙ্গে ডাক্তার কার্তিক বক্সী ও ভক্ত ফকিরবাবু। শ্রীম স্কুলের আফিসে সুপারিনটেনডেন্টের আসনে বসিয়াছেন পশ্চিমাস্য। সঙ্গীরা পাশের চেয়ারে সামনে বসা। কিছুক্ষণ কথাবার্তা কহিয়া তিনি তিনটার সময় বিশ্রাম করিতে উপরে গেলেন।

বেলা প্রায় পাঁচটা। শ্রীম পুনরায় দোতলায় নামিয়া আসিলেন। আফিসের পাশের ঘরে ভক্তরা বসিয়াছেন। আজ শনিবার, তাই ভক্ত-সমাগম আগে হইতে হইয়াছে। ভাটপাড়ার ললিত প্রায় শনিবারেই আসেন। তিনি আজও আসিয়াছেন। বসন্ত এবং সঙ্গী দুই তিনজন আসিয়াছেন। বাগবাজার হইতে একজন গোস্বামী আসিয়াছেন। তিনি বিপত্নীক। শ্রীম গোস্বামীর সহিত কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (গোস্বামীর প্রতি)—ভবানীপুরে একটি ভক্ত থাকেন গদাধর আশ্রমের সামনে। ইঁট ব্যবসায়ীর নিকট কর্ম করেন, মাইনে পঁচিশ টাকা। মনিব একমাস ধরে টাকা দেয় নাই। ভক্তটি বলছিলেন কর্ম ছেড়ে দেবেন। আমরা বললাম, এমন যায়গায় টাকা দিয়ে থাকাও ভাল। এখানে থাকায় কত উপকার হচ্ছে। অবসর পেলেই আশ্রমে আসা যাচ্ছে। আর কখনও জপ, কখনও ধ্যান, কখনও ভজন করতে পারা যাচ্ছে। আর কি সাধুসঙ্গ! অমন সাধু মিলে কোথায়, ঠাকুরের সাধু? তাঁরা দিনরাত highest idealকে (শ্রেষ্ঠ আদর্শকে) নিয়ে পড়ে আছেন। অত সুবিধা হচ্ছে, চাকরীতে টাকা না পেলেই বা কি! নিজে টাকা দিয়ে থাকা উচিত অমন স্থানে। আমরা বারণ করায় এখন একটু বুঝেছেন। ছেলেমানুষ কিনা, প্রথমটা বুঝতে পারেন নি।

আর একটা দিক আছে। ঠাকুর একটি গল্প বলতেন। দুই বন্ধু বেড়াতে বেরিয়েছেন। একজন রাস্তার পাশে ভাগবত পাঠ হচ্ছিল দেখে ওখানেই বসে পড়লো। আর একজন গেল বেশ্যালয়ে। যে বেশ্যালয়ে গেল খানিক পর সে ভাবল, ছিঃ আমি কি হীন কাজ করছি। ভাগবত পাঠ ছেড়ে এ নরকে এসেছি। যে ভাগবত পাঠে ছিল সে ভাবছে বন্ধু আমার কত মজা লুটছে। দু'জনেরই মৃত্যু হলো। যে ভাগবত পাঠে ছিল তাকে নিয়ে গেল যমদূত নরকে মারতে

মারতে। আর যে বেশ্যালয়ে গিছলো সে গেল বৈকুণ্ঠে বিষ্ণুদূতের সঙ্গে। এর মানে হলো, মনই সব। শরীরটা নাই বা গেল। মন গেলেও হয়। মন যেখানে তুমিও সেখানে।

শ্রীমর শিক্ষার অদ্ভুত কৌশল। গোস্বামীকে সাধুসঙ্গ করিতে বলিলেন অপর একটি ভক্তচরিত্র বর্ণনা করিয়া। সাক্ষাৎ ভাবে বলিলে হয়তো করিবে না। আবার নিত্য সৎসঙ্গ করিবার নেহাৎ সুবিধা না হইলে, মনকে সৎসঙ্গে পাঠাইয়া দিলেও সঙ্গ হয় এ কথাও বলিয়া দিলেন।

শ্রীম (ললিতের প্রতি)—আপনার স্তবটি গোস্বামীমশায়কে শুনিয়ে দিন না।

ললিত বাল্মিকীকৃত গঙ্গা স্তোত্রটি শুনাইতে লাগিলেন :

মাতঃ শৈলসুতা সপত্নী বসুধা শৃঙ্গারহারাবলি।
স্বর্গারোহণ বৈজয়ন্তি ভবতীং ভাগিরথীং প্রার্থয়ে॥ ইত্যাদি।

তারপর শঙ্করাচার্যকৃত দুর্গাপরাধ ক্ষমাপন স্তোত্র :

শিশৌ নাসীদ্ বাক্যং জননি তব মন্ত্রং প্রজপিতুং।
কিশোরে বিত্তায়াং বিষম বিষয়ে তিষ্ঠতি মনঃ॥ ইত্যাদি।

এইবার তুলসীকৃত রামস্তোত্র আবৃত্তি শেষ হইল :

নমামি ভক্তবৎসলং, কৃপালুশীলকোমলং।
ভজামি তে পদাম্বুজং, হ্যকামিনাং স্বধামদম্॥ ইত্যাদি।

শ্রীম (ললিতের প্রতি)—গঙ্গাতীরে কৃষ্ণমঙ্গল যাত্রা হচ্ছে, গদাধর আশ্রমের কাছে। বড় সুন্দর। ভাগবতকথা এমন করে আমায় শোনায় কেউ তাহলে বেশ হয়। তাই যাই শুনতে। কাল প্রায় তিন কোয়ার্টার্স দাঁড়িয়েছিলাম। আর পারলাম না। old man-এর (বৃদ্ধের) পক্ষে তাই যথেষ্ট।

শ্রীম কি ভাবিতেছেন। পুনরায় কথা হইতেছে।

শ্রীম—হাঁ ললিতবাবু, আপনার মেয়ের খবর কি? আপনার ঘরে তো গৃহিণী নেই যে সব বলে দেবে। কুটুম্বদের তত্ত্ব করতে হয়। তবে ওরা সন্তুষ্ট থাকে।

ললিত—কি, টাকা দিয়ে ?

শ্রীম—না। মিষ্টি, কাপড়—এ সব দিয়ে তত্ত্ব করতে হয়। তবে শ্বশুরবাড়ীর লোক খুশী থাকে।

ললিত প্রভৃতি বিদায় লইলেন। একটি নূতন যুবকের সহিত কথা হইতেছে।

শ্রীম (জনৈক নূতন যুবকের প্রতি)—আপনি বলছেন কিছুই করছেন না। সর্টহ্যাণ্ড শিখুন না কেন ?

যুবক—মাকে বলবো আপনি বলে দিয়েছেন বলে।

শ্রীম—হ্যাঁ, এটা বলতে পারেন। ও সব কথা বলে কাজ কি—মঠে যাওয়া সাধুসঙ্গ করার কথা ? সর্টহ্যাণ্ড শেখার কথাটা বলবেন। ঐ সব কথা গোপনের ধন। ঢাকঢোল পিটিয়ে হয় না। ভগবানকে ডাকতে হয় এমনি যেন কেউ জানতে না পারে। আগে কিছু জমুক তো, তারপর না হয় অপরকে বলা যাবে।

যুবকটির একটু মোটা বুদ্ধি।

যুবক—যে আজ্ঞে, আপনার কথা বলে সব বলবো।

শ্রীম—না, এ সব আমাদের কথা নয়। সব ঠাকুরের কথা। তিনি কাউকে কাউকে বলতেন, 'কিগো তুমি নাকি কুমড়ো কাটা বড়্ঠাকুর। ওটি হয়ো না বাছা।' এর অর্থ, এই ব্যক্তির পুরুষার্থ এই পর্যন্ত। সে শুধু কুমড়োটা কাটতে পারে। আর কোন কাজের নয়। মেয়েদের কুমড়ো কাটতে নেই। তাই একটি বড়্ঠাকুর আছেন বাড়ীতে। শুধু কুমড়ো কাটা এর কাজ, অর্থাৎ অপদার্থ। না এদিক না ওদিক। একদিক নিয়ে থাকতে হয়।

এখন সন্ধ্যা সমাগত। নিত্যকার ভক্তগণ একে একে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রমণী, ছোট নলিনী, ছোট অমূল্য, গদাধর, ডাক্তার, উকিল, ললিত, বড় জিতেন, ছোট জিতেন, জগবন্ধু, বলাই প্রভৃতি আসিয়াছেন। বলাই নূতন আসাযাওয়া করিতেছেন—কাছেই বাড়ী।

ঘরে আলো আসিয়াছে। শ্রীম হাততালি দিয়া বলিতেছেন,

হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল। তারপর সকলে ধ্যান করিতেছেন মেঝেতে মাদুরে বসিয়া। আধঘণ্টা পর শ্রীম গান গাহিতেছেন।

গান। হরিরস মদিরা পিয়ে মম মানস মাত রে,
লুটায়ে অবনীতল হরি হরি বলে কাঁদ রে।
গভীর নিনাদে হরি নামে গগন ছাও রে,
নাচো হরি বলে, দুবাহু তুলে, হরিনাম বিলাও রে;
হরিনাম আনন্দরসে অনুদিন ভাস রে,
গাও হরিনাম, হও পূর্ণকাম, নীচ বাসনা নাশ রে॥

শ্রীম পুনরায় কৃষ্ণমঙ্গল যাত্রার কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (বড় জিতেনের প্রতি)—শুনেছেন জিতেনবাবু, আদি গঙ্গার তীরে কৃষ্ণযাত্রা হচ্ছে। বেশ গায়। পাঁচ টাকা নেয় 'পালা'য়। দু'টি হারমোনিয়াম, দু'টি খোল। আর তিনটি ছেলে আছে। হাত বাড়িয়ে পয়সা নেয়। না দিলে আবার বলে, 'পয়সা নেই, গান শুনতে এসেছে' (সকলের হাস্য)। আমরা দিয়েছিলাম একদিন। ডাক্তারবাবু দিয়েছেন একদিন। (কার্তিকের প্রতি) না ডাক্তারবাবু ?

বড় জিতেন—পয়সা যখন দিয়েছিলেন তখন ঠেলে গিয়ে বসলেন না কেন ?

শ্রীম (সহাস্যে)—বেশ কিন্তু গায়।

জগবন্ধু—আজ কামাখ্যাবাবুর বাড়ী গিছলাম।

শ্রীম (সাগ্রহে)—কি বললেন তিনি বলুন তো।

জগবন্ধু—ঠাকুরকে দক্ষিণেশ্বরে দর্শন করেছিলেন। বয়স তখন কম, প্রথম যৌবন।

শ্রীম (আহ্লাদে)—আমিও তাই ধরেছি—এ সব কথা পেলেন কোথা ? সব ঠাকুরের কথা। (বালকের ন্যায় ঔৎসুক্যে) এদিকে এগিয়ে বসুন না।

মুখের কাছে মুখ রাখিয়া শুনিতে লাগিলেন। শ্রীম পূর্বাস্য, জগবন্ধু পশ্চিমাস্য।

জগবন্ধু—বললেন, ঠাকুর আদর করে শিকা থেকে সন্দেশ পেড়ে

নিজহাতে খেতে দিয়েছিলেন। আবার প্রসাদ পেয়ে যেতে বলেছিলেন। আর বললেন, তাঁর অপার স্নেহের কথা কি বলবো। তাঁর স্নেহে কেনা হয়ে আছি। অমন স্নেহ আর কোথাও নাই।

শ্রীম (আশ্চর্যের সহিত)—তা নইলে অমন সব সত্য কথা against an unsympathetic assembly (সমবেদনাহীন অত লোকের সামনে)! কাল আরো বলেছিলেন, স্ত্রীলোকের সঙ্গে কথা কইতে নেই। বৌদ্ধরা দাঁড়িয়ে স্ত্রীলোকের পায়ের দিকে চেয়ে কথা কইতেন। বললেন, গাড়িতে মা মেয়ে ও স্ত্রীর সঙ্গে ছাড়া অপরের সঙ্গে যেতে নেই। মা মেয়ে ও স্ত্রীর সঙ্গ ছাড়া বসে কথা কইতে নেই। তিনি বেশ চালাক, ব্রহ্মানন্দের authority quote করে (দোহাই দিয়ে) বলেন। সকলেই তাহলে চুপ হবে।

দেখবেন তো গানটি উদ্ধার করে আনতে পারেন কি না। অনাহত শব্দের একটি গান হয়েছিল। প্রমথবাবুকে জিজ্ঞাসা করবেন গানটির কথা। আমাদের নাম করে নমস্কার জানাবেন। ইনি খুব মহাত্মা লোক, বিয়ে করেন নি। এঁদের সঙ্গে আলাপ রাখা ভাল। কেশববাবুর বড় ভাইয়ের ছেলে ইনি। ইনিই এখন এ দলের লিডার। কত বড় ভক্তবংশে জন্মেছেন—কেশববাবুর বংশ কিনা! কেশববাবু অতবড় হলেন কেন? কত বড় বৈষ্ণববংশ তাঁদের! এঁর ঠাকুরদাদা রামকমল সেন গুরুগত প্রাণ ছিলেন। গুরু ঘরে এলে রূপোর থালায় পা ধুইয়ে সকলে সেই চরণামৃত খেতেন। আর গানবাজনার একটা হৈচৈ পড়ে যেতো—একটা মহোৎসব। সেইজন্যই তো কেশববাবু শেষে 'গৌর গৌর' করলেন। রক্তেতে রয়েছে ঐ সংস্কার।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—আহা, অনাহত শব্দের গানটি বেশ! যোগীদের গান। পেলে বেশ হয়। যোগীরা শুনতে পান অনাহত শব্দ, সর্বদাই হচ্ছে। অনাহত, নিজেতে আহত হয়ে এই বিশ্ব হয়েছে।

এই বিশ্ব আনন্দে তার সৃষ্টি, আনন্দে স্থিতি, আনন্দে বিনাশ

হচ্ছে। ঋষিরা বলেছেন—'আনন্দাৎ হি ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দং অভিসং বিশন্তি।' যেমন ছেলেমানুষ। বাপের কাছ থেকে চেয়ে পয়সা নিলে। তাস কিনে তা দিয়ে আনন্দে ঘর বানালে। বন্ধুদের ডেকে দেখাচ্ছে, কত আনন্দ। খানিক বাদে, হাসতে হাসতে লাথি মেরে ভেঙ্গে দিলে। আর আনন্দে। নৃত্য করতে লাগলো। তেমনি এই বিশ্ব সৃষ্টি। ভগবান আনন্দস্বরূপ। তাঁর সকল অবস্থাতেই আনন্দ—জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও বিনাশে। পরম ব্রহ্মে সুখদুঃখ নাই। তিনি দ্বন্দ্বাতীত আনন্দস্বরূপ।

বড় জিতেন—এটা কিন্তু বোঝা যাচ্ছে না।

শ্রীম—ঠাকুর একটা গল্প বলেছিলেন। একটা নেউল, নেউল মানে বেজী, বেশ আরামে একটা দেয়ালের উপর বসে ছিল। ছেলেরা এর লেজে একখানা ইঁট বেঁধে দিলে। আর নড়তে চড়তে পারছে না আগের মত।

মানুষের অবস্থাও এই। তার স্বরূপ হলো ঐ সচ্চিদানন্দ স্বরূপ। মায়ায় গোলমালে পড়ে তাল পাকিয়ে গেছে। স্বরূপ ভুলে গেছে। ভুলে গেছে যে আমি বড় লোক, রাজার ব্যাটা।

লাটাইয়ে যা সুতো জড়িয়েছে সেগুলি খুলে ফেললে বোঝা যাবে এ সব কথা। লাটাই মানে মন, সুতো মানে বাসনা। তাঁর কৃপার দরকার। আরাম-চেয়ারে বসে এ সব বোঝবার যো নাই। মানুষ সব কি নিয়ে আছে? স্বরূপের চিন্তা কোথায়? কি করে বুঝবে এ grand mystery (বিরাট রহস্য)।

মন সর্বদা দেহেতে নামিয়ে রেখেছে। পেট নিয়ে সকলে ব্যস্ত। সব করছে পেটের জন্য। পেট পূর্ণ হলো তো একটু বিশ্রাম চাই। আবার এরই মাঝে ছানাপোনা বাড়াবার চেষ্টা। কি করে মানুষ বোঝে এই Divine Play (ভগবানের লীলা)? কোথায় সে চেষ্টা?

সমাধি হলে এসব দুর্বলতা যায়। তখন এ তত্ত্ব বোঝা যায়—This Grand Mystery.—সমাধি মানে দেহবুদ্ধি ভুল হয়ে যাওয়া। আমি দেহ নই, মন নই, আমি আত্মা। এ ভাবতে ভাবতে

আত্ম-স্বরূপ হয়ে যায়। তখন বোঝা যায়। যোগীরা এ রহস্য ভেদ করেছেন।

শ্রীম (জনৈকের প্রতি)—ঠাকুর বলতেন, যাদের চেহারা তেলতেলে বুঝতে হবে তাদের যোগভোগ দুই-ই আছে। আর যাদের চেহারা শুকনো তাদের শুধু যোগ।

ডাক্তার বক্সী নিদ্রাভিভূত। সারা দিনের খাটুনী—ঠিক যেন রণক্ষেত্রে সৈনিক।

শ্রীম (ছোট অমূল্যের প্রতি)—ডাক্তারবাবুকে জাগিয়ে দিন। অনেক রাত হয়ে গেছে। না এলেই ভাল হতো। কাল রাত্রে ছিলেন গদাধর আশ্রমে। সারারাত জেগে আছেন। সকালে বাড়ী ফেরার পর অনবরত কাজ। দুপুরে আর একবার এসেছিলেন। আবার এখন।

ডাক্তার ধন্য। মহাপুরুষের কি স্নেহ আর আশীর্বাদ!

বড় জিতেন—যতক্ষণ (সৎসঙ্গ) বেশী হয় ততই ভাল।

শ্রীম—না। স্থির হয়ে বসতে হয়। জল সব সময় নড়তে থাকলে তাতে মোহর পড়ে না। যখন স্থির হয় তখন মুখ দেখা যায়। যা সব শোনা গেল, দেখা গেল, বসে বসে তাই ভাবতে হয়। তাই তো সাধুরা জিজ্ঞাসা করেন একজন আর একজনকে, 'আপকা আসন কাঁহা হ্যায়'। যেখানে বসে ঈশ্বরচিন্তা করেন তাকে তাঁরা বলেন 'আসন'। আমরা বলি 'থাকা'—'আপনি কোথায় থাকেন'—লোক জিজ্ঞাসা করে। সাধুদের চিন্তা, আচরণ, কথা—সব ঐ ভাবের। এক কাজ তাঁদের—তাঁকে ডাকা। এক আসনে বসে তাঁকে ডাকছেন। পরিশ্রান্ত হলে (নিদ্রার অভিনয় করিয়া) ওখানেই শুয়ে পড়েন। ভাষা ভাবের বাহন। সাধুদের ভাষাই পৃথক।

শ্রীম কিয়ৎকাল নীরব রহিলেন। পুনরায় কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—ঠাকুরকে যারা দর্শন করেছিলেন শেষে তাদের একটা পরিবর্তন হয়েছে, এমন অনেক দেখেছি। একজন ছিলেন চরণদাস বাবাজী। শেষ সময়টা পুরীতে থাকতেন। খুব বড়

মহাত্মা। আমরা ওঁর কাছে ঝাজপিঠার মঠে ছিলাম। একদিন জিজ্ঞাসা করলাম, কি করে ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর দেখা হল। বললেন, তখন পড়তেন। আর কিছু বললেন না। সন্ন্যাস নিয়েছেন কিনা। এখন পূর্বাশ্রমের কথা বলবেন না। বরানগর বাড়ী ছিল।

তারপর বললেন, 'পিসিমা যা বলেছিলেন শেষে আমার তাই হলো।' উনি ইংরেজী পড়াশোনা করেন। আর পিসিমা সেকেলে লোক। সন্ধ্যাবেলা তুলসীতলায় প্রদীপ দেয় দেখে একদিন বলেছিলেন, 'পিসিমা, এ করছো কি? এতে কি আর সত্যের সন্ধান মিলবে?' পিসিমা উত্তর করলেন, 'বাবা, আমি মুখ্‌খু সুখ্‌খু মানুষ—আমার এই তুলসীতলাতেই যেন মতি থাকে।'

প্রথমে ছিলেন atheist (নাস্তিক), শেষে হলেন agnostic (উদাসীন)। তারপর 'পিসিমা যা বলেছিলেন শেষে আমারও তাই হলো।'

মর্টন স্কুল, কলিকাতা, ২রা ফেব্রুয়ারী ১৯২৪ খ্রীঃ
১৯শে মাঘ, ১৩৩০ সাল, শনিবার

ষোড়শ অধ্যায়

'আমি রাজার ব্যাটা'—মানুষের স্বরূপ সচ্চিদানন্দ

১

আজ সকালে শ্রীম ঠাকুরবাড়ীতে ছিলেন। দ্বিপ্রহরে ফিরিয়াছেন গদাধর আশ্রমে। এখন অপরাহ্ণ সাড়ে চারটা। ৩রা ফেব্রুয়ারী, ১৯২৪ খ্রীঃ, ২০শে মাঘ, ১৩৩০ সাল, রবিবার। একজন যুবক ভক্ত কলিকাতা হইতে শ্রীমকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন।

শ্রীম যুবক ভক্তের সঙ্গে বেড়াইতে বাহির হইলেন। সস্নেহে করুণার স্বরে তাহাকে বলিতেছেন, অত কষ্ট করে আসেন, মার

মহাত্মা। আমরা ওঁর কাছে ঝাজপিঠার মঠে ছিলাম। একদিন জিজ্ঞাসা করলাম, কি করে ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর দেখা হল। বললেন, তখন পড়তেন। আর কিছু বললেন না। সন্ন্যাস নিয়েছেন কিনা। এখন পূর্বাশ্রমের কথা বলবেন না। বরানগর বাড়ী ছিল।

তারপর বললেন, 'পিসিমা যা বলেছিলেন শেষে আমার তাই হলো।' উনি ইংরেজী পড়াশোনা করেন। আর পিসিমা সেকেলে লোক। সন্ধ্যাবেলা তুলসীতলায় প্রদীপ দেয় দেখে একদিন বলেছিলেন, 'পিসিমা, এ করছো কি? এতে কি আর সত্যের সন্ধান মিলবে?' পিসিমা উত্তর করলেন, 'বাবা, আমি মুখ্যু সুখ্যু মানুষ—আমার এই তুলসীতলাতেই যেন মতি থাকে।'

প্রথমে ছিলেন atheist (নাস্তিক), শেষে হলেন agnostic (উদাসীন)। তারপর 'পিসিমা যা বলেছিলেন শেষে আমারও তাই হলো।'

মর্টন স্কুল, কলিকাতা, ২রা ফেব্রুয়ারী ১৯২৪ খ্রীঃ
১৯শে মাঘ, ১৩৩০ সাল, শনিবার

মহাত্মা। আমরা ওঁর কাছে ঝাজপিঠার মঠে ছিলাম। একদিন জিজ্ঞাসা করলাম, কি করে ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর দেখা হল। বললেন, তখন পড়তেন। আর কিছু বললেন না। সন্ন্যাস নিয়েছেন কিনা। এখন পূর্বাশ্রমের কথা বলবেন না। বরানগর বাড়ী ছিল।

তারপর বললেন, 'পিসিমা যা বলেছিলেন শেষে আমার তাই হলো।' উনি ইংরেজী পড়াশোনা করেন। আর পিসিমা সেকেলে লোক। সন্ধ্যাবেলা তুলসীতলায় প্রদীপ দেয় দেখে একদিন বলেছিলেন, 'পিসিমা, এ করছো কি? এতে কি আর সত্যের সন্ধান মিলবে?' পিসিমা উত্তর করলেন, 'বাবা, আমি মুখ্খু সুখ্খু মানুষ—আমার এই তুলসীতলাতেই যেন মতি থাকে।'

প্রথমে ছিলেন atheist (নাস্তিক), শেষে হলেন agnostic (উদাসীন)। তারপর 'পিসিমা যা বলেছিলেন শেষে আমারও তাই হলো।'

মর্টন স্কুল, কলিকাতা, ২রা ফেব্রুয়ারী ১৯২৪ খ্রীঃ
১৯শে মাঘ, ১৩৩০ সাল, শনিবার

বাড়ী হয়ে আসতে হয়। কপালে কি ঘটে এসব? আদিগঙ্গা স্পর্শ করে মার মন্দির পরিক্রমা করতে হয়। তারপর সুবিধা হলে মাকে দর্শন করে এখানে আসতে হয়। শ্রীমর স্নেহস্পর্শে ভক্তটির হৃদয় বিগলিত, চক্ষু ছল ছল হইয়াছে।

ভবানীপুর হরিশ পার্কের দিকে শ্রীম অগ্রসর হইতেছেন, চাউলপট্টির রাস্তা দিয়া। রাস্তার বামপার্শ্বে এক বাড়ীতে একটি নবপ্রসূত গোবৎস দুগ্ধ পান করিতেছে।

শ্রীম (যুবকের প্রতি)—দেখুন, দেখুন, কেমন দুধ খাচ্ছে! এইটুকু বাছুর সবে জন্ম হয়েছে। আচ্ছা ওরা হয়েই খেতে পারে, না, ধরিয়ে দিতে হয়?

যুবক—আজ্ঞে, ধরিয়ে দিতে হয়।*

শ্রীম—ধরিয়ে দিক, অথবা নিজের চেষ্টাতে খাক, খাবার ইচ্ছাটা তো আছে। আর চেষ্টাও আছে। হয়েই খাবার চেষ্টা। যদি তাই হয় তবে কি করে আর বলা যায় free will (স্বাধীন ইচ্ছা)! তা হলেই tendency (সংস্কার) এসে পড়ছে। পূর্বে খেয়েছে তাই খাবার ইচ্ছা। আর খেতে যে চেষ্টা করছে, এও পূর্ব অভ্যাসের ফল। পূর্বজন্ম এসে পড়ছে তা হলে।

শ্রীম কিছুদূর আগাইয়া চলিতেছেন। রাস্তায় লালবিহারীর সঙ্গে দেখা। ইনি নিজের ব্যবসাকর্ম করেন। শ্রীম তাঁহার সহিত কথা কহিতেছেন।

লালবিহারী—আমাদের একটি কুলীর কলেরা হয়েছে—সে উড়িষ্যার লোক।

শ্রীম—একখানা তক্তাপোষের ব্যবস্থা হয় না কি? ডাক্তাররা বলেন, ঠাণ্ডায় আবার নিউমোনিয়া হয়ে যায়। দেখছে কে?

* এই ঘটনার কয়েক বৎসর পর এই ভক্তটি দেওঘরে একটি দৃশ্য দেখেছিলেন। বিস্তীর্ণ মাঠ—একটি বাছুর পেট থেকে বের হয়েই একটু পর দুধ খাবার চেষ্টা করছিল। মাও মাইটা তার মুখের কাছে এনে ধরছিল। সেখানে কোন লোক ছিল না ঢুঁ মারতে মারতে বাঁটে মুখ লাগতেই দুধ খেতে লাগলো।

লালবিহারী—একজন হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার।

শ্রীম—কি এক রকম ইনজেক্‌সন বের হয়েছে। ও-টা দিলে কেমন হয়?

লালবিহারী—তাহলে চিকিৎসা বদলাতে হয়। সেটা হলো এ্যালোপ্যাথিক।

আর একটু আগাইলে সতীশ ও কালিদাস আসিয়া মিলিত হইল।

হরিশ পার্ক। শ্রীম ভক্তসঙ্গে পার্কে প্রবেশ করিলেন। উত্তর প্রান্তে ছোট ছেলেরা খেলা করিতেছে। শ্রীম দাঁড়াইয়া তাহাদের খেলা দেখিতেছেন। আনন্দে ভরপুর হইয়াছেন—যেন তিনি তাহাদেরই একজন।

শ্রীম (যুবক ভক্তের প্রতি)—দেখুন দেখুন, কি আনন্দের হাট বসেছে! এই দেখুন, ইনি যুদ্ধের অভিনয় করছেন। আর ইনি বাঁশি বাজাচ্ছেন। আর এঁর হাসি দেখুন। ইনি দৌড়ে পালাচ্ছেন। (একটু আগাইয়া) বুড়োরা হয়তো মনে করছে, এ আবার ছেলের দলে মিশলো কি করে (সকলের হাস্য)।

কি আনন্দে খেলছে এরা! তাই ক্রাইস্ট বলেছিলেন, তাদের সঙ্গে ঈশ্বর আছেন। তাই অত আনন্দ। ঈশ্বর ছেলেদের সঙ্গে খেলা করতেন বোধ হয়। যদি বল, দেখতে পারছে না কেন। ঠাকুর তার উত্তরে বলেছিলেন, লঙ্কা না জেনে খেলেও ঝাল লাগবে। (সতীশ ও কালিদাসের প্রতি) বল, লাগে কি না?

আর একদল ছেলের কাছে আসিয়া শ্রীম দাঁড়াইলেন। ইহাদের বয়স এগার বার বছর। শ্রীম যুবককে বলিলেন, দেখুন, দেখুন, এরা আপোষে ঝগড়া করছে। একটু বড় হয়েছে কিনা। ঝগড়াতে বাইরের self-টার (আমিটার, দেহের) development (বৃদ্ধি) হয়। Real selfএর (জীবাত্মার) development (বৃদ্ধি) হয় নির্জনে তপস্যায়।

শ্রীম পার্কের ভিতর উত্তর-দক্ষিণে তিন চার বার পদচারণ করিতেছেন। আর মাঝে মাঝে কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (সতীশের প্রতি, স্বামীজীর জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে)—মিটিংএর কি হলো?

সতীশ—আজ হবে না। ললিত মহারাজের (স্বামী কমলেশ্বরানন্দ) অসুখ, তাই।

শ্রীম—কি দরকার মিটিংএর? অসুখ হয়েছে আবার।

কালিদাস—দরকার নেই কি মহারাজ? অনেকে হয়তো জানেই না, এখানে গদাধর আশ্রম আছে।

কালিদাস অতি সাহস করিয়া এই কথা বলিয়া শেষ করিল।

শ্রীম—তা হলে একটা ড্রাম কিনে খুব পেটো। পরমহংসদেবের কাছে শুনেছিলাম—যদি গভীর বনে ফুল ফোটে তো মৌমাছি আপনি আসবে।

লেকচার দেবে তো তোমার পাস কোথায়? বলেছিলেন, ও-দেশে (কামারপুকুরে) পুকুর পাড়ে কোম্পানী যেই নোটিশ মেরে দিলে অমনি বাহ্যে করা বন্ধ হয়ে গেল। তার পূর্বে কেউ শুনতো না কারো কথা। 'কমিশন' কোথায়, credentials (পরিচয়পত্র) কোথায়? স্বামীজীর কথা বলবে?—তা ভিন্ন। তাঁর কমিশন ছিল।

ঠাকুরের ইচ্ছা ছিল ইস্ট-ওয়েস্টের মিলন হোক। ওয়েস্ট এ-দেশের spirituality (আত্মবিদ্যা) নেবে। আর এ দেশ ওয়েস্টের সায়েন্স-টায়েন্স এদিককার এ সব নেবে। আদান প্রদান হবে। এ দেশ থেকে ঈশ্বরে শ্রদ্ধা, ভক্তি, বিশ্বাস ও দেশে যাবে। আর ওদের জড়বিজ্ঞান এ দেশে আসবে। তাতে দুয়েরই মঙ্গল।

এ কর্ম কি সকলে পারে, স্বামীজীর কর্ম? অন্যে কি বলতে কি বলে—making confusion worse confounded—ঠাকুর বলতেন, যদি বা রোগী ছিল বসে, বদ্যিতে শোয়ালে এসে।

মিটিংএর জন্য ঐ সব লোকের খোসামোদ করতে হবে। Lower idealকে (হীন আদর্শকে) worship [অর্চনা] করতে হবে। ছিঃ!

শ্রীম রাস্তায় চলিতেছেন পার্কের বাহিরে। গদাধর আশ্রমে ফিরিবেন। রাস্তায় পান্নালাল আসিয়া মিলিলেন। পুনরায়

লালবিহারীর কাছে উপস্থিত হইলেন। অসুস্থ কুলীটির কথায় চিন্তিত। অতি করুণ স্বরে বলিতেছেন, ওর ঠাণ্ডা না লাগে। ওরা আবার খুব ভীতু। Povertyতে (দারিদ্র্যে) এমন করেছে। আর ঘরটা disinfectant (বীজাণুমুক্ত) করে নিলে হয় না?

শ্রীম লালবিহারীর নিকট যেন প্রার্থনা করিতেছেন যাহাতে রোগীর সেবা ও শুশ্রূষার ক্রটি না হয়।

এখন সন্ধ্যা। গদাধর আশ্রম। দোতলার ঘর। শ্রীম দক্ষিণাস্য হইয়া মেঝেতে বসিয়া আছেন। বিরিঞ্চিবাবুর ভগিনী আসিয়াছেন। তিনি কাঁদিতেছেন। বিরিঞ্চির দেহত্যাগ হইয়াছে। ইনি কবিরাজ ছিলেন। সর্বদা বড় জিতেনের সহিত শ্রীমর কাছে আসিতেন।

এইবার ঠাকুরঘরে আরতি হইতেছে। সাধু, ভক্তগণ গাহিতেছেন,

খণ্ডন ভববন্ধন জগবন্দন বন্দি তোমায়।
নিরঞ্জন নররূপধর নির্গুণ গুণময়, ইত্যাদি।

সঙ্গে নানাবিধ বাদ্য।

শ্রীম দাঁড়াইয়া দর্শন করিতেছেন, কর অঞ্জলিবদ্ধ। আরতি শেষ হইলে অনেকে চলিয়া গিয়াছেন। জগবন্ধু রহিয়াছেন।

শ্রীম (জগবন্ধুর প্রতি)—আপনি বুঝি কৃষ্ণমঙ্গল গান শোনেন নি? একটু অপেক্ষা করে শুনে যান।

জগবন্ধু আদিগঙ্গার তীরে দাঁড়াইয়া কৃষ্ণমঙ্গল শুনিতেছেন। ইন্দ্রপূজা পালা হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রের পূজা বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া সমগ্র ব্রজমণ্ডল বৃষ্টি ও বন্যায় ভাসাইয়া দিলেন, গোপগোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন। বালক কৃষ্ণ, বাম হস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলিতে গোবর্ধন পর্বত ধারণ করিয়া রহিলেন। আর সকলে তাহার নিচে আশ্রয় গ্রহণ করিল। দর্প চূর্ণ হওয়ায় ইন্দ্রের জ্ঞান ফিরিল। ভগবানকে প্রার্থনা করিতেছেন, 'আমায় ক্ষমা করুন প্রভো! আমার অহংকার চূর্ণ হয়েছে। আমার প্রতি আপনার অসীম কৃপা ইহা আমি সম্যক উপলব্ধি করতে পারছি। রাজপদে মত্ত হয়ে আপনার চরণকমল ভুলে গিছলাম। আমার দর্প চূর্ণ করে

অসীম কৃপায় পুনরায় আমার আপনার অভয় পদে স্থান দিয়েছেন? আমি ধন্য।'

বিশ মিনিট পর শ্রীমও আসিয়াছেন। শীতের রাতে বৃদ্ধ-শরীরে গঙ্গাতীরে দাঁড়াইয়া শ্রীমও কৃষ্ণমঙ্গল শুনিতেছেন। সাতটা হইতে নয়টা পর্যন্ত দাঁড়াইয়া শুনিলেন। শ্রীম একটি আনি 'পেলা' দিলেন। ফিরিবার পথে জগবন্ধুকে বলিতেছেন—

দেখুন, এক আনা দিয়ে কত বড় কথা শোনা গেল। অমূল্য কথা। তার দাম নাই। ইন্দ্র বলছেন, জীবের যা দুঃখকষ্ট এ সব ভগবানের দিকে মন নেবে বলে। ইন্দ্র বলছেন, এটা তাঁর কৃপা। এই কথাটা মনে রাখলে সংসারে জীবন্মুক্ত। সুখদুঃখ দুই-ই তাঁর প্রসাদ। সর্বাবস্থায় এ-টি স্মরণ রাখা। এই শ্রেষ্ঠ সাধন।

ছেলেবেলায় এই সব গানে এক ঘণ্টা আগে গিয়ে বসে থাকতাম। পাড়া খুঁজে যেখানে গান হতো সেখানেই যেতাম।

এক আনায় কি অমূল্য জিনিস লাভ হল। এইটি ভাবতে ভাবতে কলকাতায় যান।

পরদিন রাত্রি আটটা। শ্রীম মর্টন স্কুলের দোতলার ঘরে বসা। পাশে রমণী, ছোট নলিনী, জগবন্ধু ও বড় জিতেন। বিরিঞ্চির দেহত্যাগে তাঁহার ভগিনীর শোকের কথা হইতেছে। শ্রীম বলিলেন, এই স্নেহ দিয়ে জগৎ বেঁধেছেন। তার অভাব হলেই শোক। শোক কি কম—যেন দাবানল। জ্বালিয়ে মারে জীবকে। তাঁর কৃপায় এই স্নেহ যদি ঈশ্বরের উপর দিয়ে দেয় কেউ, তবেই বেঁচে গেল। বিষের অমৃত ফল হয়। কিন্তু তাঁর কৃপা ছাড়া হবার যো নাই। কিসে কৃপা হয়—ঠাকুর বলতেন, কাঁদলে—এক ঘটি কাঁদলে।

বড় জিতেন—আমাদের কুলগুরু একটু ক্ষুব্ধ হয়েছেন। আগে এককালীন বার্ষিক দেওয়া হতো। এখন মাসে মাসে দেওয়া হয়, তাই। এখন উপায় কি?

শ্রীম—তাঁকে চিঠি লেখা উচিত এই বলে, 'আশীর্বাদ করুন যাতে বেশী দিতে পারি।'

শোক, দুঃখ ও অভাবের অনেক কথা হইয়াছে। শ্রীম তাহাদের স্রোত উল্টাইয়া দিলেন। মত্ত হইয়া ঠাকুরের মহৌষধি গানে বর্ষণ করিতেছেন। তিনটি গান করিলেন।

(১) পড়িয়ে ভব সাগরে (২) দয়াল গুরু নামে দেও রে সাঁতার।

(৩) গুরু কাণ্ডারী যেমন আর কি নেয়ে আছে তেমন,
পার করেন দীনজনে অভয় চরণ তরী দিয়ে।
তরণীর এমনি গুণ তাতে নাইকো পাল নাইকো গুন,
তরণী আপনি চলে শ্রীচরণরেণু-গুণে॥

ভক্তদের গান করিতে বলিয়া শ্রীম ঠাকুরবাড়ীতে গেলেন খাইতে। ফিরিয়াছেন রাত্রি নয়টায়।

শ্রীম (বড় জিতেনের প্রতি)—কি করছিলেন আপনারা সকলে এতক্ষণ ?

বড় জিতেন—গান হলো। আবার আপনার গতিবিধির কথাও হলো। মঠের ওদেরও ইচ্ছা, ওখানে (গদাধর আশ্রমে) আপনি থাকেন কিছুদিন।

শ্রীম—এই আনাগোনা।

বড় জিতেন—এখানে একটি গ্রুপ্, ওখানে একটি গ্রুপ্।

শ্রীম—আমাদের মধ্যে এমন একটি impulse (চিন্তাশক্তি) দিয়েছেন, এই গ্রুপের অভিজ্ঞতা দিয়ে জগতের গ্রুপগুলি বুঝতে চাই। সবই এমনি এক একটি গ্রুপ্। অনন্ত গ্রুপ্ অনন্ত কাণ্ড তাঁর। 'ব্যক্ত মধ্যানি ভারত'—দুই দিকেই অন্ধকার—জন্মের আগে আর মৃত্যুর পরে—মাঝখানটা ব্যক্ত, মানে manifestation এই life-timeটা (জীবনকাল)।

বুঝবার কি যো আছে কিছু ? কিছু বোঝা যায় না। দেখুন না, একটা পাখী। কে তাকে বুদ্ধি দিলে অমন সুন্দর বাসাটি বানাতে? তাতে ডিম পাড়বে আবার। তবে species (বংশ) বৃদ্ধি হবে।

যে দিকে দেখুন, দেখতে পাবেন একটা বিরাট বুদ্ধি কাজ করছে, meticulously (সুনিয়ন্ত্রিতরূপে)। একটা বিরাট plan (পরিকল্পনা) দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। সব অনন্ত। সবটা কেউ বুঝতে পারে না তিনি ছাড়া। কিন্তু জীবের কাজ হয়ে যায় যদি সে নিজের ক্ষুদ্রতা ধরতে পারে সেই অনন্তের সামনে। তাহলেই তার কাজ শেষ। আর দুঃখ থাকবে না।

They know that nothing can be known—যারা বুঝেছে যে কিছুই বুঝতে পারি নাই—তাদেরই বলে জ্ঞানী। এই স্থূল আর এই সূক্ষ্ম দিয়ে অর্থাৎ এই দেহ ও বুদ্ধি দিয়ে জানার যো নেই বিরাটকে। তাঁর চিন্তা করে করে এর উপর উঠতে পারলে অন্য রকম শরীর হয়। ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি—সব অন্য রকম। তা দিয়ে দেখা যায়, বোঝা যায়, কতকটা সেই বিরাট বুদ্ধিকে। তাঁকে বুঝলে আর কিছু জানার আকাঙ্ক্ষা থাকে না, তখন আর বাকীও থাকে না কিছু জানবার। 'তস্মিন বিজ্ঞাতে সর্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি।' "কস্মিন নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি?'—মহামুনি শৌনক এই প্রশ্ন করেছিলেন। তার উত্তর এই, তাঁকে জানলে সব জানা হয়।

কিন্তু এই সব স্থানে থেকে বুঝবার উপায় নাই। এই environmentএর (পরিবেশের) ভিতর থাকলে মন ছোট হয়ে যায়। যেমন পুকুরের বদ্ধ মাছ। তপস্যার দরকার। তা করতে করতে ক্ষুদ্রতাটা ভেঙ্গে যায় মনের। পুকুর বাঁধ ভেঙ্গে সমুদ্রে মিলিত হয়। তখন এ জল ও জল এক। এ মাছ আর সমুদ্রের মাছ এক।

তপস্যার মানে, favourable environmentsএ (অনুকূল পরিবেশে) থেকে তাঁর চিন্তা করা, একমনে।

২

মর্টন স্কুলের তিন তলার ঘর। শ্রীম খাটে বসিয়া ধ্যান করিতেছেন পশ্চিমাস্য। সম্মুখে একটি বেঞ্চিতে বসা জগবন্ধু ও শচীনন্দন।

সন্ধ্যা হইয়াছে। আজ ৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯২৪ খ্রীঃ, ২২শে মাঘ ১৩৩০ সাল, মঙ্গলবার। অমাবস্যা।

একটু পর প্রবেশ করিলেন ডাক্তার বক্সী, বিনয় আর ছোট নলিনী। তারপর বড় জিতেন। শ্রীম ভক্তদের সঙ্গে কুশল প্রশ্নাদি করিতেছেন—সব খবর ভাল তো?

বড় জিতেন (শ্রীমর প্রতি)—হরিদাসবাবু বই লিখেছেন কি কি করে ক্রোধ দমন করতে হয়। ছেলেদের physical culture (শরীরচর্চা), mental improvement (মানসিক উন্নতি) এ সব কথাও আছে। ছাপাবেন। আমাকে দেখিয়েছিলেন। আমি বললাম, ওখানে (শ্রীমকে) দেখালে ভাল হয়। অবসর হবে কি দেখবার? ওঁর ইচ্ছা, errorsগুলি (ভুল) সেরে দেন, পাছে ছেলেদের অনিষ্ট হয়। আর একজন দেখলে সেগুলি ধরা পড়ে।

শ্রীম—authority quote (নজীর উদ্ধার) করেছেন কি? তা না হলে দু-একজন ফ্রেণ্ডস পড়বেন মাত্র। তার permanent value (বরাবরের জন্য আদর) হবে না। দেখুন না, ক্রাইস্টকে জজ চার্জ করছেন, on what authority did you say so? নজীর দেখাও, কার কথায় এমন করলে? এই যে আমাদের বইগুলি (শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত)—যদি এরূপ লেখা যেতো যে আমাদের মত এই—তা হলে কেউ পড়তো না। ঠাকুর নিজে বলছেন। তাই সকলের মাথা হেঁট শুনে। এতে কোন কথা বলবার যো নাই।

Next question (তারপর প্রশ্ন) আসে, রিপোর্ট trustworthy (বিশ্বাসের যোগ্য) কি না। আগে quote (উদ্ধার) করতে বলুন, বড় বড় লোকেরা কি বলছেন ঐ সব সম্বন্ধে। মাঝে মাঝে বেদ, উপনিষদ, গীতা, পুরাণ এ সব উদ্ধৃত করতে হয়। আর ইংরেজরা কি বলেন তাও বলতে হয়।

এখন আমাদের অন্য কিছু পড়বার patience (ধৈর্য) নেই। এমন হয়েছে অভ্যাস ঠাকুরের কথা চিন্তা করে করে যে, তাঁর কথা ছাড়া অন্য কিছু ভাল লাগে না। কোন নূতন বই পড়তে হলে প্রথম কয়

পৃষ্ঠা পড়ি। তারপর মাঝের কিছু ও শেষের দিকের কিছু দেখে contents (সূচী) ঠিক করে নিই। এত সব কাঁচা মাল খেলে হজম হবে কেন এ বুড়ো শরীরে ? ঠাকুরের একটু চিন্তা করবো তা নিশ্চিন্তি মনে করার একটু অবসর পাই না। তা হলে অন্য বিষয় ভাববো কি করে ? এই lifeটা (জীবনটা) too short (অতি ক্ষণস্থায়ী) ঈশ্বরকে ডাকার জন্য।

দেখুন না, উকীল আধ ঘণ্টা অনবরত বকছে, লেকচার দিচ্ছে। তিন দিন ধরে লেকচার দিল। তারপর শোনা গেল লেকচারের বিষয় এই জমিটা অমুকের কি না। কিংবা অমুক অমুকের কাছে এত টাকা ধারে কিনা। এই জন্য লেকচার হচ্ছে তিন দিন ধরে।

আর একজন ঈশ্বরকে ডাকছে তাতে কিনা বলে 'বেহেড' হয়ে যাবে। একটু ভাবটাব হলে লোকে বলে পাগল হয়েছে। এখন কে পাগল ? যে নিত্যবস্তু ঈশ্বরকে ডাকছে, সে ? না, যে অনিত্যবস্তু জমি, কিম্বা টাকার জন্য লেকচার দেয় তিন দিনে চব্বিশ ঘণ্টা, সে ? পাগল বলতে হয়, বল দুই-ই পাগল। শুধু ওকে (ঈশ্বরভক্তকে) পাগল বলবে কেন ? Majority (সংখ্যাধিক্য) এদের কিনা তাই ওঁদের পাগল বলে।

একেকে জানবার চেষ্টা করলে, এক ঠিক হয়ে গেলে, ভিতরের অন্য সব আপনিই ঠিক হয়ে যায়। এক ঠিক হলে সব ঠিক। দেখ না, গণেশ পার্বতীর চারদিকে পরিক্রমা করে গলায় মায়ের দেওয়া অমূল্য হার পরলেন। আর কার্তিক ব্রহ্মাণ্ড ঘুরেও কিছুই পেলেন না।

বড় জিতেন—শরীরটা কেমন চলছে আজকাল, বড্ড খারাপ কি ?

শ্রীম—এই ভাল হচ্ছে আবার অন্য রকম। জোয়ার-ভাটা খেলছে।

বড় জিতেন—অনেকে নিজে সব করতে না পারলে অপরকে বলে। তারা সব করে দেয়। করবার লোক আছে, আর তাদের আগ্রহও আছে।

শ্রীমর শরীর তত ভাল নয়। ইনি কাহারও সেবা লন না। কাহাকেও প্রায় বিশেষ কিছু করিতে বলেন না নিজের শরীরের জন্য।

ভক্তরা কেহ কেহ সর্বদা সঙ্গে থাকেন সেবার জন্য। বড় জিতেন তাহাদের জন্য plead (ওকালতী) করিতেছেন।

শ্রীম (উদ্দাম হাসির সহিত)—কর্তারা ভাবে আমরা সব করছি। কিন্তু তিনিই সব করছেন। তাঁর যা ইচ্ছা তাই হবে। মানুষ ভাবে আমরা সব করছি। ঈশ্বর সব করছেন। দেখুন না, অক্সিজেন আমরা গাছ থেকে পাই, সূর্য থেকে পাই তাপ, তবে জীবনটা থাকে। জানোয়ারের দুধ খেয়ে তবে জীবন রক্ষা হয়। আবার মাছ খায়, মাংস খায়, বৃক্ষের ফল খায়—এতো খেয়ে তবে জীব জীবিত আছে। এর উপর জল ও বায়ু তো আছেই।

কি অদ্ভুত উপায়ে ফলফুল হচ্ছে। পেস্টিল (pestil) আর পোলেন (pollen) কি করে মিলিত হচ্ছে? তবে তো ফুল হচ্ছে, তার থেকে ফল? পুরুষ পোলেনটি হাওয়ায় উড়ে, কিংবা কীট-পতঙ্গের শরীর আশ্রয় করে পেস্টিলে, মানে স্ত্রী-ফুলে বসবে। তাতে ফারটিলাইজ্‌ড (fertilised) হয়ে ফুল হচ্ছে, তা থেকে পরে ফল। এ সব নিয়ম কে করেছে, মানুষ? সবই ঈশ্বর করেছেন।

আমরা ভাবছি একজনের সেবা করবো। আচ্ছা, যে সেবা করবে তার যদি paralysis (পক্ষাঘাত) হয়ে পড়ে তখন কে সেবা করবে? আরও কত রকম বাধা হতে পারে। শুধু positive conditionগুলি (দৃশ্য কারণগুলি) দেখছি। Negativeগুলি (অদৃশ্য কারণগুলি) deny (অস্বীকার) করলে চলবে না। Positiveএর (দৃশ্য কারণের) না হয় প্রতিকার হলো। কিন্তু negativeএ (অদৃশ্য কারণে) কি হাত আছে তোমার? তার জন্যই মনে করা উচিত ঈশ্বর সব করেছেন। তিনি সর্বশক্তিমান। তাঁর ইচ্ছাশক্তিতে সব হচ্ছে, সব চলবে।

'কর্তাহমিতি মন্যতে' (জনৈক ভক্তের প্রতি) তার আগে কি?

ভক্ত—'অহংকার বিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে।' (শ্রীমও সঙ্গে সঙ্গে বলিতেছেন)।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—এই দেখুন, গীতায়ও ভগবান বলেছেন,

আমি সব করছি। কিন্তু মানুষগুলো অজ্ঞান থেকে বলছে আমরা সব করছি, আমরা কর্তা।

শ্রীম (অন্তেবাসীর প্রতি)—জন্মের আগের খবর নেই। মৃত্যুর পর কি হবে তারও খবর নেই। শুধু present (বর্তমান) নিয়ে নাচলে কি হবে? সবই তিনি করেন। তাই ঠাকুর নিত্য এই প্রার্থনাটি করতেন, 'মা আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী। আমি রথ তুমি রথী। আমি ঘর তুমি ঘরনী। যেমন চালাও তেমনি চলি। যেমন বলাও তেমনি বলি। যেমন করাও তেমনি করি।' রোজ বলতেন। তিনি দেখতে পেতেন কিনা সব।

দু'দিকেই infinity (অব্যক্ত) মাঝখানে একটু manifestation (ব্যক্ত)। এতেই লোক অত অহংকার করে। মনে করে আমি কর্তা। বলে, আমি ব্যক্তি। ব্যক্তি মানে manifested (প্রকাশিত)।

ইডেন গার্ডেনস-এ স্প্রীং দেখেন নি—জল অনবরত কড়্‌কড়্‌ করে ওপরে উঠছে? আবার পড়ে গঙ্গায় যাচ্ছে। ওখান থেকেই উঠছে আবার ওখানেই যাচ্ছে। মাঝখানে খালি কড়কড়ানি। 'ব্যক্ত মধ্যানি ভারত', কি আছে গীতায়?

(ভক্তসঙ্গে) অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্ত নিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা॥

রমণী আসিয়া ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিলেন।

শ্রীম (রমণীর প্রতি)—আহা, কেন আপনারা এতো কষ্ট করেন? আমার এতে কষ্ট হয়।

বড় জিতেন—আপনি বলে দেওয়ার পর আর আমি এই রকম করি না। হাতেই নমস্কার করি।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের নাতি ঠাকুরকে বলেছিলেন, আমার খুব ইচ্ছা হয় প্রণাম করি ঠাকুরদের। কিন্তু ওরা (বন্ধুরা) পাছে ঠাট্টা করে তাই করি না। ঠাকুর অমনি বললেন, 'বেশ তো কি দরকার? মনে মনে করলেই হলো। বেশ। মনই আসল'। দেখুন, কেমন করে ওর ভাবটি রাখলেন।

শ্রীম (বড় জিতেনের প্রতি)—আবার কারো কারো view (মত) change (বদল) হয় কিনা। দিনকতক খুব ভক্তি করলে, তারপর মত বদলে গেল (হাস্য)। একজন লুচি খাচ্ছিল। চারখানা খেয়েই হাত তুলে বসে রইলো। আর একজন জিজ্ঞাসা করলে, খাচ্ছ না কেন? সে উত্তর করলে, তৈলপক্ব। (শ্রীম ও সকলের উচ্চ হাস্য)।

শ্রীম কাহাকেও পায়ে হাত দিতে দেন না। কেহ ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিলে বলেন, ইহাতে তাঁহার কষ্ট হয়। তিনি অনেকবার ভক্তদের শিখাইয়া দিয়াছেন হাতে প্রণাম করিতে। শ্রীমও সকলকে জোড়হাত করিয়া প্রণাম করেন তাহারা তাঁহাকে প্রণাম করিবার আগে।

ছোট জিতেন প্রবেশ করিলেন। গদাধর আশ্রমে শ্রীমকে না পাইয়া মর্টন স্কুলে আসিয়াছেন।

শ্রীম (ছোট জিতেনের প্রতি)—আপনি তো এখন গদাধর আশ্রম থেকে আসছেন, ললিত মহারাজকে (স্বামী কমলেশ্বরানন্দকে) দেখলেন? আহা, গান শুনে এলেন না কেন, কৃষ্ণমঙ্গল? বড় সুন্দর গান।

শ্রীম (সকলের প্রতি)—এই সব বন্দোবস্ত তিনি করে রেখে দিয়েছেন মানুষের জন্য। এই সব accumulated treasure of the past (অতীতের সঞ্চিত এই সকল সম্পদ) এইভাবে চলে আসছে কতকাল ধরে।

লোকে পরীক্ষায় পাশ টাশ দেয়—শক্তি বটে। কিন্তু এ সব গানে যে মূল গাইয়ে, তার কি তাদের চাইতে কম শক্তি? এরা সিন্‌গুলো visualise (প্রত্যক্ষীভূত) করে দেয়।

একটি সিন্, শ্রীকৃষ্ণ খেয়া দিচ্ছেন যমুনায়। গোপিনীরা পার হয়ে যাচ্ছেন। মাথায় দই দুধ ও মাখনের পসরা। দান চাইছেন। বলছেন, দান দাও। আমি কংস রাজার কাছ থেকে দান দিয়ে নিয়েছি এই ঘাট—পাঁচ লাখ টাকা। গোপিনীরা বললেন আমরা কোনও দিন দান দিই নাই তো—বার বছর ধরে যাতায়াত করছি। শ্রীকৃষ্ণ

উত্তর করলেন, তা হলে বার বছরেরই দান দিতে হবে। ঠকিয়ে গেছ এতদিন। আজ সব দিয়ে তবে যাও। (রাধাকে লক্ষ্য করে) ইনি অনেক দেবেন। শুনেছি ইনি বড় ঘরের মেয়ে—রাজনন্দিনী। 'এঁর সিঁদুরের জন্যে নেবো তিন লাখ টাকা আর চুলের জন্য পাঁচ লাখ।'

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—চুলের জন্য পাঁচ লাখ মানে ভক্তের সবই valuable (মূল্যবান)। শুধু valuable (মূল্যবান) নয়, তার দাম নাই, অমূল্য।

শ্রীম (ছোট জিতেনের প্রতি)—আর একটি সিন্ বৃন্দাবনে। ইন্দ্রের পূজার আয়োজন হচ্ছে। শ্রীকৃষ্ণ বললেন, 'তোমরা নারায়ণের পূজা কর, নারায়ণকে দেখতে পাবে, ইন্দ্রের পূজা তো করছো, কিন্তু তাকে দেখেছ কি কখনও? আজ তোমাদের গোপাল দর্শন করাবো। সকলে দাঁড়াও জোড়হাত করে।' কি করে প্রার্থনা করতে হয় তাও তিনি শেখাচ্ছেন lead (পরিচালন) করে। তিনি সকলের সঙ্গে প্রার্থনা করছেন, 'প্রভো, আমরা সব মূর্খ। আমাদের সাধন নাই, ভজন নাই। আমরা প্রেমহীন, ভক্তিহীন। আমাদের নিজ গুণে দর্শন দাও।' তারপর বালমূর্তিতে গোবর্ধন পাহাড়ের ওপর দর্শন দিলেন। সকলের খুব আহ্লাদ। কিন্তু যশোদা গোলমালে পড়লেন। তিনি একবার ঐ বালগোপালের দিকে চান আর একবার পুত্র কৃষ্ণের দিকে চান।

শ্রীকৃষ্ণ গোপগোপীদের জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমরা যে ইন্দ্রকে পূজা কর, তাকে কখনও দেখেছ কি? দেখ, এইমাত্র নারায়ণকে পূজা করলে তোমরা, আর তিনি তোমাদের বালগোপাল মূর্তিতে দর্শন দিলেন। তোমরা তাঁকে যদি খেতে বল তবে তিনি খাবেনও।' তাদের প্রার্থনায় ভগবান খেতে লাগলেন বালগোপালরূপে। আবার শিখিয়ে দিলেন, বর চাও ভগবানের কাছে। তখন করজোড়ে সকলে প্রার্থনা করছে, 'আমাদের গোপালের যেন কুশল হয়', মানে শ্রীকৃষ্ণের। শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় বললেন, 'এ তো আমার কুশল প্রার্থনা করলে।

তোমাদের যা দরকার তা তো চাইলে না……? তা চাও, চাও এক্ষুণি।' অগত্যা তারা বললো, আমাদের গাভী ও বৎসরা যেন ভাল থাকে, আর তৃণ যেন প্রচুর হয়।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—গোপালের ওপর কি গাঢ় প্রেম। তাঁর কল্যাণ চাইলে সকলে নিজেদের জন্য কিছু না চেয়ে। কি ভালবাসা, কি নির্ভরতা! মানে শ্রীকৃষ্ণ ভাল থাকলে তারাও ভাল থাকবে। তাঁর সঙ্গে একাত্মভাব হয়েছে এই সরল গ্রাম্য গোপগোপীদের। তাই তো তিনি এদের অত উঁচু আসনে বসালেন জগতে। কৃষ্ণগত প্রাণ সকলের।

এদিককার সবও চাইলো। অন্তরে অভাব বোধ আছে। তাই ভগবান অন্তর্যামী শিখিয়ে দিলেন এদিককার সব চাইতে। ঈশ্বরের কাছে চাইবে না তো কার কাছে চাইবে?

ভক্তগণ বিদায় লইলেন।

শ্রীমর পৌত্রী শোভা অসুস্থ। নয় দশ বছরের মেয়ে, বড়ই কষ্ট পাইতেছে। ডাক্তার বক্সীর সঙ্গে তাহার সম্বন্ধে পরামর্শ করিতেছেন। তারপর বলিলেন, গৃহে থাকতে গেলেই এই সব ঝঞ্ঝাট আছে। মিহিজামে বেশ থাকা গিছলো। শরীর ভাল ছিল। এখনকার এই কাশিটা ছিল না। ভবানীপুরেও বেশ থাকা যাচ্ছে। এই মেয়েটীর অসুখে ভাবিত করে তুলেছে।

শ্রীম ঠাকুরবাড়ী চলিলেন। এখন রাত্রি দশটা।

পরদিন ৬ই ফেব্রুয়ারী। শ্রীম সন্ধ্যার সময় মর্টন স্কুলে ভক্তসঙ্গে অল্পক্ষণ ধ্যান করিয়াই ঠাকুরবাড়ী চলিয়া গেলেন। পরিবারের সকলে ওখানে রহিয়াছেন। পৌত্রীর অসুখ বাড়িয়াছে। শ্রীম খুব উদ্বিগ্ন। বড় জিতেন, দুর্গাপদ, ডাক্তার, বিনয়, জগবন্ধু প্রভৃতি শ্রীমর অপেক্ষায় বসিয়া আছেন। রাত্রি দশটার পর তিনি ফিরিয়া আসিলেন। ভক্তরা সকলে প্রণাম করিয়া বিদায় লইলেন। একটি মাত্র ভক্ত শ্রীমর কাছে রহিয়াছেন। ইনি তিনতলার কোণের ঘরে শ্রীমর জন্য মশারী খাটাইতেছেন। শ্রীম বিছানায় বসা।

শ্রীম (ভক্তের প্রতি)—আমার বিপদের কথায় ঠাকুর ছোকরাদের বলতেন, এর যে এই সব বিপদ হচ্ছে তোদের শিক্ষার জন্য—যারা বিয়ে করিস নি। এখন যে আমার এই সব বিপদ হচ্ছে এও আপনাদের শিক্ষার জন্য। উঃ, কি মুস্কিল! তাই বিয়ে করতে নেই। যারা না করে থাকতে পারে তাদের সাধ করে এই অনলে ঝাঁপ দিতে নেই। জ্বলন্ত অনল সংসার।

আজ মহাত্মা গান্ধীর কারামুক্তির জন্য কলিকাতার সব স্কুল কলেজ বারটায় ছুটি হইয়া গিয়াছে। মর্টন স্কুলও বন্ধ।

রাত্রি প্রায় পৌনে এগারটার সময় শ্রীম দুই একজন ভক্তের সঙ্গে দোতলার বারান্দায় বসিয়া আছেন। নাতনীর অসুখের ভাবনা চলিতেছে। এ-কথা সে-কথার পর বলিতেছেন, ছেলেমেয়েদের অত অসুখ বিসুখ যে হয় আমাদের দেশে, সবই প্রায় বাপ মার দোষে হয়। তারা জানে না কি করে সন্তান পালন করতে হয়। যারা জানে তারাও neglect (অবহেলা) করে। সেনসাস্ বেরিয়েছে, এখানে থারটি পারসেণ্ট (শতকরা ত্রিশ জন) ছেলেপুলে মারা যায়। এর কারণ কর্তৃপক্ষ বলেন, এখানকার মা বাপ ছেলেদের পালন করতে জানে না।

৩

৭ই ফেব্রুয়ারী বেলুড় মঠে ব্রহ্মানন্দ-মন্দির প্রতিষ্ঠা উৎসব। ভক্তগণ সারাদিন কাজ করিয়াছেন, মঠেই রাত্রিবাসও করিলেন।

পরদিন রাত্রি নয়টায় শ্রীম ঠাকুরবাড়ী হইতে ফিরিতেছেন শোভাকে দেখিয়া। খুব ক্লান্ত হইয়া দোতলার বসিবার ঘরে আসিয়া বসিয়াছেন। বড় জিতেন, রমণী, বলাই, জগবন্ধু প্রভৃতি এতক্ষণ শ্রীমর প্রতীক্ষায় ছিলেন।

আগামী কাল কলিকাতার প্রায় সব স্কুল কলেজে সরস্বতী পূজা হইবে। মর্টন স্কুলেও ছেলেরা রাত্রি জাগিয়া সব আয়োজন করিতেছে। শ্রীমর নিকট আনন্দ ও নিরানন্দ উভয়ই উপস্থিত।

ছেলেদের পূজার আনন্দে আনন্দ, পৌত্রীর অসুখে নিরানন্দ। শ্রীম উহাই প্রকাশ করিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—সমাধি মানে মনকে concentrate (একাগ্র) করে এক বিন্দুতে আনা—যার length (দৈর্ঘ্য) নাই, breadth (প্রস্থ) নাই, thicknessও (স্থূলত্ব) নাই। আর extended (প্রসারিত) হতে না দেওয়া। দ্বন্দ্বাতীত অবস্থা। সে অবস্থাকেই কেউ কেউ বলেছেন, 'আর খবর দিলে না—নুনের পুতুল সমুদ্র মাপতে গিছলো, আর ফিরে এলো না।' কেউ বা বলে, 'নিত্য কৃষ্ণদাস' হয়ে থাকা।

দেহ ধারণ করলে মেঘ উঠবেই। দুঃখ কষ্ট এ থাকবেই। অবতারগণ তাই দেখিয়ে গেছেন। যদুবংশ ধ্বংস হয়ে গেল চোখের সামনে—শ্রীকৃষ্ণ দাঁড়িয়ে দেখছেন। আগে থাকতেই জানতেন এই পরিণাম, তাই ready (প্রস্তুত) ছিলেন।

নিজের কথাও জানতেন। অশ্বত্থ বৃক্ষের ডালে বসে আছেন, পা ঝুলছে। হরিণ ভ্রমে হঠাৎ ব্যাধের তীরে পা বিদ্ধ হলো। তাতেই দেহ গেল। ক্রাইস্টের crucifiction (ক্রুসে বিদ্ধ) হলো। অবতারগণ এসে দেখিয়ে গেছেন এ সব থাকবেই। Don't murmur: no more murmuring (বকবক করো না, বকবকানী বন্ধ কর)। দুঃখ কষ্ট থাকবেই। এতে কি লোকের কম লাভ হচ্ছে? চৈতন্য করিয়ে দিচ্ছে। কত বড় উপকার! এতে seeking for the eternal lifeএর (অমৃতত্ব লাভের) সন্ধান দিচ্ছে। অমৃতত্বে নিয়ে যাচ্ছে। সমাধিস্থ না হলে এর হাত থেকে নিস্তার নাই।

বড় জিতেন—সমাধি থেকে ফিরে এলেও কি আবার দুঃখকষ্টের ভিতর পড়তে হয়?

শ্রীম—তা আর নয়! দেহ থাকলে এ হবেই। দেখুন না, ঠাকুরের গলায় ঘা। এক বছর ধরে কি কষ্ট পেলেন। বলতেন, 'মা বড্ড লাগছে'। ঠিক যেন বালক।

সমাধির পর ফিরে আসেন কেউ কেউ লোকশিক্ষার জন্য।

রামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, ক্রাইস্ট, চৈতন্য, ঠাকুর, এঁরা সব লোকশিক্ষার জন্য ফিরে এসেছিলেন। অবতারাদি এসে যে ছোটাছুটি করেন তাঁদের নিজের জন্য নয়, জগতের জন্য। To teach the truth of religion (সত্য ধর্ম শিক্ষা দিতে) তাঁরা আসেন।

শ্রীম (বড় জিতেনের প্রতি)—আজ অম্বিকা মজুমদারের ছেলের সঙ্গে আলাপ হল তিন চার ঘণ্টা। ওঁর পিতার দেহত্যাগের কথা বললেন। শেষ সময়ে এমনি করে (যুক্ত করে) 'তারা ব্রহ্মময়ী' বলে ছেলের কোলে হাত তুলে দিলেন। আহা, কি চমৎকার মৃত্যু! ইনি কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট হয়েছিলেন।

আমহার্স্ট স্ট্রীটের আশেপাশে বাজনা চলিতেছে। স্কুল কলেজের ছাত্ররা আগামী কাল সরস্বতী পুজা করিবে।

শ্রীম (রমণীর প্রতি)—গান না, বাজনার accompanimentএ (সঙ্গে সঙ্গে)।

শ্রীম নিজেই ভাবোন্মত্ত হইয়া গান গাহিতে লাগিলেন।

গান। অন্তরে জাগিছ গো মা অন্তরযামিনী,
কোলে করে আছ মোরে দিবস রজনী।
অধম সুতের প্রতি কেন এত স্নেহপ্রীতি,
প্রেমে আহা, একেবারে যেন পাগলিনী॥
কখনও আদর করি, কখনও সবলে ধরি
পিয়াও অমৃত, শুনাও সুমধুর কাহিনী।
নিরবধি অবিচারে, কত ভালবাস মোরে,
উদ্ধারিছ বারে বারে পতিতোদ্ধারিণী॥
বুঝেছি এবার সার, মা আমার আমি মার,
চলিব সুপথে সদা শুনি তব বাণী।
করি মাতৃস্তন্য পান, হব বীর বলবান্;
আনন্দে গাহিব জয় ব্রহ্মসনাতনী॥

গান। সকলি তোমার ইচ্ছা ইচ্ছাময়ী তারা তুমি,
তোমার কর্ম তুমি কর মা লোকে বলে করি আমি।

পঙ্কে বদ্ধ কর করী, পঙ্গুকে লঙ্ঘাও গিরি
কারে দাও মা ব্রহ্মপদ কারে কর অধোগামী।
আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী, আমি ঘর তুমি ঘরণী,
আমি রথ তুমি রথী, যেমন চালাও তেমনি চলি॥

শ্রীম আজ ভাবে পরিপূর্ণ হইয়া গান গাহিতেছেন। প্রত্যেকটি শব্দ প্রগাঢ় প্রেমরস-সিঞ্চিত। হৃদয়ের দ্বার বুঝি খুলিয়া গিয়াছে। মায়ের পূজার আনন্দ আর পৌত্রীর অসুখজনিত পারিবারিক নিরানন্দ, এই দ্বন্দ্বে পড়িয়া কি তিনি দ্বন্দ্বাতীত স্থানে আরোহণ করিলেন? ভক্তগণ মুগ্ধ হইয়া এই প্রেমরস পান করিতে লাগিলেন।

গান শেষ হইয়া গেল, কিন্তু সকলে নীরব। পুনরায় শ্রীমর মুখনির্ঝর হইতে অমৃতরস ক্ষরিত হইতে লাগিল।

শ্রীম (আবেগভরে ভক্তদের প্রতি)—পঁচিশ টাকা মাইনের কেরানী। একজন এসে বললে, 'ওগো তোমার আর আফিসে যেতে হবে না। তুমি যে রাজার ছেলে'। ভাল করে বুঝিয়ে বলায় আর আফিসে গেল না। সাহেবকেও আর খবর দিলে না। সেভিং ব্যাঙ্কে, দু' এক টাকা বাঁচিয়ে মাসে মাসে জমা দিত। এখন তারও আর খবর করলে না। রাজার ছেলে যে! অত দিন ভুলে ছিল। এখন খবর পেয়েছে। কে যায় পঁচিশ টাকা মাইনের কাজ করতে? পূর্বের সব পড়ে রইল।

অম্বিকাবাবু শেষ সময়ে বুঝেছেন আমি এখানকার লোক নই। তাই 'তারা ব্রহ্মময়ী' বলে তাঁর কোলে আশ্রয় নিলেন। জীবনে একবারও ঈশ্বরের নাম নেন নাই। কিন্তু শেষের দিকে কিসে শান্তি হয় তাই খুঁজতেন। কংগ্রেসম্যান ছিলেন। একবার প্রেসিডেণ্টও হয়েছিলেন। বড় বক্তা ছিলেন, আর বড় উকীল।

সম্মুখের পল্লী ঝামাপুকুর। ওখানে খুব বাজনা হইতেছে। শ্রীমর কথামৃত পানে ভক্তরা মুগ্ধ। ও সব শব্দ কানে যাইতেছে না। কিন্তু শ্রীমর সব দিকে দৃষ্টি। শ্রীম বলিলেন, জগবন্ধুবাবু, একবার দেখুন না কিসের বাজনা! ছেলেমানুষের মত হন না একটু। শ্রীম

হাসিতেছেন। ভক্তরা বারান্দায় গিয়া বাজনা শুনিয়া আবার গৃহে আসিলেন। অতি সুন্দর বাজনা।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—এই আনন্দ। তার ভিতর রোগ-শোক দুঃখ, তাও আছে। A house of rejoicing, আবার a house of mourning, দুইই আছে। এত সব অত্যাচারের ভেতর রোগ শোক হবে বৈকি? আবার আনন্দও আছে।

মেঘ উঠবেই। কাল যেই ভবানীপুরের গানের কথা মনে হল, অমনি চলে গেলাম। বরাবর গিয়ে দশ মিনিট শুনলাম। তারপর ভেঙ্গে গেল।

আহা, কি কথাই শুনেছি। অক্রুর বলছেন—ভক্ত কিনা তিনি, দুর্দিন কি মেঘ উঠলেই হয়? একে দুর্দিন বলে না। যেদিন সাধুসঙ্গ না হয়, যেদিন তাঁর কথা না হয়, সে দিন দুর্দিন।

তা গানে তাঁর কথা শুনলাম। আবার মঠে। (গদাধর আশ্রমে) গিয়ে সাধুসঙ্গ হল। আবার ভাগবত পাঠও হলো। তাও শোনা গেল।

ভক্তরা অনেকেই আজ স্কুলবাড়ীতে রহিয়াছেন, রাত্রিবাস করিতেছেন। রাত্রি তখন তিনটা। শ্রীম একটি কম্বল ও একটি মাদুর লইয়া দোতলায় আসিলেন। ভক্তদের হাতে উহা দিলেন। শীতকাল।

পরদিন মর্টন স্কুলে সরস্বতী পূজা। আজ ছাব্বিশ দণ্ড, দশ পল, ত্রিশ অনুপল, পঞ্চমী। শ্রীম পূজা দর্শন করিতেছেন। ভক্তরাও অনেকে আসিয়া পূজা দর্শন করিতেছেন। বড় জিতেন ছেলেদের লইয়া আসিয়াছেন, অঞ্জলি দিবেন। অমৃত, জগবন্ধু, বিনয়, ছোট রমেশ, শ্রীমর সহিত দেবীকে অঞ্জলি প্রদান করিলেন। ডাক্তার, ললিত (উকীল), রমণী; ছোট নলিনী, ছোট জিতেন, বলাই প্রভৃতি আসিয়া পরে উৎসবে যোগদান করিলেন।

তার পরদিন ১০ই ফেব্রুয়ারী রবিবার। সকালে উঠানে বাদ্যকররা বাজনা বাজাইতেছে নানা রঙ্গে। ইহাদের সঙ্গে যাহা কথা ছিল তাহা রক্ষা করিতে পারে নাই। ইহারা প্রতারণা করিয়াছে। শ্রীম আসিয়া বাজনা বন্ধ করিয়া দিলেন। প্রতারকের সহিত কোন

সম্পর্ক রাখিবেন না। তীব্রস্বরে দারোয়ানকে বলিলেন, এদের বাইরে যেতে বল। এখানে বাজনা হবে না।

আজ ভাসান। অপরাহ্ন পৌনে ছয়টাতে ছেলেরা প্রতিমা গঙ্গায় লইয়া যাইতেছে বিসর্জন করিবে।

শ্রীম দোতলায় বসিয়া আছেন। ভক্তরাও কাছে বসা। ভবানীপুর হইতে সতীশ আসিয়াছে। সে কলেজে পড়ে। গদাধর আশ্রমে থাকে। তাহার সাধু-ভক্তি ও সাধু-সেবার সুখ্যাতি করিতেছেন। তাহার পিতা কর্তৃপক্ষের অনুমতি লইয়া তাহাকে গদাধর আশ্রমে রাখিয়াছেন। শ্রীম বলিলেন, হাঁড়ির একটা ভাত টিপলে সব বোঝা যায়। সব ভাত টেপার দরকার নাই। দেখ না, বাপ কত কাণ্ড করে ছেলেকে সাধু-সঙ্গে রেখেছেন। সর্বদা সাধু-সেবা করছে। বাপও সাধু, নইলে কি আর সাধুদের চিনতে পারেন!

দোতলার পশ্চিমের ঘরে বসিয়া শ্রীম শান্তিজল লইতেছেন। ভাসান হইতে ছেলেরা ফিরিয়াছে। শুকলাল, ডাক্তার, বিনয়, জগবন্ধু, বড় অমূল্য ও ছাত্ররা শ্রীমর সঙ্গে বসা।

মর্টন স্কুল, কলিকাতা। ১০ই ফেব্রুয়ারী, ১৯২৪ খ্রীঃ
২৭শে মাঘ ১৩৩০ সাল, রবিবার শুক্লা ষষ্ঠী।

সপ্তদশ অধ্যায়

ধ্যানমগ্ন শ্রীম

১

সন্ধ্যা হইয়াছে। মর্টন স্কুলের তিনতলার উত্তর কোণের ঘ বসিয়া শ্রীম ধ্যান করিতেছেন, উত্তরাস্য। ঘরে সদানন্দ বসি আছেন। বিনয় ও জগবন্ধু প্রবেশ করিয়া পশ্চিমের বেঞ্চি বসিলেন। প্রায় দেড় ঘন্টা পর শ্রীম ভক্তদের সঙ্গে লইয়া দোতল

ঘরে আসিয়াছেন। রমণী, ছোট জিতেন প্রভৃতি ইতিমধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীম কথামৃত পাঠ করিতে বলিলেন। জগবন্ধু তৃতীয় ভাগ অষ্টম খণ্ড পড়িতেছেন।

আজ ১১ই ফেব্রুয়ারী, ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দ, ২৮শে মাঘ ১৩৩০ সাল, সোমবার, সপ্তমী তিথি।

পাঠক (পড়িতেছেন)—শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন—'তাঁকে কিন্তু দর্শন করলে সব সংশয় দূর হয়।...ঈশ্বর দর্শন করলে কর্ম ত্যাগ হয়। আমার ঐ রকমে পূজা উঠে গেল। কালীঘরে পূজা করতাম। হঠাৎ দেখিয়ে দিলেন সব চিন্ময়—কোশাকুশী, বেদী, ঘরের চৌকাঠ, সব চিন্ময়। মানুষ, জীবজন্তু—সব চিন্ময়।...দেখিয়ে দিলেন বিরাট মূর্তিই শিব।...ফুলের গাছগুলি যেন এক একটি ফুলের তোড়া'।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—ঈশ্বরদর্শনের testএর (পরখের) কথা কেন বললেন, বল দেখি?

শ্রীম (নিজেই উত্তর করিলেন)—পাছে ভক্তরা মনে করে আমাদের হয়ে গেছে, তাই বললেন।

পাঠক (পড়িতেছেন)—

নরেন্দ্র বলিলেন, আমি নাস্তিকমত পড়ছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ—দুটি আছে—অস্তি আর নাস্তি। অস্তিটাই তুমি নাও না কেন?

শ্রীম—আহা, নরেন্দ্র বিপদে পড়ে একেবারে নাস্তিক হয়ে গেছে। মায়ার কাণ্ড এমনি।

পাঠক (পড়িতেছেন)—শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন—...ভীষ্মদেব শরশয্যায় শুয়ে... কাঁদছেন। জিজ্ঞাসা করায় ভীষ্মদেব বললেন ...আমি এর জন্য কাঁদছি যে, সঙ্গে সাক্ষাৎ নারায়ণ ফিরছেন, কিন্তু পাণ্ডবদের বিপদের শেষ নেই।'

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—ভীষ্মদেবের গল্প দ্বারা ঠাকুর এই কথা বললেন, 'আমি নরেন্দ্রের সঙ্গে থাকা সত্ত্বেও কেন এই বিপদ, দুঃখ কষ্ট?' কি করা যায়? মায়ার রাজ্য। দেহ ধারণ করলে

এসব থাকবেই। (জনৈক ভক্তের প্রতি)—বুঝলেন দেহ ধারণ করলে এসব থাকবেই।

শ্রীম জনে জনে ভক্তদের এই মহা সত্যটি শুনাইতেছেন। ডাক্তার গৃহে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকেও বলিলেন, শুনছেন ডাক্তারবাবু, দেহ ধারণ করলে দুঃখকষ্টের হাত থেকে নিস্তার নাই।

শ্রীম কি ভক্তদের দুঃখকষ্ট সহ্য করিবার জন্য প্রস্তুত করিতেছেন? রমণী ও ছোট জিতেন আহার করিতে উঠিয়া গেলেন।

এখন রাত্রি নয়টা।

শ্রীম (পাঠকের প্রতি)—এটা আবার পড়ুন তো?

পাঠক আবার পড়িলেন তৃতীয় অধ্যায়। নরেন্দ্রের দুঃখ। দেহ ধারণ করিলে সুখদুঃখ অনিবার্য।

পাঠ বন্ধ রহিল। শ্রীম মত্ত হইয়া গান গাহিতে লাগিলেন।

গান। আমায় দে মা পাগল করে আর কাজ নাই জ্ঞান বিচারে।
তোমার প্রেমের সুরা, পানে করাও মাতোয়ারা,
ও মা ভক্ত-চিত্ত-হরা, ডুবাও প্রেম-সাগরে।
তোমার এ পাগলা গারদে, কেহ হাসে কেহ কাঁদে,
কেহ নাচে আনন্দভরে;
ঈশা মুশা চৈতন্য, ও মা প্রেমের ভরে অচৈতন্য,
হায় কবে হব মা ধন্য, মিশে তার ভিতরে।
স্বর্গেতে পাগলের মেলা, যেমন গুরু তেমনি চেলা,
প্রেমের খেলা কে বুঝতে পারে,
তুমি প্রেমে উন্মাদিনী, ওমা পাগলের শিরোমণি,
প্রেমধনে কর মা ধনী, কাঙ্গাল প্রেমদাসেরে।

গান। চিদানন্দ সিন্ধুনীরে উঠিল প্রেমানন্দের লহরী। ইত্যাদি

গান। টুটল ভরম ভীতি—ইত্যাদি।

শ্রীম আহার করিয়া নামিলেন। কথাবার্তা হইতেছে।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—আচ্ছা, কি খেলে আর রান্না করতে হয় না? এ বড়ই হাঙ্গাম—রান্নাবান্না। দুধ, রুটি, ফল এগুলি কিনে

খেলে হতে পারে। দেখুন না, রান্না নিয়ে সারাটা দিন ভাবনা। এ নিয়েই গৃহ। রান্না আর খাওয়া, সারা দিন রাত ঐ চলছে। তা হলে তাঁকে ডাকবার সময় হবে কি করে? আর তা ছাড়া অত খেয়ে অসুখ হয়। এমন খাদ্য খাওয়া যাতে শরীরের পুষ্টি হয়, স্বাস্থ্য ভাল থাকে। আর সেই শরীরে শ্রীভগবানের ভজনা করা। কিন্তু মানুষ কি তা করে? উদ্দেশ্য ভুলে যায়। রান্না খাওয়াই উদ্দেশ্য হয়ে পড়ে।

বিনয় আজ কিছু আহার করেন নাই। বাড়ীতে রাগ করিয়াছেন। শ্রীম ডাক্তারবাবুর কাছে এই সংবাদ ইতিপূর্বে শুনিয়াছেন। এ কথা সে কথা হইতেছে। হঠাৎ রহস্য করিয়া ডাক্তারবাবুকে বলিলেন, হাঁ, ডাক্তারবাবু, বিনয়বাবু বুঝি আজ ষষ্ঠীর উপোস করলেন? (সকলের হাস্য)

মণি আসিয়াছেন। অভাবে ও মোকদ্দমায় পড়িয়া তাঁহার মাথা কিছু গরম হইয়াছে। গৃহে প্রবেশ করিয়াই বকিতেছেন, 'জিতেনবাবু, গ্রামোফোনের সাউণ্ড বক্স্‌টা বদলিয়ে নিয়ে আসুন। বাজাতে হবে।' ইত্যাদি অসংলগ্ন বাক্য সব। শ্রীম তাঁহাকে কাছে বসাইয়া সস্নেহে কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (মণির প্রতি)—আপনি মেয়েদের ও রকম করে বাইরে পাঠাবেন না। রাস্তায় গাড়ী, মোটর চলে। বিপদ হতে পারে। তারপর kidnapping (মানুষ চুরি) আছে।

মণি তাঁহার দশ বৎসর বয়স্কা একটি মেয়েকে দোকানে খাবার কিনিতে পাঠান।

জনৈক ভক্ত (শ্রীমর প্রতি)—বিপিন জামাইয়ের এক বছর বয়স্ক নাতিকে চুরি করে নিয়ে গেছে।

শ্রীম (মণির প্রতি)—ঐ শুনুন। ছেলেটিকে চোরে নিয়ে গেছে।

মণি—আমি পাঠাই যখন কিছু দরকার হয়। ছেলেরা নাই এখানে, আর আমিও বাড়ীতে থাকি না। আমি বলে দিয়েছি যাবার সময় রাস্তায় 'দাদা মধুসূদন' বলে যাবি।

শ্রীম—তা বললে কি হয়? ঠাকুরের একটি গল্প আছে। তিন

বন্ধুতে মিলে রাস্তায় চলছে। হঠাৎ একটা বাঘ এসে পড়লো সামনে, একজন বললে, চল পালাই। আর একজন বললে, তা কেন? চল ঈশ্বরকে ডাকি। আর একজন বললে, না, চল গাছে উঠি। তিনি তো আমাদের হাত পা দিয়েছেন। মন বুদ্ধি দিয়েছেন। তার ব্যবহার করা যাক। মিছিমিছি তাঁকে কেন কষ্ট দেওয়া?

তেমনি, যতক্ষণ শক্তি আছে ততক্ষণ তার প্রয়োগ করা উচিত। শক্তির অভাব হলে তখন তাঁর উপর ভার দিতে হয়।

মণি (অসংলগ্ন ভাবে)—এই সাইড্‌টার সম্বন্ধে খেয়াল ছিল না। এটা new development, new pulsation (নূতন দিক, নূতন অভিজ্ঞতা)।

মণি (শ্রীমর প্রতি)—ঠাকুরের ঐ গল্পটিও আছে। মা লক্ষ্মী পদসেবা করছিলেন। ধোপী ভক্তকে মারতে এসেছে দেখে নারায়ণ হঠাৎ উঠে পড়লেন। ভক্তকে রক্ষা করতে বের হয়ে গেলেন।

শ্রীম—তা আছে। কিন্তু কার জন্য? যে তাঁর চিন্তায় বিভোর। অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাম্ যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে। তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥

মণি—তেমন যদি কারো হয় তবে সে পারে। আমার মনে হয় আমার সে অবস্থা হয়েছে। যে কাজেই যাই, যা করি, আপনার কথা মনে পড়ে। তা হলে আমার ঐ অবস্থা হয় নাই কি করে বলা যায়?

শ্রীম (সস্নেহে)—যাদের অন্য কাজ শেষ হয়ে গেছে, তাঁকে ডাকা ভিন্ন আর কাজ নাই, এমন যে ভক্ত তাদের জন্য ঐ ব্যবস্থা। ভগবানে একান্ত নির্ভরশীলের জন্য ঐ কথা।

মণি—আমি মনে করি, আমার নিশ্চয় ঐ অবস্থা লাভ হয়েছে।

শ্রীম—তা বেশ! আপনি দয়া করে মেয়েদের আর দোকানে পাঠাবেন না। আমাদের অনুরোধ।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—ঠাকুর অধর সেনকে বলেছিলেন, 'কেন, পালকীতে চড়লে হয় না? বিদ্যাসাগর পালকী চড়ে।' অধরবাবু এর আগেও আর একবার ঘোড়া থেকে পড়ে গিছলেন। তখন

বলেছিলেন এই কথা। কিন্তু শুনলেন না। দ্বিতীয়বার ঘোড়া থেকে পড়ে হাত ভাঙলো। তাতেই দেহ যায়। দেহত্যাগের সংবাদ শুনে বলেছিলেন, 'ঈশ্বর কয়বার সাবধান করবেন? তিনি কি একশ'বার বলবেন?' এই বলেই কাঁদতে লাগলেন অধরবাবুর শোকে।

শ্রীম (মণির প্রতি)—এই যে সাবধান করা হচ্ছে তা তিনিই করছেন। তা ছাড়া মেয়েদের দোকানে পাঠালে লজ্জাহীনা হয়ে যায়।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—একটি ভক্তের স্ত্রীর বায়ুর রোগ ছিল। বাইশ তেইশ বছরের ছোক্‌রারা তাঁকে দেখতে যেতো। রোগিণীর বিছানার চারপাশে বসতো। ঠাকুর শুনে ঐ ভক্তকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি নাকি এদের ভিতর বাড়ীতে নিয়ে যাও? তোমার পরিবারের কাছে নাকি ওরা সব বসে? তুমি কি মনে কর সকলেই আমার মত? আমার যে কাম নাই, একি আর আমার সাধ্য? মা টেনে রেখেছেন। বল, আর এমন করবে না?' ভক্তটিকে প্রতিজ্ঞা করিয়ে ছাড়লেন। অন্তর্বাটী বহির্বাটী করেছেন কেন? খুব মহৎ লোকেরা, ঋষিরা এ ব্যবস্থা করেছেন।

সেই ভক্তের একটি মেয়ে, বয়স তার আট নয় বছর। কাশীপুর বাগানে গেছে। উপরে গিয়ে সে ঠাকুরকে একটি গান শুনিয়েছিল। নিচে নরেন্দ্ররা ছিলেন। ওঁরাও তার গান শুনলেন নিচের ঘরে বসে। খানিক বাদে ঠাকুর সেই ভক্তটিকে উপরে ডাকিয়ে নিয়ে তিরস্কার করলেন। বললেন, 'আমার সামনে গান গায় বলে কি সকলের সামনেই গাইতে হবে? তা হলে যে লজ্জা চলে যাবে। স্ত্রীলোকের লজ্জা গেলে রইলো কি?'

শ্রীম (মণির প্রতি)—দেখুন কি কথা। 'স্ত্রীলোকের লজ্জা গেলে রইলো কি?'

মণি—আমি যখন দক্ষিণেশ্বরে যাই তখন খুব কাঁদি। আমি বোধ হয় ঠাকুরের দলের কেউ ছিলাম—ঈশান মুখুয্যে, কি অধর সেন, কিম্বা হাজরা। দেনার জন্য জন্মেছি আবার। কেশব সেনও হতে পারি। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গেই আমার জন্ম। কিন্তু তাঁর তো দেনা ছিল না।

আমার একজন বেনে বন্ধু আছে। সে বলেছে, বিশ পঁচিশ হাজার যা লাগে, মেয়ে তিনটির বিয়েতে সে সব খরচা করবে। ছেলে একটিকে ভাইয়ের শ্বশুর পুষ্যি নেবে বলেছেন। আর বাবার লেখা কতকগুলি বই আছে সেগুলি বেলুড় মঠে দিয়ে দেব।

আমি চারশ' বছর আগে কি ছিলাম বলতে পারি (চৈতন্য অবতারে)। এই রামকৃষ্ণাবতারে কে ছিলাম তা তো এইমাত্র বললুম।

মণি এইরূপে অনর্গল অসংলগ্ন সব কথা,বলিয়া যাইতে লাগিলেন। শ্রীম সস্নেহে পুনরায় তাঁহাকে বলিলেন, আমাদের একান্ত অনুরোধ, মেয়েকে বাইরে আসতে দেবেন না।

ভক্তরা বিদায় লইলেন। শ্রীম অন্তেবাসীর সঙ্গে তিনতলায় আরোহণ করিতেছেন। বলিলেন, বড্ড neglect (অবহেলা) করেন ছেলেমেয়েদের। দুইটি যুবক ভক্তের কথায় সহাস্যে বলিতেছেন, Two blacks cannot make a white (দুটি কালো মিলে কখনও একটি সাদা হতে পারে না)। প্রকৃতি কি বদলায় সহজে ?

২

শ্রীম ধ্যানমগ্ন, বিভোর। অসময়ে ধ্যান। অপরাহ্ণ সাড়ে পাঁচটা থেকে সাড়ে সাতটা। বাহ্যজ্ঞান শূন্য। মুখমণ্ডল প্রশান্ত গম্ভীর। চারতলার ঘরে বসিয়াছেন—বিছানায় পশ্চিমাস্য।

পারটিশানের অপর দিকে একটি যুবক বসিয়া আছেন। এই দৃশ্য দেখিতেছেন। তাঁহার হাতে একখানা সাপ্তাহিক সারভেন্ট (Weekly Servant) শ্রীমর জন্য আনিয়াছেন।

আজ সংক্রান্তি। ১২ই ফেব্রুয়ারী ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দ, ২৯শে মাঘ ১৩৩০ সাল, মঙ্গলবার।

শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম পার্ষদ স্বামী সুবোধানন্দজী (খোকা মহারাজ) আসিয়াছেন। ঠাকুর তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, 'মাস্টারের কাছে যাবে।' বৃদ্ধ বয়সেও তিনি ঐ গুরুবাক্য পালন করেন। মাঝে মাঝে শ্রীমকে দেখিতে আসেন। যুবক ভক্ত তাঁহাকে লইয়া গিয়া

দোতলায় বসাইলেন। শ্রীমর শিক্ষামত তিনি স্বামীজীর পূজা করিলেন। উপকরণ : এক বোতল সোডা ওয়াটার, বড় রসগোল্লা দু'টি, হাওয়া গাড়ী সিগারেট একটি আর একটি দেশলাই। সর্বদাই ইনি এই উপকরণে পূজিত হন এইখানে। মাঝে মাঝে কয়েকবার চেষ্টা করিলেন যুবক, শ্রীমকে সংবাদ দিতে। কিন্তু শ্রীম বাহ্যজ্ঞানশূন্য। স্বামীজী বারণ করিলেন ধ্যানে বিঘ্ন করিতে। তিনি বিদায় লইলেন।

সাড়ে সাতটায় শ্রীমর ধ্যানভঙ্গ হইল। মৃদু মধুর কণ্ঠে ভগবানের নাম করিতেছেন। এখনও চক্ষু নিমীলিত।

শ্রীম আবৃত্তি করিতেছেন—জয় গোবিন্দ, জয় গোবিন্দ, জয় গোবিন্দ। জয় বংশীবট, জয় যমুনা। জয় শ্যামকুণ্ড, জয় রাধাকুণ্ড, জয় গোবর্ধন। জয় রাধে, জয় রাধে, জয় রাধে। জয় গোবিন্দ, জয় গোবিন্দ, জয় বৃন্দাবন।

জয় গঙ্গা, যমুনা সরস্বতী। জয় গোদাবরী, সিন্ধু, কাবেরী। জয় গায়ত্রী। জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু।

জয় কেদারবদ্রী। জয় জগন্নাথ। জয় রামেশ্বর। জয় দ্বারকা। জয় বিশ্বনাথ। জয় মীনাক্ষী। জয় শ্রীরঙ্গনাথ। জয় অযোধ্যা, জয় নবদ্বীপ। জয় কামারপুকুর। জয় জয়রামবাটি। জয় দক্ষিণেশ্বর। জয় বেলুড় মঠ। জয় কাশীপুর, জয় কাশীপুর।

জয় ভৃগু বশিষ্ঠ ব্যাস। জয় ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব। জয় ব্রহ্ম, জয় ব্রহ্ম, জয় ব্রহ্ম। মা ব্রহ্মময়ী, মা ব্রহ্মময়ী, মা ব্রহ্মময়ী। গুরুদেব, গুরুদেব, গুরুদেব।

(সুরসংযোগে) ত্বমাদিদেবঃ পুরুষ পুরাণস্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্য চ পরং চ ধাম ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ ॥
জয় ভক্ত ভাগবত ভগবান ॥

শ্রীম দোতলায় নামিয়াছেন। বারান্দায় বেঞ্চিতে বসিয়া দুই একটি নবাগত ভক্তের সঙ্গে কথা কহিতেছেন। একটু পর সামনের বসিবার ঘরে প্রবেশ করিলেন। বড় জিতেন, জগবন্ধু প্রভৃতি সেখানে বসা। মাখন আসিলেন। তিনি নানা অবান্তর কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (মাখনের প্রতি)—ঠাকুরের একটি গল্প আছে। দুই বন্ধু বেড়াতে গেল। একজন গেল বেশ্যালয়ে, আর একজন বসে ভাগবত শুনছে। মরণের পর—যে গেল বেশ্যালয়ে তার গতি হলো বৈকুণ্ঠে। অন্যজন গেল নরকে। এর মানে হল, মনই সব করে। মন যেখানে তুমিও সেখানে।

তীর্থ দর্শন, কারো কারো এমনি আছে যে মনেই সব দেখতে পায়। Realise (অনুভব) করতে পারে। প্রত্যক্ষ করলে যেমন দেখে মনেতেও তেমনি হয়।

বড় জিতেন—মনে তেমন vivid (জীবন্ত) হয়, দেখলে যেমন হয়?

শ্রীম—হাঁ তা হয়। তবে, সংস্কার থাকলে হয়। সকলের কি হয়? কেউ কেউ বদ্রীনাথে গিয়েও পাথরের ঢেলা দেখছে কেউ অন্যরূপ দেখছে?

যোগীদের ঐ অবস্থা হয়। যোগীরা আগে লোক পরখ করতেন ঐ করে। ধ্যানট্যান করতে বলতেন। কেউ কেউ ধ্যান করতে বসে চোখের সামনে সব দেখতে পাচ্ছে জীবন্ত, যাঁর ধ্যান করছে। কারো মন বসে না—এদিক ওদিক যাচ্ছে।

মাখন—স্থানমাহাত্ম্য তো রয়েছে, তীর্থের প্রয়োজনীয়তাও রয়েছে। নয় কি?

শ্রীম—তা একটু হয় বটে। জগন্নাথের মন্দিরে গিয়ে দেখ, সেখানে শত্রু মিত্র সব এক হয়ে যায়। রাস্তায় লাঠালাঠি করছে। ওখানে গেলে (যুক্ত করে শরণাগতি মুদ্রা দেখাইয়া) এই ভাব। কিন্তু তা অতি অল্পক্ষণের জন্য। ঠাকুরের বেশ একটি উপমা আছে। যেমন তপ্ত খোলাতে জলবিন্দু, ক্ষণস্থায়ী।

ঠাকুরের সামনে দু'জনকে ধ্যান করতে বললেন। একজন বসেই স্থির হয়ে গেল। আর একজন অন্য রকম। এই ব্যক্তি অনেক খেটেছে। এই sense world (জগৎ)।

ঠাকুর বলতেন, কারো সোনা বিশ মণ মাটিতে ঢাকা। কারো

এক সের। যাদের এক-আধ সেরে ঢাকা তাদেরই টেনে নেন আগে। কে যায় কোদলাতে বিশ মণ? সোনা মানে পরমাত্মা।

সংস্কারে এমনি হয়। সব সময়েই যে মূর্তিটি ভাল লাগে সেটি দেখে সম্মুখে। Realise (উপলব্ধি) করতে পারে মনে মনে। Realise মানে real (সত্য) বলে বোধ করা। আমরা তো সবই real বলে বোধ করছি, যা সব দেখছি।

বস্তুতঃ তা নয়। এ মায়ার রাজ্য। Real (সত্য) এক ঈশ্বর।

কথামৃত পাঠ হইবে। শ্রীম বাহির করিয়া দিলেন তৃতীয় ভাগ, দ্বাদশ খণ্ড, দ্বিতীয় অধ্যায়। জগবন্ধু পড়িতেছেন।

পাঠক (শ্রীরামকৃষ্ণ ছোট নরেনকে বলিলেন)—তুই কি ভালবাসিস্, জ্ঞান না ভক্তি? ছোট নরেন বলিলেন, 'শুধু ভক্তি।' শ্রীরামকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন, এঁকে (মাস্টারকে) যদি না জানিস কেমন করে এঁকে ভক্তি করবি? তবে শুদ্ধাত্মা যেকালে বলেছে, 'শুধু ভক্তি চাই', এর মানে আছে। আপনি আপনি ভক্তি আসা, সংস্কার না থাকলে হয় না। এইটি প্রেমাভক্তির লক্ষণ। জ্ঞানভক্তি—বিচার-করা ভক্তি ইত্যাদি। পাঠ চলিল।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—এই দেখছেন, গুরুর উপর বিশ্বাস থাকলে আর কিছু করতে হয় না। যা দরকার তিনি করেন। ঠাকুর ভক্তদের যার যা দরকার, করে দিচ্ছেন নিজে। তিনি অন্তর্যামী, সব জানেন। পূর্বজন্ম পরজন্ম সব। একজনকে বলছেন, বিশ্বাস কর, নির্ভর কর, তা হলে নিজের কিছু করতে হবে না। মা কালী সব করে দেবেন। আর একজনকে বলছেন, ভাগবত পণ্ডিতকে একটা পাশ দিয়ে ঈশ্বর রেখে দেন। তা না হলে কে ভাগবত শোনাবে লোকদের? রেখে দেন লোকশিক্ষার জন্য। তাই মা সংসারে রেখেছেন আমাকে। (অর্থাৎ শ্রীমকে)।

শ্রীম (যুবকের প্রতি)—গুরুর আশ্রয় লাভ করে যেখানেই থাক, ভয় নাই। তাঁর দৃষ্টি থাকে। (ভক্তদের প্রতি)—অনেকে কুলগুরুর কাছ থেকে মন্ত্র নিয়ে ভাবে মানুষের কাছ থেকে মন্ত্র নিয়েছে।

মানুষ-বুদ্ধি করলে হবে না। গুরুতে ঈশ্বর-বুদ্ধি চাই। মন্ত্র ঈশ্বর দিয়েছেন এই বুদ্ধি চাই। গুরুতে ঈশ্বর-বুদ্ধি না করলে যে দাম lower (অল্প) হয়ে যায়। ঈশ্বর দিয়েছেন মন্ত্র, এই বিশ্বাস চাই। (পাঠকের প্রতি)—পড়।

পাঠক (পড়িতেছেন)—শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন, ব্যাসদেব গোপীদের প্রায় সব ক্ষীর, দই, ননী খেয়ে ফেললেন। তারপর বলছেন, যমুনে! আজ আমি যদি কিছু না খেয়ে থাকি তবে তোমার জল দুই ভাগ হবে। আর মাঝের রাস্তা দিয়ে আমরা চলে যাব। ঠিক তাই হলো।

শ্রীম—দেখুন, ব্যাসদেবের কি জ্বলন্ত বিশ্বাস! এত খেলেন তাও বলছেন, আমি কিছুই খাই নি। গোপীরা তো দেখে শুনে অবাক্। কি বিশ্বাস!

"আমি" মানে শুদ্ধাত্মা, যিনি অন্তরে আছেন। তিনি নির্লিপ্ত। তাঁর ক্ষুধাতৃষ্ণা নাই।

এর নামই ব্রহ্মজ্ঞান। এটা হলেই জীবন্মুক্ত। বলছেন, যার এ জ্ঞান হয়েছে তিনি বুঝতে পারেন, আত্মা আলাদা আর দেহ আলাদা।

ঠাকুর আর একটি উপমা দিয়েছিলেন। পুকুরের জল সব পানাতে ঢাকা। জল দরকার হলে প্রথমে পানা সরাতে হবে। সংসারে যে চতুর, সে এই পানা সরিয়ে জল খায়।

বড় জিতেন—এটা ঠিক বুঝতে পারলাম না।

শ্রীম—পানা মানে মায়া। মায়ার বাইরে গিয়ে তাঁকে দেখা। পানা তো আবরণ, বস্তুতঃ জল রয়েছে নিচে।

বড় জিতেন—তা কি সকলে পারে, সোজা কথা?

শ্রীম—গুরুর কৃপায় তা-ও পারে। মহামায়ার কাণ্ড,সব গোলমাল লাগিয়ে দেয়। গুরুর ওপর বিশ্বাস থাকলে এর হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। তখন নিজের কিছুই করতে হয় না।

মায়ার definitionই (সংজ্ঞা) এই—যা realকে (সত্যকে) unreal (অসত্য) বোধ করিয়ে দেয়, আর unrealকে (অসত্যকে) real (সত্য) বোধ করিয়ে দেয়। 'অতস্মিন্ তদ্‌বুদ্ধি'। মায়ার

আর একটি নাম sense-world (জগৎ)। আমরা তো সব মায়ার খেলার ভেতর পড়ে রয়েছি। গুরুকৃপা, গুরুর ওপর বিশ্বাস থাকলে আর কিছু করতে হয় না।

পাঠক (পড়িতেছেন)—শ্রীরামকৃষ্ণ মাস্টারকে বলিলেন, সেদিন দেখলাম খোলটি ছেড়ে সচ্চিদানন্দ বাইরে এল। এসে বললে, আমি যুগে যুগে অবতার। তখন ভাবলাম, বুঝি মনের খেয়ালে ঐ সব কথা বলছি। তারপর চুপ করে থেকে দেখলাম। তখন দেখছি আপনি বলছে, শক্তির আরাধনা চৈতন্যও করেছেন। দেখলাম, পূর্ণ আবির্ভাব। তবে সত্ত্বগুণের ঐশ্বর্য।

শ্রীম—আগে থেকেই ফিল্ডটি তৈরী করে নিলেন। আর কেউ নাই সেখানে অন্তরঙ্গ ছাড়া। তাই নিজের স্বরূপ বললেন। বললেন, আমি সেই সচ্চিদানন্দ পরমব্রহ্ম। এখন অবতার হয়ে এসেছি। তিনি যে অবতার তার greatest evidence (সব চেয়ে বড় প্রমাণ) তাঁর নিজ মুখের এই মহাবাক্য। অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলেছিলেন, আমিই পরমব্রহ্ম। তাই অর্জুন বললেন, 'স্বয়ঞ্চৈব ব্রবিষি মে'। আর বাইরের প্রমাণ, নরেন্দ্রের অদ্ভুত কর্ম ও জীবন।

পাঠক (পড়িতেছেন)। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন—কাঁকুড়-ক্ষেতে যদি অনেক কাঁকুড় হয়ে থাকে তা হলে মালিক দুই তিনটা বিলাতে পারে।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—এটি একটি primitive (প্রাচীন) উদাহরণ—civilisationএর (নবীন সভ্যতার) পূর্বের। ঠাকুরের দুই-ই আছে primitive (প্রাচীন) উপমাও আছে, আবার বর্তমান civilisation (সভ্যতার) উপমাও আছে। 'স্টিমার', 'ইঞ্জিন', 'টেলিগ্রাফের তার' এগুলি নবীন। 'হাবাতে কাঠ' শুধু নিজে ভেসে যায়—এটি primitive (প্রাচীন)। 'স্টিমার' নিজেও পারে যায়, আবার অপরকেও নিয়ে যায়—এটি modern (আধুনিক) উপমা। টেলিগ্রাফের তারের কথা বলতেন, যোগের কথা বোঝাতে গিয়ে। তারে কোথাও কাটা থাকলে message (সংবাদ) যায় না। তেমনি মনে অন্য বাসনা থাকলে ঠিক ঠিক যোগ হয় না।

দু' রকমই বলে গেছেন, ওয়েস্টের লোক আসবে কিনা তাই। ইংরেজী-জানা লোকদের 'ইংলিশমেন' বলতেন কেন? মানে, এরা civilisation (পাশ্চাত্য সভ্যতা) পেয়েছে কিনা (হাস্য)।

শ্রীম (পাঠকের প্রতি)—বেশী পড়তে নেই একসঙ্গে। তা হলে সব চাপা পড়ে যায়। আজ থাক্ এ পর্যন্ত।

রাত্রি নয়টা। একটি ভদ্রলোক আসিয়াছেন। তাঁহার হাতে চুরুট। ইনি গিরিশ ঘোষের কাছে যাতায়াত করিতেন। শ্রীম সস্নেহে তাঁহাকে কাছে বসাইলেন। গিরিশবাবুর জীবনচরিত লেখা হইতেছে কিনা, শ্রীম জিজ্ঞাসা করিতেছেন। বলিলেন, আপনারা তাঁর কাছে অনেক বসেছেন, আপনারা লিখলেই ভাল হয়। ভক্তটি উত্তর করিলেন, গোঁড়ামী দোষ ধরবে যে। শ্রীম প্রত্যুত্তরে বলিলেন, না, শুধু facts (ঘটনাসমূহ) দিয়ে দেবেন। নিজের opinion (মত) না দিলেই হবে।

৩

দুইদিন পর ১৪ই ফেব্রুয়ারী ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দ। রাত্রি নয়টা। শ্রীম মর্টন ইনস্টিটিউশনের দোতলার বারান্দায় বেঞ্চিতে বসিয়া আছেন। অন্তেবাসী একজন সাধুকে দর্শন করিয়া ফিরিয়াছেন। সেই সাধুর সম্বন্ধে কথা হইতেছে।

শ্রীম (অন্তেবাসীর প্রতি)—কিছু আলাপ হলো?

অন্তেবাসী—আজ্ঞে হাঁ। কি করে বৈরাগ্য হল জিজ্ঞেস করেছিলাম।

শ্রীম—কি বললেন?

অন্তেবাসী—ইনি সংসারধর্ম করেছেন। ছেলেরা সব লায়েক, কেউ উকিল, কেউ ডাক্তার। পত্নী গত হয়েছেন অনেক দিন। বয়স ছাপ্পান্ন। ইদানীং সর্বদা মহাভারত পড়তেন।

তিনি বললেন, একটি গল্প পড়েছিলেন। সেইটিই তাঁর আদর্শ। তার প্রভাবেই এই বয়সে সাধু হলেন।

গল্পটি এই। এক সদাগর অনেক বাণিজ্যসম্ভার নিয়ে চলেছে। বহু নৌকা আর লোকজন তার সঙ্গে। নৌকায় বসে আছে একদিন, জলের উপর দৃষ্টি। দেখলে, একটি বাঁশপাতা জলের আবর্তে পড়ে তলিয়ে গেল। খুব কৌতূহল হল দেখতে, পাতাটা গেল কোথায়। তাই ডুবুরীকে জলের নিচে নামিয়ে দিল। সে গিয়ে দেখলো একটা মাছ মুখ হাঁ করে আছে। আর বাঁশপাতাটি গিয়ে সেই মুখের ভিতর পড়লো। অমনি মাছ সেটি খেয়ে ফেললো। সদাগরকে এসে এই কথা বলতেই সে মাঝিদের হুকুম করলো নৌকা তীরে লাগাতে। সে তখন একবস্ত্রে নৌকা থেকে নেমে গেল। খবরও আর করলে না—বিষয়ের কি হবে, স্ত্রী পুত্র কন্যার কি হবে। এই বিচার করে বেরুল, সবই দেখছি পূর্ব থেকেই ঠিক হয়ে আছে, কে কি আহার করবে এবং কখন করবে। তা হলে আর কেন আমি এ ঝকমারীতে রয়েছি? যিনি মাছের মুখে বাঁশপাতার বন্দোবস্ত করেছেন তিনিই আমাকেও খেতে দেবেন। অপর সকলকেও খেতে দেবেন।

এই গল্পটিই এই সাধুটির আদর্শ। এইটিতেই বৈরাগ্য হয়।

শ্রীম—অনুরাগ থাকা চাই পাকা—ঈশ্বরে। নইলে বৈরাগ্য টেকে না। হাত পা চোখ মুখ এগুলিকেও জলের আবর্ত মনে করলে হয়।

যতটা করবার শক্তি আছে ততটা নিজে করে বাকীটার জন্য তাঁর শরণাপন্ন হওয়া। এইতো মনে হয় ভাল। এটাই consistent proposition (যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্ত) বলে আমাদের মনে হয়। ও রকম আলস্য থেকেও হতে পারে। দেহের যত্ন না নেওয়া অলসতা। ঈশ্বরচিন্তা করে দেহ ভুল হওয়া এক ঠাকুরের দেখেছি। বড়ই কঠিন। শরীরের যত্ন নেওয়া উচিত। নইলে ভুগতে হবে। বৈরাগ্য টিকবে না শেষ অবধি।

যদি তা না হবে তবে কেন ঠাকুর বললেন, 'পৈতে কি আমি ইচ্ছা করে ফেলেছি? রাখতে পারি নি তাই পড়ে গেল।' 'ফুল তুলতে গিয়ে দেখি এক একটি ফুলের গাছ এক একটি ফুলের তোড়া।

এ দিয়ে বিরাটের পূজা হচ্ছে। তখন হাত আর উঠলো না।' 'জপ করতে গিয়ে আঙ্গুল আর নড়ছে না। শক্ত ও আড়ষ্ট হয়ে গেল।' 'তর্পণ করতে পারলাম না। হাত থেকে সব জল বের হয়ে গেল।'

Consistent proposition (ন্যায়সঙ্গত সিদ্ধান্ত) ঐ—শরীরের যত্ন নেওয়া যতদিন দেহেতে আত্মবুদ্ধি আছে। দেহবুদ্ধি লোপ হলে তখন তাঁর ওপর ভার। তিনি দেখবেন।

রমণী আসিল। একটু পর ছোট জিতেন ও বিনয় ভবানীপুর হইতে ফিরিয়া আসিলেন, শ্রীমকে গদাধর আশ্রমে না পাইয়া। রাত্রি প্রায় দশটা।

৪

শ্রীম মর্টন স্কুলের আফিসে বসিয়া আছেন দোতলায়। এখন দশটা। স্কুলের কাজ আরম্ভ হইয়াছে। পাশে একজন যুবক শিক্ষক বসা। তাঁহাকে একখানা সংবাদপত্র দিলেন—গৌরীবাবুকে এটা দেবেন kindly (দয়া করে)—এই বলে। তিনি ঠাকুরবাড়ীতে ভোজন করিতে চলিয়া গেলেন।

সন্ধ্যা প্রায় হয় হয়। শ্রীম চারতলায় নিজের ঘরে বসিয়া আছেন বিছানায়, পশ্চিমাস্য। দরজা বন্ধ। ধ্যান করিতেছেন। পাশের ঘরে জগবন্ধু ও সদানন্দ আসিয়া বসিলেন। কাঠের পার্টিশানের ফাঁক দিয়া তাঁহারা শ্রীমকে দর্শন করিতেছেন—ধ্যানমগ্ন। অনেকক্ষণ পর ধ্যানভঙ্গ হইল। এখন ঠাকুর-দেবতার নাম করিতেছেন মধুরকণ্ঠে। বলিতেছেন, 'গুরু গঙ্গা গীতা গায়ত্রী।' 'দেবলীলা জগৎ লীলা ঈশ্বরলীলা নরলীলা'। 'গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব'। 'ব্রহ্ম শক্তি শক্তি ব্রহ্ম'। 'ঈশ্বর মায়া জীব জগৎ'। 'যত মত তত পথ'। 'ভক্ত ভাগবৎ ভগবান'। 'সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম, সচ্চিদানন্দ শিব, সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণ'। 'সচ্চিদানন্দ সচ্চিদানন্দ সচ্চিদানন্দ'। এ সবই ঠাকুরের মহামন্ত্র। তারপর মায়ের নাম হইতে লাগিল—অবিরত গানের পর গানে। একটি সহজ উদ্দীপনার প্রবাহ চলিতেছে।

গান। জাগ মা কুলকুণ্ডলিনী, তুমি নিত্যানন্দস্বরূপিনী ;
প্রসুপ্ত ভুজগাকারা আধারপদ্মবাসিনী।
ত্রিকোণে জলে কৃশানু, তাপিতা হইল তনু,
মূলাধার ত্যজ শিবে স্বয়ম্ভুশিববেষ্টিনী।
গচ্ছ সুষুম্নার পথ স্বাধিষ্ঠানে হও উদিত,
মণিপুর অনাহত বিশুদ্ধাজ্ঞাসঞ্চারিণী ॥
শিরসি সহস্রদলে, পরমশিবেতে মিলে,
ক্রীড়া কর কুতূহলে সচ্চিদানন্দদায়িনী ॥

গান। বল রে শ্রীদুর্গা নাম। ইত্যাদি।

গান। মজলো আমার মন-ভ্রমরা শ্যামাপদ নীলকমলে। ইত্যাদি।

গান। ও মন মজ রে শ্যামা-চরণে। ইত্যাদি।

গান। কবে হবে সমাধি মগন। ইত্যাদি।

গান। এবার আমি ভাল ভেবেছি। ইত্যাদি।

ভজন শেষ হইবার পূর্বে ছোট জিতেন আসিয়া পার্টিশানের ঘরে বসিয়া আছেন। ভজন শেষ হইলে ছোট জিতেন গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। বড় জিতেনও সঙ্গে সঙ্গেই প্রবেশ করিলেন। ঠাকুরবাড়ী হইতে ভৃত্য শ্রীমর রাত্রির আহার আনিয়াছে। ভক্তগণ দোতলার ঘরে নামিয়া গেলেন। একজন কেবল শ্রীমর আহারের স্থান প্রস্তুত করিয়া দিয়া কাছেই বসিয়া রহিলেন। শ্রীম ভোজন করিতেছেন। দুধ ও রুটি রাত্রির আহার। দুধে মিষ্টি দেওয়া হয় না। আহার হইয়া গেলে সকলে পুনরায় আসিয়া একত্রিত হইলেন। বড় জিতেন, ছোট জিতেন, ছোট নলিনী, জগবন্ধু প্রভৃতি। শ্রীমর শরীর তত ভাল নয়। বড় জিতেন হাতে হ্যারিকেন লইয়া শ্রীমর মুখ দর্শন করিতেছেন। তিনি বিছানায় শুইয়া আছেন।

বড় জিতেন (সস্নেহে শ্রীমর প্রতি)—শুনলাম চেহারা খারাপ হয়ে গেছে, জ্বরটর হয়নি তো ?

শ্রীম—না। চেহারা কি একরকম থাকে ? আর এই চেহারা তো আসল চেহারা নয়। এ ‘আমি’ নয়। স্ব-স্বরূপই হলো আসল

চেহারা। এ তো বদলাচ্ছে। দেখুন—বাল্য, পৌগণ্ড, যৌবন, বার্ধক্য এইগুলি তো রয়েছে। এক সময়ের চেহারার সঙ্গে অন্য সময়ের চেহারার মিল নেই। এই 'আমি' যদি real (সত্যিকার) 'আমি' হতো তা হলে আর উপায় ছিল না। এ কি আজ থেকে চলছে? —Since the creation of the universe (সৃষ্টির প্রথম থেকে)।

বড় জিতেন—কি করে দেখা যায় স্ব-স্বরূপকে? তাই করে দিন না।

শ্রীম—তার জন্যই মনে করুন অবতার আসেন। যুগে যুগে আসেন। এসে বলেন, 'আমাকে চিন্তা কর'। তা হলেই স্ব-স্বরূপকে জানতে পারা যায়।

বড় বড় কথা বললে কি হবে? কথা তো অনেক হলো। যার পেটে যা সয়। পোলাউ কি সকলের পেটে সয়? দেখুন না, অর্জুনের মত উত্তমাধিকারী (বিশ্বরূপ) দেখেই একেবারে 'বেপথুঃ' মানে অজ্ঞান হয়ে গিছলেন, কাঁপছেন। বলছেন, প্রভো আমায় তোমার ঐ রূপ দেখাও, সাম্যরূপ। এই রূপ সম্বরণ কর। শ্রীকৃষ্ণ বললেন, দেবতারা আমার এই রূপ দেখতে চায়। অর্জুন বললেন, না আমি চাই না। সম্বরণ কর প্রভো, সম্বরণ কর এই রূপ। এমনি কাণ্ড!

সইবে কেন এ শরীরে? এর জন্য অন্য ব্যবস্থা। তাই মনে করুন অবতার আসেন। অচিন্ত্যকে চিন্তা করতে পারে না এই দেহে। তাই তিনি দেহ ধারণ করে আসেন। ও-টি চলবে। (নিজের শায়িত শরীরে ডান হাতে আঘাত করিয়া) এইটিতেই এ সয়। তার পরের ব্যবস্থা ভিন্ন। অনন্ত কাণ্ড কি করে এটাতে বোঝা যায়? সেই জন্য দেহধারণ করেন তিনি। আবার রোগ শোক ক্ষুধা তৃষ্ণা সব নিয়ে আসেন মানুষের মত। তবে মানুষ তাঁকে চিন্তা করতে পারবে।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—গুরুই সব করেন। শিষ্যটা ভাবছে আমিই সব করছি। তা নয়। ভবানীপুর যেতে একটি ছেলে দেখেছিলাম—সাইকেলে চড়ে বসেছে। আরেকজন লোক তাকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। ছেলেটি quite at ease (বেশ আরামে) নড়ছে চড়ছে, দুলছে। কিন্তু তাকে নিয়ে যাচ্ছে ঠেলে অপর একজন।

তেমনি গুরুই সব করেন। শিষ্য quite at ease (বেশ আরামে) যেতে পারে।

গুরু বই উপায় নাই। ক্রাইস্ট সেই কথাই বলেছিলেন, 'In the world ye shall have tribulation : but be of good cheer, for I have overcome the world.' এর মানে এই শরীর ধারণ করলে দুঃখকষ্ট নিশ্চয় হবে। যদি বাঁচতে চাও এর হাত থেকে, যদি আনন্দে থাকতে চাও এর ভেতর থেকেও তা হলে 'আমায় ধর'। আমি এই শোকতাপকে জয় করেছি। আমি নিত্যানন্দ উপভোগ করেছি এই ঝামেলার ভেতর থেকেও। আমায় ধরে থাকলে তোমরাও নিত্যানন্দ উপভোগ করতে পারবে।

ডাক্তার বক্সী, বিনয় ও ছোট অমূল্য গৃহে প্রবেশ করিলেন। রাত্রি এখন সাড়ে নয়টা।

শ্রীম (সবিস্ময়ে ডাক্তারের প্রতি)—ওমা, এই যে! কখন এলেন? এত রাত্রে?

ডাক্তার—দেরী হয়ে গেল। বাড়ীর ওঁরা এসেছেন, নিচে আছেন।

শ্রীম—মেয়েরা?

বড় জিতেন—(রহস্যচ্ছলে)—এখন সব ভৈরবভৈরবী হলো দেখছি। ঠাকুর বলেছেন, স্বামীস্ত্রীতে হলে মন্দ নয়।

শ্রীম (গম্ভীর ভাবে)—ঠাকুর বলতেন, যারা অনেকদিন তপস্যা করেছে, স্ত্রী কি বস্তু জেনেছে, তারাই পারে ভৈরবভৈরবী হয়ে পবিত্র ভাবে থাকতে। বড় ঘরের যারা, উঁচু থাক যাদের, তাদের কিছুদিন অসঙ্গ (নির্জনে একা) থাকা উচিত। ঐ ভাবে থেকে নিজেকে জেনে এসে (সংসার) করলে দোষ নাই। যেমন ত্রৈলঙ্গ স্বামী। তাঁকে কোটপ্যাণ্ট পরিয়ে দিলেও ত্রৈলঙ্গ স্বামীই। অফিসের বাবু ইনি, একথা এঁকে কেউ বলবে না। যারা কিছুদিন নিঃসঙ্গ অবস্থায় থাকে, বুঝতে হবে এদের ঘর উঁচু।

বড় জিতেন—সাধুসঙ্গ এতো হচ্ছে, এখানে আসা যাচ্ছে। কোথায় পাব এমন সব সাধুসঙ্গ।

শ্রীম (বিরক্তির ভাবে)—জ্যাঠামী করলে কি হবে? আগে কিছুদিন নির্জনে থেকে তারপর (সংসার) করতে পারে।

বড় জিতেন—এখানে যারা আসছে তাদের কিছু কিছু হচ্ছে তো?

শ্রীম—বাজনার বোল মুখস্থ করা সহজ। হাতে আনা বড় কঠিন। নিঃসঙ্গ থাকলে নিজের position (অবস্থা) বোঝা যায়। নিজের position (অবস্থা) বোঝা গেলেই অনেক হয়ে গেল। কেউ কেউ এমন আছে বাইরের বন্ধনও ছেড়ে দেয়, জামাকাপড়। তারপর ন্যাংটা হয়ে ধ্যান করে নির্জনে। জামাকাপড়ও বন্ধন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—গুরুই সব করেন। কখনও আবার মারেন। Battlefieldএ (রণক্ষেত্রে) কমাণ্ডার আবার কখনও চাবুক মারে। যে good soldier (ভাল সৈনিক) হবে তার তা খেতে হয়। অনেক যুদ্ধ lose and win করে (হেরে জিতে) তবে পাকা কমাণ্ডার হয়।

শ্রীম বিছানা হইতে উঠিয়া ছাদে গেলেন। শীতকাল। গায়ে সোয়েটার, তাহার উপর ওয়ারফ্লানেলের পাঞ্জাবী। মাথায় কম্ফোর্টার জড়ান। খোলা হাওয়ায় একাকী বেড়াইতেছেন।

মণি ভক্তসভায় প্রবেশ করিলেন। অভাবে পড়িয়া তাঁহার মাথার একটু গোলমাল হইয়াছে। বড় জিতেন সস্নেহে তাঁহাকে উপদেশ দিতেছেন।

বড় জিতেন (মণির প্রতি)—ছেলেপুলে নিয়ে এখানে আসা উচিত নয়। ইনি তা পছন্দ করেন না। বলেন, এক আধবার হলে হয়। বেশী আসা ভাল না। সময় হলে তাদেরও হবে। এখন ওদের খেলাধুলা চাই। খোলা হাওয়ায় এদের নিয়ে যাওয়া ভাল।

মণি—আমরা 'বাহাদুরী কাঠ'। 'হাবাতে কাঠ' হতে যাব কেন? আমরা নিজেও যাব অপরকে নিয়ে যাব সঙ্গে করে।

শ্রীম গৃহে প্রবেশ করিলেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—কি সব কথা হচ্ছে?

মণি—আমরা 'হাবাতে কাঠ' হতে যাব কেন? আমরা 'বাহাদুরী কাঠ'।

শ্রীম কথার স্রোত উল্টাইয়া দিলেন।

শ্রীম (ডাক্তারের প্রতি)—ওল্ড্ টেস্টামেণ্টখানা বাঁধান হলো কি? বড় সুন্দর বই, পড়তে ইচ্ছা হয়। আফ্রিকা থেকে নিয়ে এসেছেন ওদের (ক্রীতদাসদের) মোজেজ্। তারা বলছে, 'কই ঈশ্বর, আমাদের খাবার দাও না, ওখানে তো বেশ ছিলাম। এখানে খাবার দিচ্ছ না কেন!' দেখ, যেমন ঘরের লোকের সঙ্গে কথা কইছে। কত নিকটে, কত আপনার। ওরা বড় সরল কিনা। ঈশ্বরের দর্শন পেয়েছে। পড়তে বেশ লাগে।

শ্রীম (মণির প্রতি)—আপনার গ্রামোফোনে আজ দুপুরে শুনেছি চৈতন্যলীলা, প্রভাসলীলা। আহা, কি সুন্দর!

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—এই দেখুন, এখানেও ভালবাসার কথা। অনেকদিন ধরে যাকে ভাবা যায়, যার সঙ্গে থাকা যায়, তার সঙ্গে ভালবাসা জন্মে। আমাদের শরীর এমনি উপাদানে গঠিত। এক সঙ্গে অনেক দিন থাকলে ভালবাসা জন্মে। একজনের দু'মাসের একটি ছেলে মরে গেলে তত শোক হয় না। কিন্তু দশ বছরের ছেলে গেলে কত কান্না।

ঈশ্বরের ওপর ভালবাসাও এই ভাবেই হয়। অনেক দিন ধরে তাঁর চিন্তা করে করে, তাঁর সেবা করে, তবে এই ভালবাসা হয়। এই শরীরেই হয়, এই একই ভাবে হয়। ঈশ্বরকে ভালবাসাই মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য।

শ্রীম চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। কিছুকাল পরে পুনরায় কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (জগবন্ধুর প্রতি)—এতেই হবে।

ডাক্তার—এর মানে কি?

শ্রীম—অর্থাৎ এই সরঞ্জামেই হবে। এই শরীরেই ঈশ্বরদর্শন হয়। তবে মোড় ফিরিয়ে দিতে হয়। ঈশ্বরের এমনি ব্যাপার!

তিনি মাছের তেলে মাছ ভাজেন। এই লিভার, এই স্প্লিন, এই nervous system (স্নায়ুমণ্ডলী) দিয়েই তাঁকে দেখা যায়। তিনি অবতার হন এই জন্যে। এই শরীর দিয়ে তাঁকে লোক ভালবাসবে তা হলে।

ঠাকুর কারুকে কারুকে apologetically (সবিনয়ে) বলতেন, 'বললে পাছে অভিমান হয় এখানে এলে হাতে করে কিছু আনতে হয় দু'চার পয়সার।' কারুকে বলতেন, 'পায়ে একটু হাত বুলিয়ে দাও তো। কন্‌কন্ করছে পা-টা।' কেন এরূপ বলতেন? মানে এরূপ করতে করতে তাঁ'তে ভালবাসা জন্মাবে।

কিছু দেওয়া সম্বন্ধে ক্রাইস্ট বলেছিলেন একজনকে একটা পাই পয়সা দিতে দেখে, 'এর দাম অমূল্য। কারণ এর কিছুই নেই। গরীব, তবুও দিচ্ছে।' গীর্জায় বাক্স থাকে না? অনেকে পূজোর জন্য তাতে কিছু কিছু দেয়। একজন একটি পাই ওখানে দিয়েছিল তাই দেখে ঐ কথা বলেছিলেন। যার আছে বেশী, সে তো বেশী দেবেই। কিন্তু যার নাই, সে যা দেয় প্রাণের সঙ্গে দেয়।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—এই শরীরেই তাঁকে দেখা যায়। তার জন্যই মনে করুন অবতার। এর বেশী পারা যায় না। অর্জুন পারলেন না। শরীরটি এমনি ভাবে গঠিত। এখন এর ভেতর দিয়ে দেখতে হবে।

তাতে আবার কত রকমারী দেখে। লাল চশমা পর, লাল দেখবে। নীল পরলে নীল দেখবে। যার যেমন চশমা, অর্থাৎ মন, ভাব সে তেমনি দেখে। এক ঈশ্বরকে তাই কখনও এ নামে, কমনও ও নামে বলছে। কেউ জলরূপে দেখেছে। কেউ বলছে বায়ু, কেউ অগ্নি। ঋষিরা এই সকলের ভেতর তাঁকে দেখেছেন। Infinite possibilities (অনন্ত ভাব)।

God is a point without a circumference (ভগবান হলেন এমন একটি বিন্দু যার পরিধি নাই)।

বড় জিতেন—বুঝতে পারলাম না এটা।

শ্রীম (বিছানার উপর তর্জনী দিয়া আঘাত করিয়া)—এখানে একটা পয়েন্ট ধরলে তার একটা radius (ব্যাসার্ধ) থাকবে। Circumference (পরিধি) থাকবে। এই সবই হলো finite (সান্ত)। ঈশ্বরকে বলা হয়েছে infinite (অনন্ত) তা যদি হয় তা হলে তাঁর circumference (পরিধি) নাই, radiusও (ব্যাসার্ধ) নাই। প্রত্যেক পয়েন্টেই তিনি—nearest (নিকটতম) হৃদয়।

বড় জিতেন—তাই কি ঈশ্বরকে immanent (বিশ্ব-পরিব্যাপ্ত) বলে ?

শ্রীম—Immanent (বিশ্ব-পরিব্যাপ্ত) কি করে বলা যায় ? সবই যে মোমের বাগানের মত—সব মোম।

মর্টন স্কুল, কলিকাতা, ১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯২৪ খ্রীঃ
৩রা ফাল্গুন, ১৩৩০ সাল, শুক্রবার, দশমী।

পরিশিষ্ট

এবারের প্রেমোপহার শ্রীম-দর্শনের তৃতীয় ভাগ। পূর্বের দুই ভাগের মত ইহাতেও আছে শ্রীরামকৃষ্ণ-পরিবারের—ঠাকুর, মা, স্বামীজী প্রভৃতির বাণী ও জীবনের সংস্পর্শ। আর উপনিষদ্, গীতা, বাইবেল, কোরাণ শরিফ আদি শাস্ত্রের শ্রীরামকৃষ্ণভাবসম্মত ব্যাখ্যা। ইহার তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হইতেছে, **কথামৃতকারের দ্বারা কথামৃতের ভাষ্য**। শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম পার্ষদ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবচন এবং কথোপকথনও এবারের শ্রীম-দর্শনের **আর একটি বৈশিষ্ট্য**।

কথামৃতের ন্যায় শ্রীম-দর্শনেও পৌনঃপুন্য (repetition) রহিয়াছে। সাহিত্যকলার দিক হইতে ইহা অবৈধ হইলেও, ধর্মশাস্ত্রের দিক দিয়া ইহা বিধি-সম্মত। অধ্যাত্মশাস্ত্রে পৌনঃপুন্য অলঙ্কাররূপে স্থান পাইয়াছে সর্বকালেই। ইহা ছাড়িবার উপায় নাই। সকল ধর্মশাস্ত্রের উদ্দেশ্য আত্মজ্ঞান লাভ অর্থাৎ জীবের শিবত্ব প্রাপ্তি। এই শিবত্বই জীবের স্বরূপ! দৈবী মায়ার বশবর্তী হইয়া জীব তাহার শিবত্ব ভুলিয়া গিয়াছে। শ্রীভগবান গুরুরূপে অবতাররূপে আসিয়া জীবের নিকট তাঁহার শিবত্বের বাণী যুগে যুগে শুনাইয়াছেন। এবারেও ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ এবং তাঁহার অন্তরঙ্গগণ সেই বাণী পুনঃ পুনঃ শুনাইয়া গিয়াছেন। সেই বাণীর প্রতিধ্বনি এখনও আমাদের কর্ণে বাজিতেছে। কাজেই দেখা যাইতেছে পৌনঃপুন্য অধ্যাত্ম শাস্ত্রের অপরিহার্য বিধি।

আত্মদ্রষ্টা আচার্যগণ যুগে যুগে এই পৌনঃপুন্য নীতি অবলম্বন করিয়াছেন—সোহং, শিবোহং, অহং ব্রহ্মাস্মি, অয়মাত্মা ব্রহ্ম, তত্ত্বমসি—এই সকল মহাবাণীর পুনঃ পুনঃ জপ ও ধ্যান শিক্ষা দিয়াছেন। জপের অর্থ এই—পুনঃ পুনঃ একটি মহাবাক্যের উচ্চারণ। ধ্যানও তাই—ঐ মহাবাক্যের প্রতিপাদ্য ভাববস্তুটির সতত চিন্তন। এই ধ্যানের চরম সীমাই সমাধি, অর্থাৎ ঈশ্বরের সঙ্গে জীবের একত্ব অনুভব। ইহাই জীবের চরম লক্ষ্য। ইহাতেও দেখা যাইতেছে, বুঝা যাইতেছে, পুনরুক্তি ধর্মসাহিত্যের প্রাণ।

ধর্মসাহিত্যের একই উপদেশ বহুবার বহুজনকে বলা হইয়া থাকে, বিশেষতঃ কথোপকথন ভাগে। শ্রীম-দর্শনে ইহা দেখিতে পাওয়া যাইবে। আর্টের নিয়ম পালন করিতে গিয়া যদি এই পুনঃপুনতা ছাড়িয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে দুইটি

নূতন দোষ আসিয়া পড়ে। প্রথম, কথার সঠিকতা ও সজীবতার অবচ্ছেদ হয়। আর দ্বিতীয়, একই কথা বহু আসরে বহুজনকে বলা হওয়ায় কাহার উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে ঐ কথা, ইহা বুঝা যায় না। অতএব পৌনঃপুনিকতা অপরিহার্য। বেদব্যাসের অমৃতময় ভাগবতে আর ক্রাইস্টের বাইবেলে পৌনঃপুন্য দৃষ্ট হয়।

এই পৌনঃপুন্য বিধি অনুসরণ করিয়া আচার্য শ্রীম শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী পুনরায় সংসারতপ্ত জীবগণকে পরিবেশন করিতেছেন। তারস্বরে ঘোষণা করিতেছেন, হে জীব, তুমি মানুষ নও, তুমি অমৃতের পুত্র। অহর্নিশ এই মন্ত্র জপ কর, এই মন্ত্র ধ্যান কর, এই মন্ত্রের উপাসনা কর। এই মন্ত্রের প্রাণ সঞ্জীবন কর। এই উপায়ে তুমি নিজের শিবত্ব লাভ কর। তুমি অমৃতত্ব লাভ কর।

আর যাঁহারা অমৃতত্ব লাভ করিয়াছেন অথবা লাভ করিবার জন্য ব্যাকুল সেই আচার্যগণের সঙ্গ কর, তাঁহাদের সেবা কর, তাঁহাদের নিকট আত্মসমর্পণ কর। ইহাই উপায় অমৃতত্ব লাভের। ইহাকেই সাধুসঙ্গ বলা হয়।

হে জীব, তুমি যদি গৃহস্থাশ্রমে পতিত হইয়া থাক, তোমার বন্ধন উন্মোচনের জন্য ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ এই সেদিন তাহার সুগম পথ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। বলিয়াছেন, তুমি দাসীবৎ নিজ গৃহে পরিজনরূপী ভগবানের সেবা কর। যদি বল, 'আমি এই গৃহের মালিক' তাহা হইলে জানিবে, তুমি বন্ধনে পড়িয়া গেলে, এই গৃহের মালিক শ্রীভগবান। তুমি তাঁহার দাসী। তোমার অধিকার কেবল কর্মে, কিন্তু ভোগে নয়। দাসীকে পরিতুষ্ট থাকিতে হয় গৃহস্বামিনীর প্রদত্ত দ্রব্যে। যদি তুমি এই পরামর্শ গ্রহণ কর তাহা হইলে তোমার গৃহ-পরিজন, যাহা বন্ধনের কারণ হইত, তাহাই হইয়া যাইবে মুক্তির মুক্ত দ্বার। যাহা শোকতাপের আলয় হইত, তাহা হইবে পরমানন্দের হাট। গরল অমৃত হইবে।

বন্ধু, শ্রবণ কর শ্রীরামকৃষ্ণের ঐ অভয় বাণী, 'তোদের (গৃহস্থ ভক্তদের) জন্যই আমার ভাবনা বেশী। তোরা সংসারে জড়িয়ে পড়েছিস্। তোরা আমায় ধর। আমার চিন্তা কর। আমি কে আর তোরা কে, এটা জানলেই হবে।' আর ঐ শোন, প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিয়াছেন—'মাইরি বলছি, যে আমার চিন্তা করবে সে আমার ঐশ্বর্য লাভ করবে, যেমন পিতার ঐশ্বর্য পুত্র লাভ করে। জ্ঞান ভক্তি, বিবেক বৈরাগ্য, শান্তি সুখ, প্রেম সমাধি—এই সব আমার ঐশ্বর্য।'

আবার ঐ শুন ভাই, শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিধ্বনি শ্রীমর মুখে। 'সংসারে

থাকবে পদ্মপত্রের জলের মত। অথবা জলের উপর মাখনের মত। অথবা পাঁকাল মাছের মত পাঁকে থেকেও নির্মল। কিংবা কচ্ছপের মত, জলে থেকে আড়ায় ডিমে মন রেখে। কিংবা গৃহের সকল কাজ করে উপপতির উপর মন রেখে—নষ্টা স্ত্রীর মত। কিংবা হাতে তেল মেখে কাঁটাল ভাঙ্গার মত।' তাহা হইলে এই সংসারকেই 'মজার কুঠি' বানাইতে পার, যদি শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিধ্বনি শ্রীমর উপদেশ শুনিয়া কাজ কর।

এখন শ্রীমর জীবনের দুই চারিটি কথা বলিতেছি। শ্রীম বলিতেছেন "শৈশব হইতেই ঠাকুর আমাকে রক্ষা করিতেছিলেন। একবার চার বছর বয়সে মায়ের সঙ্গে যাই নৌকায় মাহেশের রথে। ফিরিবার মুখে মা সঙ্গীদের সহিত দক্ষিণেশ্বরের কালী মন্দির দর্শন করিতে নৌকা হইতে নামিলেন। ঐ সময় আমি সঙ্গী ছাড়া হইয়া যাই, আর একা একা কাঁদিতে থাকি, মা কালীর মন্দিরের কাছে। তখন একটি সৌম্যদর্শন যুবক আসিয়া আমার গায়ে মুখে হাত বুলাইয়া আদর করিতে লাগিলেন।" ইনিই হয়তো পরবর্তী কালের আমার জীবন-সর্বস্ব ঠাকুর।

"আর একটি ঘটনা। তখন আমার খুব অল্প বয়স। আমি ছাদে বসিয়া আশ্বিনের ঝড়ের বৃষ্টিতে ভিজিতেছিলাম আর ভগবানকে ডাকিতেছিলাম। বহুকাল পর যখন শ্রীশ্রীঠাকুরের পাদপদ্মে আশ্রয় পাইলাম তখন হঠাৎ একদিন ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, কি গো, তোমার আশ্বিনের ঝড়ের কথা মনে আছে? আমি যে তখন ঈশ্বরকে ডাকিতেছিলাম সেই কথার ইঙ্গিত করিয়াই কি ঠাকুর এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন?

"আর একবার দার্জিলিংএ যাই। শিলিগুড়ি স্টেশন হইতে হিমালয় দর্শন করিয়া আনন্দে কাঁদিয়াছিলাম। পরবর্তী কালে একদিন ঠাকুর আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন, হিমালয় দর্শন করে উদ্দীপন হয়েছিল তো? আমি শিহরিয়া উঠিয়া ভাবিলাম, কি আশ্চর্য, তিনি কি করিয়া জানিলেন একথা? তিনিই যে 'স্থাবরাণাম্ হিমালয়ঃ', তাহা আমি তখনও জানিতাম না। ঠাকুর বলিতেন লঙ্কা না জেনে খেলেও ঝাল লাগে। আমার ঐ আনন্দোচ্ছ্বাস কি এই মহাবাণীরই ফলস্বরূপ?"

এইরূপ আরো অনেক ঘটনা আছে। এইসব হইতে ইহাই বুঝিয়াছি তিনি ভক্তগণকে সর্বদা রক্ষা করেন, পিছনে থাকিয়া এই জীবনে, পূর্ব জীবনে ও পর জীবনে যাবৎ না ভক্তগণ পুনরায় তাঁহার অমৃতময় ধামে গমন করে—ঠিক

যেমন সংসারে মাতা পিতা নিজ সন্তানগণকে সর্বদা রক্ষা করিয়া থাকেন। এই কথায় বিশ্বাস হইলে জীব হয় অর্ধ-জীবন্মুক্ত। তখন তাহার কাজ, কেবল হাল ধরিয়া নৌকায় বসিয়া থাকা পাল তুলিয়া দিয়া আর আনন্দে নিশ্চিন্তে গান করা। নৌকা কৃপা-পবনে গন্তব্যস্থলে আপনিই পৌঁছিবে। ওঁ রামকৃষ্ণ।

বিনীত
গ্রন্থকার